অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস

বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া

অনুবাদ

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য অকাদেমি

নতুন দিল্লী

সাহিত্য অকাদেমি

প্রধান কার্যালয়

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১

শাখা কার্যালয়

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক ৫বি, কলিকাতা ৭০০ ০২৯

২৯ এল্ডামস্ রোড, তেয়নামপেট, মাদ্রাজ ৬০০ ০১৮

১৭২ মুম্বাই মারাঠি গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, বোম্বাই ৪০০ ০১৪

মুদ্রক শ্রীসিদ্ধার্থ মিত্র

বোধি প্রেস

৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

আসাম ও অসমীয়া ভাষা

ভারতের যে ভূখণ্ডকে আমরা এখন আসাম নামে অভিহিত করি, মহাকাব্যের যুগে তারই নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষ। প্রাচীন ও পৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্য, যেমন কালিদাসের কাব্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষের আর একটি নাম পাই কামরূপ। সমুদ্রগুপ্তের (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) এলাহাবাদ অনুশাসনে এর প্রথম প্রস্তরে উৎকীর্ণ উল্লেখ দেখি। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর কালিকা-পুরাণে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপের একটি চমৎকার প্রাকৃতিক বর্ণনা পাওয়া যায়। যোগিনীতন্ত্রেও (খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) তাই। এই দুই পুস্তকেই ধর্মাচার ও প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত সংবলিত মধ্যযুগের আসামের একটি মনোরম চিত্র ফুটে ওঠে। যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের সীমানির্দেশ এইরূপ :

নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রিম্ ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমম্
করতোয়াং সমারভ্য যাবৎ দিক্করবাসিনীম্।
উত্তরস্যাম কঞ্জগিরি করতোয়া তু পশ্চিমে
তীর্থশ্রেষ্ঠ দিক্ষুনদী পূর্বস্যাম গিরিকন্যাকে ॥
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লক্ষাবহ সঙ্গমাবধি
কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ ॥

'নেপালের কাঞ্চনগিরি হতে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম পর্যন্ত এর সীমানা। এর একদিকে করতোয়া, আর একদিকে দিক্করবাসিনী, উত্তরে কঞ্জ পর্বতমালা, পশ্চিমে করতোয়া, পূর্বে দিক্ষু এবং দক্ষিণে লক্ষা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল—এই সমগ্র ভূভাগ সর্বশাস্ত্রে কামরূপ নামে খ্যাত।' এই ভাবে প্রাচীন কামরূপের মধ্যে বর্তমান আসামের জেলাগুলি ছাড়াও উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর সমেত সমগ্র ভূখণ্ডের চিত্র পাই।

এই প্রদেশের আসাম নাম সাম্প্রতিক কালের। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে আহোম বা শান্ অভিযানকারীরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করে, তাদের সঙ্গে এই নামকরণ সম্পর্কিত। আহোমদের নিজেদের কিংবদন্তী

বলে যে আসাম নাম অসম শব্দ হতে গৃহীত যার অর্থ হচ্ছে যে তারা যুদ্ধে অপরাজেয় অর্থাৎ তাদের সমকক্ষ কেউ নেই। তারা আরও বলে যে এই অসম অভিধাটি ঐ দেশের স্থানীয় আদিবাসীদেরই দেওয়া এবং তাদের প্রতি ভীতি ও সম্ভ্রমের নিদর্শন। ক্রমশ বিজয়ীরা বিজিতদের শান্ত ও সংহত করে রাজ্যবিস্তার শুরু করে। ডঃ বাণীকান্ত কাকতির অনুমান যে অসম বা সমকক্ষহীন এই অভিধাটি পূর্ববর্তী কালের 'অচম' শব্দের সংস্কৃতায়ণ। থাই ভাষায় 'চম' শব্দের অর্থ বিজিত হওয়া। অসমীয়া ভাষার সূচনায় 'অ' 'আ' হয়ে গেলেও আসাম বা আচামের অর্থগৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নি অর্থাৎ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরাজয়বিহীন' বা 'বিজয়ী'। এই সূত্রে কেউ কেউ তর্ক করেছেন যে বিজয়ীদের নামই ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিজিত ভূখণ্ড ওই নামে অভিহিত হয়। শ্রীযুক্ত বেডেন পাওয়েল আর এক ধরনের ব্যুৎপত্তির সম্ভাবনার কথা বলেছেন, 'আসাম নামটি খুব সম্ভব বোডো 'হ-কোম' শব্দ থেকে গৃহীত যার অর্থ হচ্ছে নীচু বা সমান্তরাল দেশ।'

মহাভারত ও পুরাণের বিকৃতি অনুসারে আসামের প্রাচীনতম অধিবাসীরা হচ্ছেন নিষাদ, কিরাত, চীন এবং অন্যান্যরা যাদের বলা হত 'ম্লেচ্ছ', 'অসুর' ইত্যাদি। ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তনের প্রমাণে আদিমতম নিদর্শন-গুলি স্থান নামের মধ্যে আজও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। এই মত যাঁরা পোষণ করেন (যেমন স্মিডট্ সাহেব), তাঁরা বলেন যে এই আদিবাসীরা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ইন্দো-চাইনীজ ভাষার মন-খ্মের বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য কোন্ স্মরণাতীত যুগে এই অষ্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীরা আসামে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছিল, তা অজানা। তবে খ্রীষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই এই যাত্রার শুরু এবং পশ্চিম হতে আর্যদের আসার বহু আগে তা নিশ্চিত। তবে আসামের নৃতাত্ত্বিক গঠনে অষ্ট্রিকভাষী মোঙ্গলগণ কতটা সাহায্য করেছিল, তা নিশ্চিত-ভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে বর্তমান কালেও অসমীয়াদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে ও সামাজিক পরিবেশে, আচার বিচারে, ব্যবস্থায় এই প্রাচীন স্মৃতি বিদ্যমান।

ইন্দো-চীনীয় আক্রমণের পরবর্তী অধ্যায়ে আরো কয়েকটি ভোট-বর্মী ভাষাভাষী গোষ্ঠীর শাখা আসামে প্রবেশ করে। এদের আদিম বাসস্থান ছিল উত্তর-পশ্চিম চীনের ইয়াং-সি-কিয়াং ও হোয়াং-হো নদীর উপকূল। সেই

স্থান থেকে তারা ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে। যে সব দল আসামে আসে তারা ধুবড়ির নীচে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভূভাগই পছন্দ করে এবং প্রকৃতির দ্বারা সুরক্ষিত এই ভূখণ্ড থেকেই ধীরে ধীরে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে—উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে কয়েকটি গোষ্ঠী গারো পাহাড়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। কেউ কেউ যায় পার্বত্য ত্রিপুরার অঞ্চলে, আবার অন্যরা কপিলি ও সন্নিকটবর্তী নদী বহুল উপত্যকা অতিক্রম করে উত্তর কাছাড়ে পৌছয়, কিন্তু তারা গারো পাহাড়ে ও পশ্চিমের উচ্চ পার্বত্য মালভূমিতে প্রবেশ করতে পারে নি এবং ওই জনপদগুলি মন-খ্মের গোষ্ঠীদেরই অধিকারে থেকে যায়। ওইসব তিব্বত-ধর্মী জনস্রোতের কয়েক দল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শিখরদেশে এসে দক্ষিণে প্রবেশ করে। এইভাবে তারা নাগা পার্বত্যভূমি অধিকার করে এবং তাদের হতে নানা উপজাতির উদ্ভব যাদের ভাষাকে আদিম নাগা ভাষার দৃষ্টান্তের উৎস বলে পরিগণিত করা হয়। আগন্তুক জনগোষ্ঠীর কয়েকটি দল যারা চিণ্ডউইন্ ও ইরাবতী নদীর উত্তরে অধিষ্ঠান করেছিল, তারাও আসামের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং লুশাই-এ, কাছাড়ে, মণিপুরের কিয়দংশে এবং নাগা পর্বতের কিছু স্থানে উপনিবেশ গড়ে তোলে। ওইসব অনার্য তিব্বতী-ব্রহ্ম উপজাতিদের, যারা আসামে বসবাস করে, তাদের মধ্যে বোড়োরাই সংখ্যায় অনার্য শাখাদের মধ্যে বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ। এই বোড়ো বিভাগের মধ্যে আছে কোচ, কাচারি, লালুং, ডিমাচা, গারো, রাভা, টিপুরা, চুটিয়া এবং মারান প্রভৃতি উপজাতিরা। যে সব বোড়োরা বর্তমান কামরূপ জেলার পশ্চিমে বাস করে, হিন্দু প্রতিবেশীরা তাদের 'মেচ' নামে অভিহিত করে। মনে হয় এই 'মেচ' শব্দটি সংস্কৃত ম্লেচ্ছ শব্দেরই অপভ্রংশ। যেসব বোড়োর দল কামরূপ জেলায় বা তার পশ্চিমে বসতি স্থাপন করে তাদের কাচারিও বলা হয়। হয়তো বা সংস্কৃত কিরাত শব্দের বাচনিক অপভ্রংশ 'কক্ষাট' থেকে কাচারি শব্দের উৎপত্তি।

ভাষাগত প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে এক সময়ে মণিপুরের পশ্চিমভাগ ও পার্বত্য অঞ্চল, খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড় ছাড়া আসামের বর্তমান প্রদেশসীমার সর্বত্রই বোড়োদের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রদেশের বহু সুপ্রচলিত প্রথার নামকরণ আজও টিঁকে আছে বোড়ো ভাষার সাহায্যে। বোড়োরা নদীর ধারেই তাদের বসবাস গড়ে তুলত। সেইজন্য পূর্ব আসামের

বহু নদীর নাম বোড়ো ভাষার সঙ্গে যুক্ত আছে। তাদের পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠী অষ্ট্রিকদের দেওয়া নামের সঙ্গে তারা 'ডি' কথাটি যোগ করে, যেমন ডি-হং, অষ্ট্রিক ভাষায় হিং অর্থে জল বোঝায় এবং হয়তো সেই সূত্রেই প্রাচীনকালে নদীর নামই ছিল হং। বোড়োরা নিজেদের শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে এবং চুটিয়া, কাচারি, কোচ প্রভৃতি নামে বিভিন্ন যুগে আসামের বিভিন্ন ভূভাগে নিজেদের রাজত্ব চালায়। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দীর ক্রমবিবর্তনে তাদের উপর বহিরাগতদের চাপ পড়তে থাকে এবং পূর্ব থেকে আসে বিরাট থাই জাতির একটি গোষ্ঠী আহোমরা এবং পশ্চিম থেকে আর্যরা। থাই বা শানরা প্রথমে দক্ষিণ চীনের ইউনানে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং তারপর তারা চলে আসা উত্তরব্রহ্মে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তারা ইউনান থেকে আসে ব্রহ্ম-চীন সীমান্তে, শেওলি উপত্যকায় এবং তৎনিকটবর্তী স্থানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ওদেরই একটি গোষ্ঠী যাদের নাম আহোম সমস্ত আসামে ছড়িয়ে পড়ে ও দেশ জয় করে নেয়। তাদের জয়যাত্রার পিছু পিছু অন্য শান জাতিরাও অনুসরণ করে। এরা হচ্ছে খামাচি, ফকিয়াল, নারা ও ঐতানীয়রা। এরা আসামের পূর্বভাগেই বেশি বাস করে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আর্যদের আগমন কবে তা নিয়ে সঠিক অনুমান দুঃসাধ্য। তবে এটা অনস্বীকার্য যে তাদের অনুপ্রবেশ ইতিহাসের এক অপেক্ষাকৃত আদিম যুগেই, সেটা যুদ্ধবিগ্রহের অভিযানের সূত্রেই হোক বা শান্তিপূর্ণ অধিকার সূত্রেই হোক। আর্যাবর্তের সঙ্গে আসামের প্রথম সাংস্কৃতিক বা যুদ্ধসূত্রে উল্লেখ পাই রামায়ণে ও মহাভারতে। আসামের আর্যীকরণের ইতিবৃত্তে নরকাসুরের[১] কাহিনীর একটি বিশেষ মূল্য আছে। অপেক্ষাকৃত

---

১ কথিত আছে যে নরক বিদেহাধিপতি আর্যরাজ জনকের পোষ্যপুত্র। জনক এই বালককে ষোড়শবর্ষ পর্যন্ত প্রতিপালন করেন ও অন্য রাজপুত্রদের সঙ্গে সমানভাবে তাকে রাজসভায় আসন দেন। নরক কিন্তু অন্য রাজকুমার অপেক্ষা অস্ত্রবিদ্যায় ও রাজধর্ম শিক্ষায় বেশি পারদর্শিতা লাভ করেন এবং এর ফলে জনকের মনে ভয় হয় যে হয়তো কালে এই বালকটি তাঁর কিশোর পুত্রদের শৌর্যে বীর্যে অতিক্রম করে তাদের রাজ্য কেড়ে নিতে পারে। নরকের ধাত্রীমাতা কাত্যায়নী মনে মনে বিপদের আভাস পেয়ে জনকের প্রাসাদ হতে গঙ্গাতীরে পালিয়ে আসে। তখন তারা দুজনে মোঙ্গল শ্রেণীর কিরাতজাতি অধ্যুষিত প্রাগ্‌জ্যোতিষে পলায়ন করে এবং সেখানে নরক একটি সৈন্য-দল সংগঠন করে কিরাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং তাদের পরাজিত করে স্বীয় রাজত্ব স্থাপন করে।

পুরাতন অনুশাসনগুলিতে দেখা যায় যে উচ্চবর্ণের আর্যেরা, যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও কলিতারা খ্রীষ্টীয় সনের প্রাক্কালেই আসামে আগমন ও বসবাস আরম্ভ করেন। নিধানপুর তাম্রশাসন দানপত্রে লিখিত আছে যে সম্রাট (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী) অগ্রহার ভূমিবৃত্তি[২], বিদ্যানুশীলনের জন্য ও পঠনপাঠনের উদ্দেশ্যে দুইশতেরও বেশি বিভিন্ন গোষ্ঠী[৩] ও বেদশাখাভুক্ত[৪] ব্রাহ্মণদের দান করেন। তাঁরা তাঁদের বৃত্তিপ্রাপ্ত জমিজমায় শুধু উপনিবিষ্ট হন নি, আশপাশের অনার্য অধিবাসীদের ধর্ম ও সংস্কারে বিশেষ আঘাত না দিয়ে আর্যধর্মের আচারবিচার ও ভাষাশিক্ষাদানে তৎপর হন। এমন কি উপজাতিদের নাম পর্যন্ত আর্যজাতির নানা বিভাগের নামানুসারে পরিবর্তিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'কোচ' শব্দটি পূর্বে একটি বিশেষ উপজাতিকেই নির্দেশ করত কালক্রমে ওই কোচরা আর্যজাতির একটি শাখায় পরিণত হয়, যখন আদিবাসী কাচারি, লাহং, মিকির এবং অন্যান্য উপজাতিরা আর্য ধর্ম, ভাষা ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করে।

যে কোনো দেশের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিবর্তনে সেই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক পরিবেশেরও বিশেষ মূল্য আছে, আসামের প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই এই সত্যটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আসামের তিনদিকে অন্যদেশ, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা এবং বৃহৎ পর্বতমালা। সেই সব গিরিপথের মধ্য দিয়েই প্রাচীন কালে, আসামের তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, চীন, ভুটানের সঙ্গে শুধু সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হয় নি, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারও ঘটেছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ব্রহ্মপুত্রনদ, যা গোটা রাজ্যের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত। সুদূর অতীতকাল হতেই এই জলপথ শুধু বঙ্গ ও আসামের মধ্যে নয়, সারা ভারতের সঙ্গেই যাতায়াতের ও বাণিজ্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য রক্তবাহিকা নাড়ীর মতো যোগসূত্র ছিল। এই বিস্তীর্ণ জল

যথাসময়ে সেখানে বিদেহ থেকে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আনয়ন করিয়ে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা ও সমাজব্যবস্থা সংঘটিত হয়।

২ ব্রাহ্মণদের ভূমিদান

৩ ব্রাহ্মণ বংশীয় উপশাখা ও পরিবার

৪ বেদের বিভিন্ন শাখাভুক্ত

দুধারের বহুযোজন বিস্তৃত ক্ষেত্রকে উর্বর করেছে, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা করেছে। একদিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে ব্রহ্মপুত্র আসামের রক্তবাহী স্রোত। মিশরের নীলনদের যে ভূমিকা এখানে ব্রহ্মপুত্রেরও সেই ভূমিকা। আসামের সমগ্র ইতিহাস এবং সংস্কৃতির রূপান্তর ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সেখানে প্রকৃতি এমনই অকৃপণ যে লোকের দৈনন্দিন অন্নসংস্থানের জন্য চিন্তা করতে হয় না। প্রাচীনকালে ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য বৃহৎ নদীর বালুকণায় স্বর্ণরেণু পাওয়াও বিচিত্র ছিল না।

এইসব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিই অসমীয়া জাতি গঠনে নানা দিকে প্রভাবিত করেছে। এই নদের দুধারে অনায়াসলভ্য বিরাট শস্যভাণ্ডার দূরের মানুষকে লুব্ধ করেছে, তারা দলে দলে এসেছে, বসবাস করেছে। প্রতিটি আগন্তুক দলই তাদের গোষ্ঠীর ও যূথের কিছু না কিছু মৌল সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন রেখেছে এবং কালে প্রতিটি সভ্যতার রূপরেখা মিলেমিশে ব্রহ্মপুত্রের দেশজ সংস্কৃতিকে এক মহামানবের সাগরতীর্থে উত্তীর্ণ করেছে। পর্বতগাত্রবাসী ও সমতলবাসী দুদলেরই খাদ্যের অনটন ছিল না, আবহাওয়া ছিল ভালো, মানুষরা ছিল অলস কিন্তু অতিথি বৎসল, আনন্দপরায়ণ, সহজ সরল, জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। এইসব জীবন উপাদান ও প্রকৃতির পর্যাপ্ত দান তাদের উন্মুক্ত অকাশতলে শিল্প সংগীত ও নৃত্যরসিক করে জীবনকে ছন্দিত ও স্পন্দিত করেছিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই অসমীয়া ভাষার বিকাশ। সংস্কৃত হতেই এর উদ্ভব যদিও মাগধী অপভ্রংশই এর সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ। গ্রীয়ারসনের মতে, 'পূর্বপ্রাকৃতের সহধর্মী মাগধীই এই অঞ্চলে কথ্য ভাষা ছিল। মগধের পূর্বপ্রান্তে প্রাচ্য অপভ্রংশই প্রচলিত ছিল। ক্রমশ এই মাগধীই দক্ষিণে ও দক্ষিণ পূর্বে প্রসারিত হয়ে আধুনিক বাংলার সৃষ্টি করে। দক্ষিণে প্রসারণ ছাড়াও এই প্রাচ্য অপভ্রংশ গঙ্গার উত্তরকূল দিয়ে পূর্বাভিমুখী হয় এবং আসাম উপত্যকায় প্রবেশ করে এবং অসমীয়ায় রূপান্তরিত হয়। মাগধী অপভ্রংশের তিন সন্তান—ওড়িয়া, আধুনিক বাংলা ও অসমীয়া' (লিংগুইষ্টিক্ সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১২৫-১২৬)। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচ্য মাগধী অপভ্রংশকে চারটি কথ্যভাষায় বিভক্ত করেছেন, এর মধ্যে তিনটি কথ্যভাষা পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ববঙ্গে ও উড়িষ্যার সন্নিকটবর্তী

উত্তরবঙ্গে কথিত হত; চতুর্থটি আসাম ও সংলগ্নদেশে কথ্য ভাষা ছিল। ডঃ বাণীকান্ত কাকতি দেখিয়েছেন যে বর্তমান বাংলা ও অসমীয়া কথ্যভাষার পূর্বযুগে আরও কতকগুলি কথ্যভাষা ছিল, যারা প্রাচ্য মাগধী অপভ্রংশের মধ্যে পরিগণিত। প্রত্যেক কথ্যভাষাই কালক্রমে নিজের বিশিষ্ট স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। এইভাবে অসমীয়া, আসামের স্বাধীন নৃপতিদের সহযোগিতায় এবং তার সমাজ জীবনের সর্বস্তরে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি স্বনির্ভর ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে অসমীয়া ভাষার প্রাচীনত্ব খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকেই পরিলক্ষিত হয়। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তৎকালীন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার আমন্ত্রণে তাঁর রাজসভায় যান এবং তাঁর কামরূপ-ভ্রমণবিবরণীতে তিনি বলেন যে ওখানকার ভাষা মধ্য-ভারতের ভাষা থেকে কিছু বিভিন্ন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় আর্যভাষা যদিও কামরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল এবং কথিতও হত তবু মধ্যভারতে প্রচলিত মাগধীর সঙ্গে তার বেশ কিছু পার্থক্য ছিল। প্রাচীন অনুশাসনগুলির ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে অসমীয়া ভাষার প্রাচীনত্ব বোধগম্য হয়, বিশেষ করে জনপদ ও ব্যক্তি নামমালায়। এই ভাষা তখন গঠনোন্মুখ এবং এর বিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করা যায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের[১] গাথায় ও সিদ্ধবচনে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। এইগুলি সাধারণত চর্যা ও দোঁহা নামে পরিচিত এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'হাজার বছরের পুরানো বাংলাভাষায় গান ও দোঁহা' কোষ-এ সংগৃহীত। বাংলার পণ্ডিতরা এই চর্যাপদ ও দোঁহাকোষগুলিকেই বঙ্গভাষার আদিমতম রূপ বলে গণ্য করেন, কিন্তু যত্ন সহকারে বিচার ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই ভাষা, যার নামকরণ করা হয়েছে 'সন্ধ্যাভাষা' (দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণের বা সাঁঝের বুলি) মাগধী অপভ্রংশেরই সর্বশেষ রূপ এবং সেই কারণেই এর মধ্যে সমস্ত প্রাচ্য-ভারতীয় আর্যভাষা গোষ্ঠীর যেমন বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়ার আদিম রূপের আভাসও পাওয়া যায়। ডঃ বাণীকান্ত কাকতি সনিষ্ঠভাবেই দেখিয়েছেন যে

১ বিশিষ্ট লোকোত্তর পূত চরিত্রের গুরু যাঁরা অষ্টসিদ্ধি লাভ করে অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতা অর্জন করেছেন।

এই সব গীতিগুচ্ছের গুণগত আকৃতি ও প্রকৃতি কী ভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অসমীয়া ভাষায় বর্তমানকাল পর্যন্ত চলে এসেছে এবং কী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে আধুনিক অসমীয়া জনগণ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ তাই তাদের ভাষায় মন-খ্মের (যাদের মধ্যে খাসি একটি) থেকে চৈনিক তিব্বতী (যেমন বোড়ো, কাচারি, থাই বা আহোম) প্রভৃতি উপভাষা থেকে সংগৃহীত শব্দনিচয়ও ঢুকে গেছে। ডঃ কাকতি অসমীয়া ভাষায় অষ্ট্রিক রীতিগুলিরও অনুপ্রবেশ সম্যক পর্যালোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে এই সমস্ত শব্দসম্ভার বা উচ্চারণরীতিগুলি অসমীয়া ভাষার আদিম ঐতিহ্যবাহী বলে পরিগণিত এবং সেগুলি বেশির ভাগই অষ্ট্রিক ভাষা-ভাষীদের থেকে গৃহীত। বোড়ো ও আহোম নৃপতিরা আসামে বহুদিন রাজত্ব করায় ওই সব শব্দ ও রীতি অসমীয়া ভাষায় বেমালুম ঢুকে গিয়ে ভাষাকে সমৃদ্ধতর করতে সাহায্য করেছে, যার ফলে অসমীয়া ভাষাই আজকের অন্য ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যে সম্যকভাবে সুবিন্যস্ত এবং একটি সুদৃঢ় ভাষাশৈলীতে পরিণত, যাতে অষ্ট্রিক, ইন্দো-তিব্বতীয় এবং অন্যান্য কথ্য ভাষারও যথেষ্ট উপাদান আছে এবং সোপকরণ সম্মিলিত সেই সমীকরণই সবার পরশে পবিত্র করা এক জীবন্ত ভাষাতীর্থে পরিণত করেছে। বহুজাতি সংসর্গের এইটি অবশ্যম্ভাবী ফল, তবে অসমীয়ায় কতকগুলি ইন্দো-আর্য শব্দ রূপান্তর লাভ করেছে। প্রাচীন ইন্দো-আর্য শব্দনিচয়ের এই মিশ্রণের ফলে তাদের কয়েকটি মূর্ধা ও দন্ত্যগত শব্দ উচ্চারণে কিছুটা অদল-বদল হয়েছে, যেমন তিনটি স শ ও ষ শব্দ তাদের মৌল প্রকৃতি হারিয়ে বিশিষ্ট উচ্চারণে পরিণত হয়েছে। নাসিক্য-ধ্বনিপ্রধান কথা বলার পদ্ধতি, যেটি অন্যান্য ভাষার একটি মৌল প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য, সেটি অসমীয়া ভাষার শব্দবিন্যাসে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। অন্য কয়েকটি ভাষাভিত্তিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের স্বল্প ব্যবহার, স্বরবর্ণের শব্দের প্রাচুর্য ও শব্দশেষে একটা সুন্দর ও কোমল সমাপ্তি। সংস্কৃতের যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের বচনগুলিকে স্বরবর্ণসংযোগে খণ্ডীকৃত করা হয়েছে।

এইখানে একটি বৈশিষ্ট্য কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে প্রভাবগুলির সংমিশ্রণের পরিমাণ এতটা ব্যাপক বা গভীর ছিল না যে অসমীয়া ভাষার আর্যগঠন রীতির পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হয়েছে। এর কারণ ডঃ কাকতি দেখিয়েছেন যে কতকগুলি প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাপঙ্ক্তি। ভারতীয় পরিব্রাজকদের সুদূর

প্রাচ্যে যাবার পথ ছিল আসামের মধ্য দিয়ে এবং সেইজন্যই আসামের সঙ্গে ভারতবর্ষের তথা আর্যাবর্তের অন্যপ্রান্তের সদাসর্বদা যোগ ছিল এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় অসমীয়া সমাজ বিবর্তনে, অসমীয়া ভাবে ভাষায় বা সামাজিক আচার আচরণে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। তারপর, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অসমীয়া ভাষায় যে সাহিত্য গড়ে উঠতে আরম্ভ করে তার মূল প্রেরণা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যার জন্য অনার্য ভাব ভাষায় প্রসারের উপর বিশেষ বাধা সৃষ্টি হয় এবং ওই সব অনার্য শব্দ ওই গোত্রীয় ভাষা রীতিনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে না। অসমীয়া লিপিও সার্বভৌম ভারতীয় গুপ্তলিপির মাধ্যমে সুসংবদ্ধভাবে সংগঠিত হয়ে ওঠে।

অসমীয়া ভাষায় শব্দচয়ন সংস্কৃত ভাষা থেকেই সংগৃহীত এবং এর ভাষা-বিন্যাস সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী। কথ্যভাষায় কিন্তু মূল সংস্কৃত বাক্য খুব কমই ব্যবহৃত হয় এবং তাদের স্থান অধিকার করেছে তদ্ভব[১] বা অর্ধতৎসম[২] বাক্যগুলি। তাছাড়া অসমীয়া একটি জীবন্ত ও বর্ধমান ভাষা, অন্য ইন্দো-চীন গোষ্ঠী হতে অনেক বাক্য গ্রহণ করেছে। পারসিক্‌ ও আরবী শব্দও প্রশাসনিক কারণে ভাষার মধ্যে প্রবেশ করেছে। বর্তমান কালে এই ভাষা ইংরেজি ভাষা থেকেও বেশ কিছু গ্রহণ করেছে। এই সব কারণেই অসমীয়া ভাষার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়েছে এবং একে একটি গূঢ় ও শক্তিশালী প্রকাশ-রীতির মাধ্যমে পরিণত করেছে।

---

১ সংস্কৃত হতে উদ্ভূত শব্দনিচয়

২ অর্ধ-সংস্কৃত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক যুগ

মধ্যযুগের ইসলামধর্মের অভ্যুত্থান একটি বিশিষ্ট ঘটনা এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুদূর আসামেও এর প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। উত্তর গৌহাটির নিকটবর্তী কানাইবরশী নামক স্থানে গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ একটি প্রস্তর-অনুশাসনে দেখা যায় যে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে একদল তুরকী কামরূপ আক্রমণ করতে এলে বিতাড়িত হয়। বোধ হয় এটি মীনহাজের কাহিনীতে বর্ণিত মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজির তিব্বত অভিযানের পর আসাম আক্রমণের বিবরণী। আবার ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষণাবতীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইয়াজ কামরূপ জয়ের চেষ্টা করেন। ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়াস উদ্দীন উজবাক্ তুঘ্রিল খাঁ কামরূপ আক্রমণ করেন কিন্তু তিনি পরাজিত হন ও তাঁর সৈন্যবাহিনী বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মুসলিম সৈন্য-বাহিনীর জন্য মহম্মদ শাহের কামরূপ বিজয়ের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এবং ঐ আক্রমণে মুসলিম সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়।

যদিও বার বার এইসব মুসলিম আক্রমণ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সফল হয় নি তবু এই সব অভিযান পুরাতন কামরূপ রাজ্যের ভিত্তিকে নাড়া দিয়েছে এবং ঐ রাজ্যকে নিস্তেজ ও পঙ্গু করে এর বিলুপ্তির সুযোগ ঘটিয়েছে। এই সময়েই উত্তরপূর্ব দিক থেকে শান আক্রমণকারীরা আসামে প্রবেশ করে। ফলে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ফাটল ধরে, সংহতি ভেঙে পড়ে এবং দেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে কতক-গুলি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। শান আক্রমণকারীদের একটি দল (১২১৫ খ্রীষ্টাব্দ) অহোম, সুখপার নেতৃত্বে এই দেশের পূর্বপ্রান্তের বেশ কিছু অংশ জয় করে। তাদের প্রথম রাজধানী চরাইদেও হতে (বর্তমান জোরহাটের কাছে) শাসনকার্য আরম্ভ হয়। তিব্বতীয়-ব্রহ্ম গোষ্ঠির আর একটি দল কাচারি প্রাগৈতিহাসিক যুগে আসামে আসে এবং ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে নদীপরিবেষ্টিত একটি রাজ্য স্থাপন করে। সেই রাজ্যের সীমানা একদিকে দিখাউ ও কালং নদী (বর্তমান নওগাঁ জেলায়) এবং এর রাজধানী ছিল দিমাপুর। তাদের রাজ্যে ধানসিরি নদীর উপত্যকা এবং কাচার জেলা অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন

কামরূপরাজ্য এইভাবে খণ্ডিত হয়ে অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর রাজ্যে পরিণত হয় যার পশ্চিমে করতোয়া তখনও প্রবাহিতা এবং রংপুর, কুচবিহার, গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলাগুলিও অন্তর্গত ছিল। এইভাবে রাজ্যসীমানা সংকীর্ণ হওয়ার ফলেই কামরূপ নামও সংক্ষিপ্ত হয়ে কামতায় পর্যবসিত হয়, যদিও মুসলমান ঐতিহাসিকরা বলেন কামরূপ ও কামতা একার্থবাচক। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল কামতাপুর, বর্তমান কুচবিহার থেকে আঠারো মাইল দূরে।

কামতারাজ্যের একজন সুপরিচিত নায়ক ছিলেন রাজা দুর্লভনারায়ণ। সম্ভবত তাঁর রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে। এই নৃপতি ছিলেন বিদ্বানব্যক্তিদের একজন অদম্য উৎসাহদাতা ও গুণগ্রাহী। তাঁরই রাজসভায় অসমীয়াভাষা প্রথম দাঁড়াবার স্থান ও সম্মান পায়। তিনি কবিদের অসমীয়া ভাষায় কবিতা লিখতে উৎসাহিত করেন। হরিবর বিপ্র নামে এক সভাকবি 'বভ্রুবাহনর যুদ্ধ' নামে এক কাব্য রচনা করেন এবং তার অনুক্রমণিকায় একটি আশীর্বাণীতে লেখেন—'জয় হোক রাজেশ্বর দুর্লভ নারায়ণের, কামরূপের বীররাজা, তিনি সহস্র বৎসর পুত্রপাত্রমিত্র অনুরাগীদের নিয়ে সুখে রাজত্ব করুন। বিপ্র হরিহর তাঁর রাজত্বে সুখে বাস করে ভগবতী গৌরীকে প্রণাম জানিয়ে ও তার বন্দনাগান করে অশ্বমেধ পর্বের অন্তর্নিহিত রহস্য কাব্যে প্রকাশ করেছেন, যেটিকে বুঝতে উদার ধর্মবেত্তারাই পারেন।' হরিবরের দুটি প্রধান কাব্য— 'বভ্রুবাহনর যুদ্ধ' ও 'লব কুশর যুদ্ধ'। জৈমিনি মহাভারত থেকে এর কাহিনীভাগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'বভ্রুবাহনর যুদ্ধ' কাব্যটিতে প্রায় ছয়শো শ্লোক, এটি পিতাপুত্রের যুদ্ধের রোমাঞ্চকর কাহিনী। অশ্বমেধের যজ্ঞপূত ঘোড়া মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করছে এবং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তার পিছনে আসছেন এই দিয়ে কাব্যের শুরু। এই ঘোড়াকে বন্দী করেন মণিপুররাজ বভ্রুবাহন. কিন্তু তাঁর মা চিত্রাঙ্গদা তাকে জানান যে অর্জুনই তাঁর পিতা। তখন বভ্রুবাহন পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভুল করে ধরে রাখা ঐ ঘোড়াটিকে অর্জুনের হাতে সমর্পণ করতে যান। অর্জুন তাঁর যৌবনে যে মণিপুর রাজ্যে এসেছিলেন এবং রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে যে সন্তানের জনক হয়েছিলেন একথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে বসে আছেন এবং তাঁর মাতার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং বভ্রুবাহন যে ভয়ে ভীত হয়েই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছেন, সে কথা শুধু বিশেষ করেই বলেন না, আরো যোগ দেন যে পাণ্ডবরক্ত যে সব

বীরের ধমনীতে প্রবাহিত, সেই সব রাজপুত্ররা আরো কঠিন ধাতুতে তৈরি। এতে বভ্রুবাহন এমনই রেগে যান যে তখনই তিনি অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং তাঁকে শুধু পরাজিত নয়, নিহতও করেন। তখন সেই যুদ্ধ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়, তিনি অর্জুনকে পুনরায় জীবিত করেন এবং তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে বহুদিন পূর্বে মণিপুর পরিক্রমার সময় তিনি রাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেছিলেন এবং বভ্রুবাহনের জন্মদাতা তিনিই। অর্জুনের তখন মণিপুর ভ্রমণের কথা মনে পড়ে এবং বভ্রুবাহনকে তিনি তাঁর উপযুক্ত পুত্র বলে স্বীকার করে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে চলে যান।

এই কাব্যটি মূল সংস্কৃতের হুবহু অনুবাদ নয়। গ্রন্থকার সংস্কৃত সাহিত্যের মূল গল্পের আখ্যানটি গ্রহণ করে নিজের ইচ্ছামতো কাব্যটিকে নানাভাবে সাজিয়েছেন ও অনেক চমৎকার বিবৃতি ও নাটকীয় ঘটনার সমাবেশে পরিমার্জিত করতে চেষ্টা করেছেন। এই সব নব নব সংযোজনায় কোথাও সাহিত্যিক রুচির মান হ্রাস পায় নি। মণিপুর রাজসভার দৃশ্যটি চমৎকার ও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। বভ্রুবাহন ও অর্জুনের মধ্যে তর্ক, কলহ, গর্বোদ্ধত আত্মাভিমানী পিতা ও রুষ্ট পুত্রের মধ্যে উত্তেজক শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যালাপ, উত্তর, প্রত্যুত্তর, গ্রন্থকারের চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্যই প্রকাশ করে। যুদ্ধবিগ্রহের ছবিগুলি সুনিপুণ হাতে আঁকা হয়েছে এবং বীরজনোচিত বৃত্তিরই পরিচয় দেয়। হরিবরের পুঁথিতে কতকগুলি চরিত্রের মুখে অতিকথন দোষ আছে। কবি তার মধ্যে মৃদুমন্দ আলাপের সঙ্গে তত্ত্বকথা ও নীতিবাক্যও ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর 'লবকুশযুদ্ধ' কাব্যে তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন জৈমিনি বর্ণিত রাম ও তাঁর দুই পুত্রের যুদ্ধকাহিনী। সীতার অপহরণ, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন প্রভৃতিও স্বল্প কথায় বিবৃত হয়েছে।

যেহেতু কাব্যটি জনসাধারণের জন্য রচিত, এর ভাষাও তদ্রূপ শুষ্ক ও কঠোর যদিও লৌকিক কথ্য ভাষার কিছু রসালাপ ও আমেজ এর মধ্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া জনগণ মনের কৌতূহল, চিন্তার ও চেতনার সুর অনুযায়ী প্রাচীন বক্তব্যগুলির গুরুত্ব ও ঘটনার পরিবেশে কাহিনীর অদলবদলও লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে বীর্য শৌর্যের গাথা ও আদর্শগুলি জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য কবিকে লঘু করতে হয়েছে।

হরিবরের সমসাময়িক আর একজন কবি হেমসরস্বতী তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক রাজা দুর্লভনারায়ণের প্রশস্তি মুখবন্ধ করে 'প্রহ্লাদ চরিত' কাব্য রচনা করেন। যদিও তাঁর উক্তিতে দেখা যায় যে তিনি বামনপুরাণের আখ্যান অনুযায়ী এই কাব্য সংকলন করেছেন তবু তিনি পুরাণের ইতিকথায় বর্ণিত আখ্যায়িকাকে নানা ভাবে পরিবর্তন করে নূতনভাবে সাজিয়েছেন। যদিও তাঁর বদলাবার ভঙ্গি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী নয় এবং তাঁর ব্যবহৃত ভাষাও অনেক স্থানে অশুদ্ধ, তাঁর কাব্যে ভক্তিরসের প্রাধান্য। সরস্বতীর 'হরগৌরী সম্বাদ' আর একটি বৃহত্তর কাব্য ; এটি নয় শত শ্লোকে সমৃদ্ধ। তিনি নানা পুরাণ ও লোককথা থেকে এই কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। যদিও এই কাব্যে যোগশাস্ত্র ও তার সিদ্ধিপ্রণালীর কথা কয়েকটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তবুও এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল কারণ মানুষের মনে এক অপরিসীম তৃষ্ণা আছে—সে জানতে চায় সব কিছু তা স্বতঃসিদ্ধই হোক বা তুচ্ছই হোক।

কামতারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পাবার সৌভাগ্য আরো দুজন বিখ্যাত কবির ভাগ্যে জুটেছিল, তাঁরা হলেন—'জয়দ্রথবধ' কাব্য প্রণেতা কবিরত্ন সরস্বতী ও 'সাত্যকি-প্রবেশ' রচয়িতা রুদ্র কন্দলী। দুইটি গ্রন্থেরই বিষয়বস্তু মহাভারত থেকে গৃহীত হয়েছে।

সমসাময়িককালে নওগাঁ জেলায় কাচারি রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আর একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র আস্তে আস্তে গড়ে উঠছিল। এখানে কাচারিরাজ মহামাণিক্যের (আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দী) সহায়তায় ও প্রেরণায় প্রাক্-বৈষ্ণবযুগের সর্বোত্তম কবি মাধব কন্দলী সমগ্র রামায়ণ অসমীয়া ভাষায় কাব্যে অনুবাদ করেন। মাধব কন্দলীর রামায়ণ ভগবান ও মানবের সেবায় উৎসর্গীকৃত একটি বিরাট জীবনের গীতি-আলেখ্য। সেই জন্যেই তাঁর নামের সঙ্গে কবিরাজ পদবী যুক্ত হয়েছিল, এই অভিধার সার্থক প্রয়োগ ঘটেছিল তার মধ্য দিয়ে। কবিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন রাজচক্রবর্তী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও প্রধান। তিনি একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং তখনকার দিনের কবিদের মতো নিজের রচনার মধ্যে শুধু ভাবালুতার প্রশ্রয় দেননি বা স্বজীবনীর খণ্ডাংশও প্রতিফলিত করেন নি। মহাপুরুষ শংকরদেব যিনি পরবর্তীকালে অসমীয়া সাহিত্যকে গৌরবের শীর্ষস্থানে উন্নীত করেছিলেন, তিনিও মাধব কন্দলীর প্রাঞ্জল ও সরস রামায়ণ কথার একজন প্রধান অনুরাগী ছিলেন।

কন্দলীর রামায়ণেই আমরা প্রথম প্রচুর অসমীয়া শব্দের ব্যবহার দেখি। জনসাধারণের মুখের বচনগুলিকে তিনি নূতনভাবে প্রয়োগ করেন ও সাহিত্যে মর্যাদা দেন এবং যোগজমিশ্রণে নানা শব্দ প্রণয়ন করে সাহিত্যকে আরো সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। এই সুষ্ঠু শব্দ চয়নের উত্তরাধিকার শংকরদেব ও তাঁর অব্যবহিত পরবর্তীদের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। এই রচনা-রীতি ও শৈলী যদিও গভীর তথাপি স্বচ্ছ, যদিও মৃদু তবু গতানুগতিক নয়, সুদৃঢ় কিন্তু রুক্ষ নয়, পূর্ণ তবু দুকূলপ্লাবী নয়। এই উপলক্ষে মনে রাখা কর্তব্য যে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় অনূদিত বাল্মীকির রামায়ণগুলির মধ্যে মাধব কন্দলীর অনুবাদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। হিন্দী বাংলা বা ওড়িয়া ভাষায় এর অনুবাদ বা অনুসরণ প্রায় দেড়শত বছরের পরের। যদিও কন্দলীর রামায়ণ বহু পূর্বের তবু সাহিত্যের মানের দিক থেকে এই অনুবাদ মোটেই শিথিল নয় এবং বেশ উজ্জ্বল সাহিত্যরসে পূর্ণ। মাধব কন্দলী দুটি বিষয় কখনও বিস্মৃত হতেন না— সাহিত্যিক সৌন্দর্যবোধ ও জনগণের রুচি। তিনি কখনও জাতি বর্ণ বা ধর্মগত কারণে শৈল্পিক রীতিকে অতিক্রম করেন নি। বাক্যচয়নে, চরিত্র-চিত্রণে বা পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর কল্পনাশ্রয়ী মন অবাধভাবে বিচরণ করেছে।

বাল্মীকির মূল রামায়ণে (যা থেকে এই অসমীয়া অনুবাদের সৃষ্টি) রসোত্তীর্ণতাই প্রথম লক্ষ্য। ভক্তি বা নীতি শিক্ষার স্থান পরে। অসমীয়া কবিও সাহিত্যিক সৌষম্য ও শৈল্পিক সৌকর্যকেই প্রধান উপাদান ও উপকরণ করেছেন। অসমীয়া ভাষান্তরে রামায়ণের একটি গুণগত রূপান্তর আমরা লক্ষ্য করি। মূলের বীর রসের ধারা অনুবাদের রসসায়রে সৌন্দর্য চেতনায় ডুব দিয়েছে। যেখানে ছিল মুহুর্মুহু বীররসের হুঙ্কার সেখানে পাশাপাশি ফুটে উঠেছে একটি স্নিগ্ধ পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবনের স্পষ্ট মুখের চিত্র—আদর্শ পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা। কন্দলীর রামায়ণে দেখি তিনি প্রাচীন ঋষিদের মতো প্রতিধ্বনি করেছেন—নারী পতিব্রতা হোক, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ হোক, জায়ার প্রতি প্রেম অবিচলিত নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হোক, ভ্রাতা ও সুহৃদজনের প্রতি স্নেহ মমতা এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের প্রতি ভদ্র-জনোচিত ব্যবহার। এই কাব্যে আমরা আরো দেখি যে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর একনিষ্ঠতাই সর্বশ্রেষ্ঠ সতীত্ব ও সততা। অসমীয়া-জাতির মনের কথাকেই কাব্যে অভিব্যক্ত করেছেন কবি, মুখে কথা জুগিয়েছেন।

বাল্মীকির কাহিনীকে মূলত অনুসরণ করলেও তাঁর রামায়ণী কথায় অসমীয়া সমাজ জীবন সংস্কৃতি ও লোকচেতনার চরণচিহ্ন সর্বত্র। স্থানীয় রীতিনীতি আচারবিচার, পদ্ধতিপরিবেশ, সবই অসমীয়া কবির লেখনীতে ধরা দিয়েছে। এইতেই বোঝা যায় কবির দৃষ্টি সৃষ্টির কোন গভীর তলে পৌঁছেছে। অসমীয়া রামায়ণে আমরা একটি নূতন ঘটনার সমাবেশ দেখি। এই ভাষ্যে পাই, এক প্রৌঢ়া কুব্জী ভরতের প্রেমে পড়ে ছটফট করছে এবং তাঁর মাতুলালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সে সুসজ্জিতা হয়ে তাঁকে প্রেম নিবেদন করতে যাচ্ছে। এই ঘটনার আভাস সংস্কৃত রামায়ণের কোনো অভিজাত সংস্করণে নেই, এর মাধ্যমে অসমীয়া কবি সাধারণ জনগণের রুচির প্রতিই নজর দিয়েছেন বলা চলে। তাছাড়া বিমাতার কাছে পিতৃসত্য পালনার্থে রামের যে বীরসুলভ আচরণ ও উক্তি বা পিতার কৈকেয়ীর প্রতি অথবা মোহমুগ্ধ-আসক্তি ও তার সুযোগে কৈকেয়ীর যে গর্হিত আচরণ—যে সব আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে ওজস্বিনী ভাষায় পড়ি তার পুনরুক্তি অসমীয়ায় পাই না। বরং এখানে দেখি একটি বীর নায়কের বৃথা সদর্প হুঙ্কার, যার কোনো মূল্য নেই। মোটের উপর চমৎকার ভাষান্তরে এই সামান্য ত্রুটিগুলি নগণ্য। কাব্যের বিচিত্র রসধারার পশ্চাদপট আঁকতে, স্বাভাবিক ভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্যবর্ণনায় ও যেখানে যে ধরনের ভাবপ্রয়োগ প্রয়োজন তার প্রচেষ্টায় প্রতিরূপ শব্দচয়নে ও পরিস্থিতি গড়তে, কবি যথেষ্ট শৈল্পিক দক্ষতা দেখিয়েছেন। সুন্দরী অযোধ্যানগরীর দৃশ্যের পর দৃশ্য, রামের নির্বাসনে দশরথের হৃদয়মন্থনকারী শোকবিহ্বল চিত্র, স্বদেশ থেকে দূরে বনবাসে রামের সহগামিনী হলে সীতার যে সব কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা, সীতাকে তার ভাবগম্ভীর বর্ণনা ও নিরুৎসাহ করার চেষ্টায় রামের যে ওজস্বিনী বক্তৃতা, চিত্রকূট বনে তাঁদের বাস—মন্দাকিনী নদীর শান্ত সৌন্দর্যের মনোগ্রাহী ছবি—সবই যেন সেইকালের আসামের ও অসমীয়াদের সুন্দর প্রতিচ্ছবি ও সুকল্পিত সুচারু বিন্যাস। বিধিদত্ত গুণাবলীর অধিকারী এই কবির সর্বাপেক্ষা স্মরণযোগ্য যে দান সেটি হচ্ছে এমন একটি ভাষার প্রচলন যেখানে প্রাচীন দেশজ ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সুনিপুণ মিশ্রণ এবং তার ফলে একটি নূতন প্রকাশভঙ্গির উদ্ভাবন যা তাঁর সমকালীন কোনো লেখক পারেন নি এবং যা পরবর্তী যুগের কবি-সাহিত্যকদের নূতন পথের নির্দেশ দিয়েছে। যখনি তিনি একটি নগরী, দেশ বা বন উপভূমির বর্ণনা

করেছেন তখনি এমনই স্থন্দরভাবে তাঁর কল্পনাকে শব্দসম্ভারে রূপায়িত করেছেন যে সেটাকে অনুকরণ বা অনুবাদ বলে মনেই হয় না, যেমন—বৃক্ষ মাত্রেই তার পত্ররাজি থাকে বা কোকিল মাত্রেই কুহুধ্বনি অনুরণিত। যখন তিনি কোনো বনের কথা বিস্তৃত করে বলেন তখনই সেখানকার নানা ধরনের বৃক্ষলতা ফুল ও পাখিদের কথাও বর্ণিত হয়েছে। সে যেন এক অজস্র বৃষ্টিপাত এবং সেখানে কবি যে স্থানে যে শব্দের প্রয়োগ উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন তারই প্রয়োগ দেখি। মাধব কন্দলীর কাব্যরচনার আর একটি বিশেষত্ব যে তাঁর বলবার ভঙ্গিতে ও ভাবের বৈচিত্র্যে মূলের অপেক্ষা কিছু নূতনত্ব পাওয়া যায় যাতে সে বর্ণনাগুলি আরও রসগ্রাহী হয়। তা ছাড়া তিনি দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার চিত্র থেকেও বহু উপাদান আহরণ করে তাঁর কবিতাকে সাজিয়েছেন যাতে পণ্ডিত, মূর্খ, সন্ন্যাসী, জনসাধারণ, ভক্ত, কর্মী সকলেই সমান রসাস্বাদনে সমর্থ হয়, যে ধারাবাহিকতা আমরা পরে বৈষ্ণবযুগের সন্ত মহাপুরুষদের রচনায় পাই।

'দেবজিৎ' নামে আর একটি কাব্য মাধব কন্দলীর নামের সঙ্গে যুক্ত। এখানে কৃষ্ণকে বিষ্ণু, অন্য অবতার বা অন্য দেবতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করবার চেষ্টা হয়েছে।

এই যুগের আর একজন কবি, যিনি রামায়ণ নিয়ে কাজ করেছেন—তাঁর নাম কবি দুর্গাবর। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ, কামতারাজ বিশ্বসিংহের আশ্রিত কবি এবং নীলাচল পাহাড়ে বাস করতেন। দুর্গাবর, কন্দলী রামায়ণের কয়েকটি কাণ্ডে স্থর যোজনা করেন। সংগীত আসরের উপযুক্ত করে গীতি আলেখ্যে লিপিবদ্ধ করেন—তিনি কন্দলী রামায়ণের কিছু শ্লোকও অল্প-স্বল্প পরিবর্তন পরিবর্ধন করে গীতোপযোগী করে প্রচার করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে অসমীয়াদের মধ্যে আর্য, মন-খ্মের, তিব্বতী-বর্মী, থাই বা শান ভাষা-ভাষী মানুষ আছে। এর ফল হয়েছিল এই যে অনার্যদের বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠান, লোকাচার, বিশ্বাস ও কাহিনী ধীরে ধীরে আর্যসমাজের অঙ্গীভূত হয়ে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় ও উপকথার উপকরণ জোগায়। তার মধ্যে একটি সর্পপূজা। অসমীয়ারা মনসাদেবীকেই এর প্রতীক করে নিয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে বহু ধরনের ও নানারূপে মনসামঙ্গল ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কীয় নানা গান রচিত হয়। এগুলি এখনও মনসাপূজা উপলক্ষে গীত হয়।

মনসা সম্পর্কীয় গীতগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্বে থাকে শিব-দুর্গার পৌরাণিক কাহিনী ও মনসার জন্মবৃত্তান্ত, চণ্ডীর সঙ্গে তাঁর কলহ ও বিবাহ। দ্বিতীয় পর্বে পাই মনসার পরম ভক্ত হালিক ও জালিকের মনসাপূজা প্রবর্তনের ইতিকথা। তৃতীয় পর্বে মনসার সঙ্গে শিবভক্ত চাঁদ সদাগরের প্রতিযোগিতা ও মনসাকে দেবী বলে স্বীকার করতে অনিচ্ছা ও তাঁর প্রতি তীব্র বিদ্বেষ। এরই পরিণাম তাঁর ছয় পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু ও বাণিজ্যসম্ভার বোঝাই চোদ্দটি ডিঙার সমুদ্রের জলে ডুবে যাবার ইতিহাস। মনসা কিন্তু এতেই ক্ষান্ত থাকেন। চাঁদ সদাগরের সপ্তম পুত্র লখিন্দরও বিয়ের রাত্রেই সর্পদষ্ট হয়। নববিবাহিতা অসহায়া কন্যা বেহুলা একটি ভেলায় শবদেহ নিয়ে দীর্ঘ নদীপথে কৈলাস যাত্রা করে। কৈলাসের কাছাকাছি একটি ঘাটে শিবের ধোপানী নেত্যার সঙ্গে পরিচয় হয় এবং ওরই সাহায্যে মহাদেব বেহুলার স্বামীকে পুনর্জীবিত করতে মনসাকে অনুরোধ করেন এবং সেই সঙ্গে চাঁদ সদাগরের সুসজ্জিত চোদ্দটি ডিঙাও ফেরত দিতে আদেশ দেন। তবে এইটুকু স্থির হয় যে চাঁদ মনসাকে অন্তত একবার দেবী হিসাবে পূজা দেবেন। বেহুলা জীবিত স্বামীকে নিয়ে পুনরায় শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন এবং চাঁদকে মনসাপূজা করতে স্বীকৃত করান। চাঁদ অবশ্য তাই করেন কিন্তু তিনি খুব সুস্থির চিত্তে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেন নি এবং বামহস্তে মনসাপূজা করেন। তবু চাঁদ যে মনসাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন সেইজন্য তাঁর নষ্ট দ্রব্যাদি ফেরত পান।

এই কাহিনী শুধু অসমীয়া নয়, নিকটবর্তী আরও অন্যসব জাতি ও উপজাতিদের নানা গল্পের ও প্রবাদের ভিত্তিতে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। অনেকে মনে করেন যে এটি একটি বহু পুরাতন বিবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র শিবভক্তদের সঙ্গে অন্য ধর্মমতের। এইজন্য মনসাকাব্যে লোকায়ত দেবদেবীর নাম ছাড়াও অন্য বহু দেবতার কথা পাওয়া যায়। এইসব কাব্যে খুব সূক্ষ্মভাবে মানব চরিত্রের নানাদিক এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে যে এগুলিকে মানবিক দলিল হিসাবেই গণ্য করা যায়।

মনসা কাহিনীর প্রথম কবি মানকর। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর আবির্ভাব। রামায়ণ গীতিকার দুর্গাবরও মনসাকাব্যের রচয়িতা। তিনিও মানকরের মতো ঐ ধরনের গীতির মাধ্যমে সেই যুগের সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্য-যুক্ত কয়েকটি সুন্দর ছবি বেহুলা কাব্যের মধ্যে দিয়ে গ্রথিত করেন।

অসমীয়া সাহিত্যে কবি নারায়ণদেবই মনসাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তাঁকে সুকবিও আখ্যা দেওয়া যায়। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে 'সুকনান্নী' নামে বেহুলা লখিন্দর গীতির প্রবর্তন করেন। নারায়ণদেবের বেহুলা-লখিন্দর গাথা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর গানের পালার মধ্য দিয়ে তিনি তৎকালীন সমাজ-জীবনের একজন সুস্থ প্রবক্তা হয়ে জাতির গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখ বেদনাচেতনার একজন সুদক্ষ শিল্পী হিসাবেই প্রতিভাত হন। চরিত্র চিত্রণে ও ভাববিন্যাসে সেই যুগের সহজ সরল মানস চেতনাকে তিনি পরিস্ফুট করেছেন এবং মধ্যযুগের অসমীয়া সমাজের একটি অনবদ্য চিত্র আমাদের সামনে ধরেছেন। তাঁর চাঁদ সদাগর এক শ্রেষ্ঠ আত্মবোধসম্পন্ন অসমীয়া মানুষ, যিনি কোনরকম প্রলোভনে বিচলিত নন এবং অনুদ্বিগ্ন মনে সুখে বিগতস্পৃহ হয়ে আত্মকর্মক্ষম হতে পারেন। কিন্তু যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত বেহুলার আকৃতিতে পদ্মা বা মনসাকে পূজা করতে সম্মত হলেন, সেই আত্মনিবেদনের পরাজয়ের মধ্যেও তাঁর আত্মমর্যাদার হানি হয় নি। এতে শেষ পর্যন্ত বেহুলার জয় কীর্তিত হয়—এই সতীসাধ্বী হচ্ছেন সেই পরম তত্ত্ব ও চরম ভক্তির প্রতীক যা পর্বতকেও টলায়। স্বামীর প্রতি প্রবল প্রেম, সতীত্বের তেজ দেবতাদেরও স্বীকৃতি লাভ করে। আদর্শ পত্নী হিসাবে সীতা ও সাবিত্রীর সমকক্ষা তিনি। লেখকের কয়েকটি সরল চিত্রেই চাঁদ সদাগরের স্ত্রী মাতা সনকার চরিত্রও ফুটে উঠেছে। একটি দুঃখিনী পরিত্যক্তা সর্বরিক্তা মাতার চরিত্র অদ্বিতীয় গভীর বিয়োগান্ত নাটকীয় অনুভূতিতে চিত্রিত হয়ে একটা করুণ স্পর্শ রেখে যায়। তুলনা হিসাবে বলা যায় যে এই ধরনের সুগভীর অনুভবের স্তর দেখা যায় সিঞ্জের 'দি রাইডার্স টু দি সি' নামক পুস্তকে 'মৌরা'র চরিত্রে। নামে দেবী হলেও মনসা বা পদ্মা হিংসাপরায়ণা নারী, কলহপ্রবণা ও নীচাশয়া। বেহুলা কাব্যগুলিতে মানুষ ঈশ্বরের সমমর্যাদাসম্পন্ন হয়েছে, আর দেবতারা পার্থিব ক্ষুদ্রতায় নেমে এসেছেন। এইসব কাব্যগুলির সাহিত্যিক মূল্য যাই হোক, আমাদের জন্য তারা রেখে গেছে তখনকার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও বিচারের স্থায়ীনিদর্শন এবং সমাজ-জীবন ও সাহিত্যের প্রতিচ্ছবিরূপে পরবর্তী সাহিত্যকে ও জাতীয় ঐতিহ্যকে একটি শক্তিশালী সূত্রে বেঁধে দিতে সাহায্য করেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বৈষ্ণবীয় যুগ (১)

ষোড়শ শতাব্দীর আসামে, আকাশ পথে প্রজ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের মতো দুটি দুর্ধর্ষ শক্তি প্রায় একই সময়েই আধিপত্য লাভ করেছিল—তারা হচ্ছে কোচ ও আহোম এবং সমস্ত দেশটি এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই বিভক্ত হয়েছিল। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন কামতাপুর রাজ্য আলাউদ্দীন হুসেন শাহের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় এবং কিছুকাল সেখানে নৈরাজ্য চলে। ঐ ভস্মস্তূপের মধ্যে থেকেই খানিকটা সময় অতিবাহিত হলে একটি নূতন রাজ্যের পত্তন হয়। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে কোচ জাতির নেতা বিশ্বসিংহ কোচবিহার নামে একটি রাজ্যের সূচনা করেন যার রাজধানীর নাম বর্তমান কুচবিহার। এঁরই পুত্র নরনারায়ণ (মহামান্য আকবর বাদশাহের সমকালীন) কুচবিহারের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি কাশীতে শিক্ষা-লাভ করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। তিনি ও তাঁর ভ্রাতা শুক্লধ্বজ বা চিলারায় তাঁদের সভায় কাশী ও অন্যান্য বিদ্যাপীঠ থেকে গুণীজন ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে আনতেন। দুজনেই ছিলেন হিন্দু-ধর্মের বিশেষ রক্ষক ও বাহক এবং শিক্ষা ও বিদ্যার প্রসারে উৎসাহী। এর ফলে নরনারায়ণের প্রজাদের সাংস্কৃতিক মান উন্নত হয়েছিল। নরনারায়ণের রাজত্বকালে জনৈক ইংরেজ পর্যটক রালফ্ ফিচ্ (Ralph Fitch) কুচবিহার ভ্রমণে আসেন এবং তিনি এই অসমীয়া রাজ্যে পশু হাসপাতাল ও হিংসার প্রতি অনীহা দেখে সুখ্যাতির সঙ্গে বিশদ বর্ণনা দেন। নরনারায়ণ সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সন্ত কবি ও তাঁর সহধর্মীদের নিজের সভায় সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁকে বহুমূল্যবান দ্রব্যাদি প্রচুর দক্ষিণা ও নানা প্রণামী দেন। তিনি এক সময় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণেও উৎসুক ছিলেন। কিন্তু মহাপুরুষ কোনো রাজাকে দীক্ষা দিতে অসম্মতি জানান। চিলারায় কিন্তু শংকরদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলাপ্রিয়াকে বিবাহ করেন এবং এই মিলনের ফলে শংকরদেবের বৈষ্ণববাদ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে।

এই সময়েই আহোমরা আসামের পুব দিকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে

চেষ্টা করেছিল। আসামের রাজা স্থহুংমুং বা ডিহিঙ্গিয়া (১৪৯৭-১৫৩৯) সদিয়ার মাঝখানে চুটিয়াদের রাজ্য অধিকার করে নেন এবং কাচারীদের ডিমাপুর থেকে বিতাড়িত করেন এবং ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে ভূঁইয়া রাজাদের বশীভূত করেন। স্থহুংমুং কোচরাজ বিশ্বজিতের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং আসাম ভ্রমণে (১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) আসেন। আহোম রাজাদের মধ্যে স্থহুংমুংই প্রথম হিন্দুধর্ম ও হিন্দুনাম স্বর্গনারায়ণ গ্রহণ করেন ও হিন্দুমতে জীবনযাপন করতেন। আসামের চিন্তাবীর, কবি ও সংস্কারক শংকরদেব তাঁরই রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরই শাসনকালে বৈষ্ণবীয় নবজাগরণের অভ্যুত্থান এবং তার শিকড়গুলি আসামের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছিল।

শংকরদেব (১৪৪৯-১৫৬৯) বর্তমান নওগাঁ শহরের ষোল মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ তীরে আলিপুখুরী গ্রামে এক ভূঁইয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ভূঁইয়ারা তখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অনুসারে শক্তিশালী ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং রাজনির্দেশে নানা স্থখস্থবিধা ভোগ করতেন। শংকর পরিবার এই জমিদার বংশের প্রধান ছিলেন এবং তাঁদের বলা হত শিরোমণি ভূঁইয়া। তাঁর পিতার নাম কুস্থমবর এবং তাঁর জন্মের তিনদিনের মধ্যেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হওয়ায় পিতামহী খেরস্থতী তাঁকে লালন পালন করেন। শংকরের বয়স যখন বারো বছর তখন তাঁকে মহেন্দ্র কন্দলী নামে একজন বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়।

বাইশ বছর বয়সে তাঁর শিক্ষার শেষ হয় এবং তিনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ হয়ে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করেন। তার স্বল্পকাল পরেই তাঁর জোয়ান কাঁধে কতকগুলি গুরু কর্তব্যভার নিতে হয়। সূর্যবতী নামে এক কায়স্থ বংশজাতা তরুণীর সঙ্গে তাঁর পরিণয় হয়। সূর্যবতী একটি কন্যা রেখে চার বছরের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। ঐ সময়েই শংকরের পিতৃবিয়োগ ঘটে। এই দুই বিচ্ছেদে তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হন ও সংসার ত্যাগের সংকল্প করেন। কন্যার বিবাহের অব্যবহিত পরে (১৪৯[illegible]) তিনি সারা ভারত তীর্থভ্রমণে যান। ঐ পরিক্রমায় তাঁর শিক্ষাগুরু মহেন্দ্র কন্দলী তাঁর সাথী ও সহযাত্রী হন। তাঁর শিষ্যদের দ্বারা অনুলিখিত জীবনচরিতে দেখা যায় যে তিনি উত্তরে ও দক্ষিণে ভারতের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ পবিত্র তীর্থস্থান ও মন্দিরগুলি পরিদর্শন করেন।

তাঁর গন্তব্য ও দ্রষ্টব্য তীর্থস্থানগুলির মধ্যে ছিল গয়া, পুরী, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, কাশী, প্রয়াগ, সীতাকুণ্ড, বরাহ কুণ্ড, অযোধ্যা, বদরিকাশ্রম। এইসব পুণ্যস্থানে তিনি নানা মতের বৈষ্ণবীয় আচার্যদের সাক্ষাৎ পান এবং তাঁদের সঙ্গে নানা আলাপ আলোচনা তর্ক বিচার বিশ্লেষণ করেন। এইসব বিদগ্ধ পণ্ডিত-মণ্ডলীর শাস্ত্রীয় বাদবিতণ্ডা ও গভীর আলোচনা তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় ধর্ম-মতকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে। এই ভাবে দ্বাদশ বৎসরকাল তিনি পরিব্রাজক রূপে নানা বৈষ্ণবতীর্থ ও মহাপুরুষদের আশ্রম দর্শন করে বৈষ্ণব সাধনার মর্মকথার সার গ্রহণ করতে উদ্যোগী হন এবং নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর বহু ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় তিনি নানা তপস্বী, মনস্বী, মঠ, আশ্রম বিদ্যায়তন, শিক্ষাসত্রের সঙ্গে পরিচিত হন, তর্ক ও আলোচনায় যোগ দেন। তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাসে এইসব স্মৃতির ও শ্রুতির চিহ্ন পড়েছে।

শংকরদেবের আবির্ভাবকালে আসামে শাক্ত[১] ও তান্ত্রিক[২] উপাসনা পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। শংকরদেবের পূর্বপুরুষ সকলেই শাক্ত ছিলেন। একজনের নাম ছিল দেবীদাস (অর্থাৎ ভগবতীর সেবক) কারণ শাক্ত মতানুসারে তিনি অনন্য মাতৃভক্ত ছিলেন। শংকরদেবের প্রধান ভক্ত শিষ্য মাধবদেব ও আর একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহাজন ভট্টদেব বৈষ্ণব উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করবার পূর্বে শাক্ত মত পোষণ করতেন। সেই সময় গৌহাটির কামাখ্যা মন্দির, সদিয়ার তাম্রেশ্বরী মন্দির, ডুবির পরিহরেশ্বর মন্দির, দরেগাঁওয়ের মহাদেব মন্দির শক্তি সাধনার পীঠস্থান ছিল এবং ঐ সব মন্দির মণ্ডপ থেকেই তান্ত্রিক সাধনার প্রসার, প্রচার ও প্রভাব সাধুসন্ন্যাসী সম্প্রদায় থেকে পুরোহিত পূজারী, জনগণ ও গৃহস্থদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। সমাজের সকল স্তরের উপরই এর প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে। কালক্রমে তান্ত্রিক সাধনার বিস্তৃত আচার পদ্ধতিতে আদিবাসী-দের বহু উপাসনাপ্রণালীও মিশ্রিত হয়ে যায়, এমন কি নরবলি পর্যন্ত। শংকরদেবের আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই তান্ত্রিক পদ্ধতি আপাতমনোহর

---

১ যে ধর্মসাধনায় দৈবী শক্তিকে বিশেষভাবে স্ত্রীরূপে কল্পনা ও পূজা করা হয় যেমন দুর্গা, কালী, কামাখ্যা, চণ্ডী ইত্যাদি।

২ শাক্তধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে বহু অতিমানবিক আচার, আচরণ, ক্রিয়া, অলৌকিক কার্যকলাপ, যাকে ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

হলেও বহু কুৎসিত আচার অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। যাদুবিদ্যা, মন্ত্রপাঠ এবং ঐ ধরনের কতকগুলি অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকল্পই মুক্তির সহজলভ্য উপায় হিসাবে নির্ণীত হয়। তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে যতই গুণ থাকুক না কেন, এই সব গূঢ় আচার অনুষ্ঠান ক্রমশ বিকৃত হয়ে নৈতিক অবনতি, সামাজিক দুর্নীতি, অনাচার ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়েছিল।

শংকরদেব তীর্থ যাত্রা শেষ করে প্রত্যাবর্তন করলে শাক্ত উপাসনা ও ক্রিয়া কলাপের বিরুদ্ধে অনলস যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শূন্যগর্ভ শাক্ত সাধনার বিরুদ্ধে তাঁর এই তীব্র প্রতিবাদ তাঁকে আধ্যাত্মিক মহিমায় মণ্ডিত করে। তিনি বাহ্য আচার বিচার উপাসনা পদ্ধতিকে তুচ্ছ করে হৃদয় কন্দরে অন্তর্নিহিত ভক্তিরসকে উদ্‌বোধিত করাই সত্তার অনির্বচনীয়তার শ্রেষ্ঠ উপাদান এই মত প্রচার করেন এবং সেই অখণ্ড বিশ্বাসেই তিনি তাঁর বৈষ্ণব পুনর্জাগরণ আন্দোলন আরম্ভ করেন। শংকরদেব বৈদিক আচার অনুষ্ঠান যজ্ঞাদি বর্জন করেন, বহুদেবদেবী-বাদও স্বীকার করতেন না এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম দেন 'এক শরণ নাম ধর্ম' অর্থাৎ সেই এক পরমপুরুষের কাছে সম্পূর্ণ নতিস্বীকার এবং তার শরণ নেওয়া। সেই একেকেই বলা হয় বিষ্ণু, যিনি যুগে যুগে নারায়ণরূপে নানাভাবে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিষ্ণুর সর্বোত্তম প্রিয় লীলা কৃষ্ণলীলা। শংকরদেবের উক্তি হচ্ছে 'একমাত্র ভগবান আছেন আর ভক্তি আছে, আর কিছু নেই'— সেই অদ্বিতীয় পরম একের কাছে আত্ম সমর্পণই তাঁর প্রচলিত ধর্মের কঠোর অনুশাসন একশরণীয়াদের কাছে অন্য দেবদেবী পূজা একেবারে নিষিদ্ধ। সন্ত শংকরদেব নাকি বলেছেন, 'বৈষ্ণব অন্য কোনো দেবতার মন্দিরে পূজা দেবে না এবং সে স্থানে নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করবে না কারণ এই ধরনের দুর্বলতা বা বাচালতা তার ভক্তিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে।'

শংকদেবের ধর্মে ভক্তির যে প্রাধান্য তা তাঁর নিজের অনূদিত ভাগবতের এক উক্তিতে দেখা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত উক্তিটি এই ইঙ্গিত বহন করে, 'জনগণ নিজেদের খেয়াল খুশি মতোই ভাগবতের ব্যাখ্যা করে। ভক্তি ব্যতীত সব ক্রিয়াকর্মেরই প্রামাণিক উক্তি নাকি সেখানে আছে, কেউ কেউ বলেন বেদোক্ত ক্রিয়াকর্মের কথাও সেখানে পাওয়া যায়, যেমন নানা অনুষ্ঠান, দান, যজ্ঞ, তর্পণ ইত্যাদি। আবার এমতও শোনা যায় যে বেদে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেবতাদেরও পূজার বিধি, তীর্থযাত্রা, পবিত্র জলে স্নান প্রভৃতি

ব্যবস্থা আছে। আবার কারো মত যে জ্ঞানের মধ্য দিয়েই আনন্দ পরমানন্দের অনুভূতি সম্ভব। বেদের কর্মকাণ্ডের ভাষ্যকাররা ও ব্যাখ্যাতারা নিজ মত ও পথ অনুযায়ী অনুপ্রাণিত। কিন্তু শোনো তোমরা বিশ্ববন্ধুজন, আমাকে শুধু জ্ঞান, তপস্যা, ত্যাগ বা দানের দ্বারাই পাওয়া যায় না। যোগের দ্বারাও নয়, জ্ঞানের দ্বারাও নয়—ভক্তিই আমার বন্ধন, ভক্তি দ্বারাই আমাকে পাওয়া যায়।'

এই কথাটি মনে রাখা উচিত যে শংকরদেব তাঁর ধর্মমতে একটা মধ্যপথ গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন—সব কিছু ত্যাগ, কঠোর তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন বা পারিবারিক সম্পর্ক ছেদ করে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন নয়। তিনি দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতেই আগ্রহী ছিলেন—ত্যাগ হবে অন্তরের, শুধু বাইরের নয়। তিনি বুঝেছিলেন যে এই সংসারে স্ত্রীপুরুষকে বাস করতেই হবে এবং তাদের যথা নির্দিষ্ট কাজকর্ম করতে হবে। মহাপুরুষ স্বয়ং তাই গৃহীর সম্পূর্ণ পারিবারিক জীবন যাপন করেছিলেন এবং প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তীর্থযাত্রার শেষে প্রত্যাবর্তন করে দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করেন। তাঁর ধর্মমত ছিল সহজ সরল শুদ্ধ গার্হস্থ্য জীবন যাপন এবং তার দ্বারাই জীবনকে ভক্তি-রসাশ্রিত করে মুক্তির প্রয়াস ও রীতিনীতির সংরক্ষণ। সেই জন্যই ভগবান বুদ্ধের মতো তাঁর পথও জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে এবং সমগ্র দেশেই বিস্তৃতি লাভ করে।

শংকরদেবের প্রধান বক্তব্য ছিল যে গার্হস্থ্যাশ্রমে, শুধু নিজের পরিবারের বা আত্মীয়স্বজনদের ভরণপোষণে নয়, বহু দুঃখী ও দুঃস্থ লোকের সেবায়, দানে এবং ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী আচার অনুষ্ঠান পালন করে মানুষ অনেক কিছু লোকহিতকর কাজের দ্বারা সমাজের উন্নতিসাধন করতে পারে। এই জীবন-নীতির প্রবক্তা হিসাবে মহাভারত এবং গীতার কর্মযোগের (প্রবৃত্তিমার্গ) উদাহরণ তিনি দিতেন। তিনি মাঝে মাঝে মহাভারতে উল্লিখিত ঋষি সুমরশ্মির গার্হস্থ্যাশ্রমের সপক্ষের যুক্তি উদ্ধৃত করতেন—জীবনে দুঃখ ও সুখকে সমানভাবে গ্রহণ করে সমতা আনাই মুক্তিলাভের একটি বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় ধর্ম। মনের এই সাম্যবিধান করতে হলে গার্হস্থ্য জীবনযাপন একটি অবশ্যম্ভাবী পন্থা, যেখানে লাভালাভে সমদৃষ্টি সুখে বিগতস্পৃহ ও দুঃখে নিরুদ্বিগ্ন মন হওয়া সম্ভব। যেমন সন্তানেরা মায়ের উপরই বেশি নির্ভরশীল তেমনি চতুরাশ্রমের মধ্যে আর তিনটিও গার্হস্থ্যাশ্রমের উপরই বেশি নির্ভরশীল।

শংকরদেবের ধর্মবাদ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আরও নব নব ব্যাখ্যা ও গভীরতা এনে দিল। আসামের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম মানুষকে মানুষরূপে মহিমান্বিত করে দেখার উপর জোর দেন। তার ধনসম্মান, বংশ-গৌরব, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—যে সব ঘটনার সঙ্গে তার জন্ম কালীন কোনো দায়িত্ব ছিল না, সে সব উপেক্ষা করে তাকে মানুষ বলে স্বীকার করাই উচিত ও সব মানুষই সমান এই সত্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই আদর্শ ই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধর্মসম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ, শূদ্র এবং আরও নিম্নজাতীয় স্ত্রীপুরুষরা সকলেই এক পর্যায়ভুক্ত এবং তাই উপাসনায় ভক্তিতে বা প্রার্থনায় সকলের সমান অধিকার। শংকরদেব বলতেন, 'কৃষ্ণের নাম ভক্তিভরে উচ্চারণ করতে হলে ব্রাহ্মণ হতে হবে কেন? ভগবানের নামোচ্চারণ করে না এমন মানুষের চেয়ে চণ্ডাল বা অতি নীচ জাতির মানুষের স্থান অনেক উঁচুতে।' সমাজের সর্ব স্তরের মানুষকেই তাঁর ধর্ম সম্প্রদায় গ্রহণ করেছে এবং তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়াও উপজাতি ও মুসলমানরাও ছিলেন।

শংকরদেব প্রথম কয়েক বৎসর তাঁর নিজের জন্মস্থান বা পৈতৃক বাসস্থান বরদোয়া (নওগাঁ জেলা) থেকেই তাঁর ধর্মযাজনার কাজ চালাচ্ছিলেন এবং ঐ স্থানই তাঁর মহৎব্রত প্রচারের পীঠস্থান বলে গণ্য হয়েছিল। সেখানে তিনি একটি নামঘর (মঠ) স্থাপন করেন, যেখানে নাম কীর্তনে মণ্ডপ মুখরিত হত। ধর্মমূলক গান, যাত্রা, অভিনয় ইত্যাদি নয়, সেবা ও প্রচারমূলক কাজও চলত। এই সব নতুন ধরনের ধর্মপ্রচারের উপকরণ নিয়ে তিনি জনগণকে উদ্‌বোধিত করে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। তাঁর ধর্মমতের সার্বিক গ্রহিষ্ণুতা ও সহজ সরল উপদেশগুলি সকলকে আকৃষ্ট করে ও শীঘ্রই তাঁকে কেন্দ্র করে একটি বৃহৎ শিষ্যমণ্ডলী গড়ে ওঠে। মার্টিন লুথারের মতো তাঁকেও গোঁড়া পুরোহিত সমাজের (ব্রাহ্মণদের) বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কেন না তাঁর প্রচারিত ধর্মে ছিল সরল বিশ্বাস ও গণতন্ত্রোপযোগী শিক্ষা ও উপদেশ। তারা একশরণীয়া নামধর্মের প্রতি বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করতে আরম্ভ করল, কারণ তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠান পূজা পদ্ধতি বর্জন করবার উপদেশ দিলেন এবং দ্বিতীয়ত তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রানুশাসন, বচন ও মন্ত্রগুলিকে অসমীয়ায় অনুবাদ করে সকলজনগ্রাহ্য করে তুললেন। জনসাধারণের কাছে তাঁর বাণী জলন্ত অগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্রাহ্মণরা এতদূর সন্ত্রস্ত ও ভীত

হয়ে পড়েন যে আহোমরাজ স্থহুংমুং ডিহিঙ্গিয়ার (১৪৯৭—১৫৩৯) কাছে অভিযোগ পেশ করেন যে শংকরদেবের প্রেরণায় বেদবিরুদ্ধ রীতিনীতি ও ধর্মপ্রচার দেশের সর্বনাশ ডেকে আনছে। আহোমরাজ শংকরদেবকে তাঁর রাজ সভায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। শংকরদেব সেই দ্বৈরথে জয়ী হন এবং সসম্মানে রাজসভা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন যে এখানে বেশিদিন থাকলে তাঁর জীবনসংশয় ঘটতে পারে। অতএব তিনি এখনকার কামরূপ জেলার বড়পেটায় (১৫৪৩) গমন করেন। ঐ স্থান তখন কোচবিহারের হিন্দু নৃপতি নরনারায়ণের রাজ্যভুক্ত। বড়পেটাতে আলোকপ্রাপ্ত বিদ্যানুরাগী কোচরাজার সহায়তায় ও অভিভাবকত্বে অপেক্ষাকৃত শান্তিতে বাস করেন। বড়পেটাতে তিনি পথবৌসী সত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং একটি নামঘরও স্থাপন করেন এবং তাঁর বাণী ও উপদেশ নামামৃত ছড়িয়ে দেন। তাঁর রচনাবলীর বেশির ভাগই—কবিতা, নাটক, মহাকাব্য সবই এখানে রচিত হয়। বড়পেটায় তিন বছর বাস করার পর ৯৭ বৎসরের পরিণত বয়সে (১৫৪৬) তিনি পুনরায় তীর্থ পরিক্রমায় বের হন। একশতবিশজন ভক্ত তাঁর সহযাত্রী হন। এই যাত্রাতেই পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং কথিত আছে যে সন্ত কবীরের এক পৌত্রী বা দৌহিত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

পরবর্তীযুগে কয়েকবারই রাজা নরনারায়ণ তাঁকে রাজসভায় শাস্ত্রালোচনা ও তর্কযুদ্ধে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান। এইসব নিমন্ত্রণ ও নৃপতি নরনারায়ণের রাজসভায় যোগদান তাঁকে আরও খ্যাতিমান করে তোলে এবং তিনি একজন বিশিষ্ট বিদ্বান বুদ্ধিমান কবি ও সাধুসন্ত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলারায় রাজধানীর কাছে ভেলাভাঙায় একটি সত্র নির্মাণ করিয়ে দেন এবং শংকরদেব কুচবিহারে গেলেই সেখানেই অবস্থান করতেন। আসামকে যিনি দেবতা ও মানুষ সম্বন্ধে এক নব চেতনায় উদ্‌বোধিত করেছিলেন ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারে সেই বিরাট মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণ হয়।

শংকর-আন্দোলন আসামের সামাজিক ও ধর্মজীবনে শুধু একটি নূতন পন্থারই সন্ধান দিলে না, এর ফল হল সুদূর প্রসারী ও বহুযুগব্যাপী। অসমীয়া সাহিত্য ও শিক্ষার উপর এর প্রভাব ছিল অসীম। শংকরদেব যদিও নিজে একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তবুও তিনি অসমীয়া ভাষাতেই লিখতেন, যাতে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকেরাও ঐ ভাষায় লিখিত

কাব্য, নাটক, সাহিত্য ও শাস্ত্রের মর্ম ও রস গ্রহণ করতে পারে। তাঁর নিজস্ব মত প্রচারের জন্য তিনি লেখনী চালিয়ে যান এবং ভাষাগত ভাষ্য ও অনুবাদের দ্বারা তাঁর বক্তব্য এমনভাবে পরিবেশন করেছেন যে তিনি যা স্পর্শ করেছেন তাই হয়ে উঠেছে সোনার রঙে বিচ্ছুরিত। এই মানুষটি শুধু নানা শাস্ত্রপারঙ্গম মনীষীই ছিলেন না, নিজে কবিতা, গীতি আলেখ্য ও নাট্যরচনায় পারদর্শী ছিলেন যা অসমীয়া সাহিত্যকে নূতন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

শংকরদেবের প্রেরণার উৎস ছিল শ্রীমদ্ভাগবত, যেখানে জনগণমনোরঞ্জনকারী অবিস্মরণীয় নানা কথা ও কাহিনী, গল্প ও আখ্যানের মাধ্যমে বেদান্তের সার কথা প্রতিপাদিত হয়েছে। সেইজন্য অসমীয়া ভাষায় পুস্তকটির অনুবাদের প্রয়োজন ছিল। সংস্কৃতের মতো কুলীন ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থকে একটি প্রাদেশিক ভাষায় সুষ্ঠুভাবে রূপান্তরিত করাই তখনকার দিনে একটি মহৎ কর্ম ছিল। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর কাহিনী স্মরণ করা যেতে পারে। ব্রাহ্মণেরা যখন কোচ নৃপতি নরনারায়ণের কাছে শংকরদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তখনও তাঁকে শ্রীমদ্ভাগবতের একজন নিষ্ঠাবান পাঠক, শিক্ষক ও অনুবাদক বলেই অভিহিত করেছিলেন।

সমগ্র মূল ভাগবতের অনুবাদ একজনের পক্ষে সহজ ছিল না। সেজন্য শংকরদেব তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এই সুবৃহৎ কর্মের অংশ ভাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি শুধু প্রধান প্রধান সর্গগুলি নিজের হাতে রেখেছিলেন, যেমন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, এবং দ্বাদশ স্কন্ধ। শংকরদেব ব্যতীত অন্য যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, তাদের মধ্যে আছেন অনন্ত কন্দলী (চতুর্থ, ষষ্ঠ ও দশম স্কন্ধের অংশ বিশেষ), কেশবচরণ (সপ্তম ও নবম স্কন্ধ), গোপাল চরণ দ্বিজ (তৃতীয় স্কন্ধ), কবি কলাপচন্দ্র (চতুর্থ স্কন্ধের কিছু অংশ), শ্রীবিষ্ণু ভারতী (চতুর্থ স্কন্ধের কয়েকটি অংশ), রত্নাকর মিশ্র (পঞ্চম স্কন্ধের কিছু অংশ), শ্রীচন্দ্রদেব (চতুর্থ স্কন্ধে কিছু অংশ), অনিরুদ্ধ কায়স্থ (চতুর্থ ও পঞ্চম স্কন্ধের কিছু অংশ) এবং হরি (পঞ্চম স্কন্ধের কিছু অংশ)।

এই ভাবে অসমীয়া ভাগবত রচনা দেশের সাহিত্যে এক নবজাগরণের অধ্যায়ের সূচনা করে। শংকরীয় সাহিত্যের উপর এর সাংস্কৃতিক মূল্য বহুমুখী ছিল। অসমীয়াদের জাতীয় চেতনা, বিশ্বাস ও সত্যানুরাগকেও এটি নতুন ভাবে গঠন করেছে। শংকরদেব ভাগবত থেকে শুধু কৃষ্ণকথা ও কাহিনীই

পাননি, তার ছন্দ, ভাব, সুর, গমক ও ঐতিহ্যও সংগ্রহ করেছেন। শংকর প্রতিভার মহত্ত্ব শুধু অসমীয়ায় ভাগবত প্রণয়নে নয় বা অনুবাদে নয়, অসমীয়ায় সেই সব শব্দসম্ভারের ও বচন গঠনের সুষ্ঠু ও জীবন্ত প্রয়োগ নৈপুণ্যেও।

ভাগবতের সব কটি অধ্যায়ের মধ্যে আদি দশম (দশম স্কন্ধের প্রথমাংশ) সর্বাপেক্ষা জনগণমন হরণ করে। এই খণ্ডে কৃষ্ণের বাল্যজীবনের কথা গ্রথিত আছে, যেমন শিশু কৃষ্ণ কর্তৃক দৈত্যবধ, তাঁর ক্রীড়া ও গোপসখাদের সঙ্গে বনে বনান্তরে গোচারণ, বালজনোচিত নানা দুষ্টুমি, যেমন ননীচুরি, দুধচুরি, গোপ বালিকাদের সঙ্গে কলহ কোলাহল এবং পালিকা মাতা যশোদার কাছে দণ্ড গ্রহণ।

যদিও দশম স্কন্ধে আধ্যাত্মিক ভাব সুপ্রকটিত তবু তার মানবিক দিকগুলি সাধারণ মানুষকে বেশি আকৃষ্ট করেছে, যেমন মায়ের ছোটো ছেলের জন্য ভালোবাসা, শোকতাপ ইত্যাদি, যা সাধারণ মানুষের মনকে সহজেই আকর্ষণ করে। আর একটি কথা এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে শংকর-দেবের ভাগবতে শ্রীমতী রাধা অনুপস্থিত, যা অন্যভাষায় রচিত বা অনূদিত বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। শংকরদেবের সমগ্র সাহিত্য-সম্ভারে রাধা নেই।

ভাগবতের কথা ও কাহিনী বারে বারে শংকরদেবকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ভাগবত ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্যের অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তিনি মূল সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র হতে নানা উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তাঁর 'নিমি-নবসিদ্ধ সংবাদ' একটি ভক্তিমূলক শাস্ত্র গ্রন্থ যার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ হতে। রাজা নিমি নয়জন সিদ্ধপুরুষের কাছে হিন্দুপরমার্থতত্ত্ব সম্পর্কীয় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন— সেই প্রশ্নোত্তরের কাহিনীই নারদ বাসুদেবকে শোনান। এক একজন ঋষি এক একটি বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা করছেন, যেমন ভক্তি মায়া, তা থেকে মুক্তির উপায়, ব্রহ্মযোগ বা ধ্যানের তত্ত্ব, কর্মযোগ, অভক্তদের দোষাবলী এবং দিব্যাবতারের প্রকৃতিই বা কী। এইভাবে কতকগুলি জটিল আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন শংকরদেব এবং জানতে চেয়েছেন তাদের স্বরূপ কী। অসমীয়া ভাষায় এইভাবে নানা তথ্য সংবলিত তত্ত্বদর্শন ধর্ম জিজ্ঞাসা বা বেদান্তবাদের বিচার এর পূর্বে কখনও হয়নি এবং যে রকম

সুষ্ঠুভাবে সেগুলি আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে তা সত্যই অননুকরণীয়। যদিও এই সব দার্শনিক মীমাংসার বিচারের জন্য কাব্য হিসাবে পুস্তকটি উচ্চ স্থান অধিকার করেনি। তবু সাহিত্যিক প্রেরণাও পুস্তকটির একটি বিশিষ্ট অবদান, যেমন ভক্তির গুণাবলী এমন সুললিত শ্লোকে পরিবেশিত হয়েছে— উদাহরণ স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

যে ভগবদ কথায় ধ্যানে তন্ময় হয়, মাধব,
তার মূল তিনটি প্রয়োজন তখনি মিটে যায়
প্রথম তার কামেচ্ছা যায় কমে, শুদ্ধ ভক্তির পরশে
তারপর তার বাসস্থান বা দেহের প্রতি আসে অবহেলা
তার সব কিছু প্রেম ধায় কৃষ্ণের পানে স্ফীত হয়ে
তিনিই ত প্রেমের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু
তিনটি নিধিই মেশে সেই মহাসাগরে একের পারে
যেমন ক্ষুধার্ত খাদ্য দেখতে পেলেই ছোটে সেথায়
তেমনি আত্মার ক্ষুধারও আছে প্রশমন
শোনো রাজন্, নাও শরণ, প্রেমের ও ভক্তির প্রকৃত স্বরূপে
অপরূপা সেই ভক্তির একটু থাকলেই প্রেমের হয় জয়,
যেমন একটুখানি খাদ্য পেলেই অনেকের ক্ষুধার হয় তৃপ্তি—

'ভক্তি-প্রদীপ' নামে শংকরদেবের আর একটি ভক্তিমার্গের দার্শনিক ভাবনা-চেতনার পুস্তক আছে—যেটিতে নানাভাবে 'ভক্তি'র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যদিও জনশ্রুতি এইরূপ যে গ্রন্থটি গরুড় পুরাণের উপাদান হতে সংকলিত, তবু ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সঙ্গেও এর মিল বেশি। তাঁর 'অনাদি পাটন' মূলত ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত তবে বামন পুরাণের কিছু কিছু আখ্যানও এতে স্থান পেয়েছেন। গ্রন্থটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিন্তা চেতনা ধারণা নিয়ে লেখা এবং এর নিছক সাহিত্যিক মূল্য কম। 'গুণমালা' আর একখানি পুস্তক যা কোচরাজা নরনারায়ণের অনুরোধে কবির শেষ জীবনে লিখিত। এটি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের ভাবার্থে লেখা এবং একটি বৃহৎ স্তব বা স্তোত্র হিসাবে রচিত। এই স্তবমালিকায় ছয়টি ছোটো অধ্যায়ে ভগবান বিষ্ণু ও কৃষ্ণের গুণগাথা বর্ণিত হয়েছে। একটি মাত্র স্তোত্রে কবি কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী এমনভাবে গ্রথিত করেছেন যে আসামে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী এমন

কেউ নেই যিনি এই গুণমালা কণ্ঠস্থ করেন নি। এই কবিতাটির বৈশিষ্ট্য এই যে—অনুপ্রাস, গম্ভীর নাদ ও ছন্দ এটিকে সাবলীলভাবে আবৃত্তির সহায়তা করে।

শংকরদেবের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হচ্ছে 'কীর্তন ঘোষা' বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী কীর্তন। আজও এটি অসমীয়াদের মনে সুউচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের সৃষ্টি করে। উত্তর ভারতে সন্ত তুলসীদাসের 'রামচরিত মানসে'র মতোই এটিও সারা আসামে সশ্রদ্ধভাবে গৃহীত হয়। আসামে এমন হিন্দু পরিবার নেই যেখানে এই 'কীর্তন ঘোষা' বইটি যে কোনো পার্বণে পর্বে শুভকাজে এমন কি গৃহস্থের বাড়িতে রোগাদি হলে পঠিত না হয়।

কীর্তন ঘোষার সঠিক রচনাকাল জানা নেই। কিছু জীবনীলেখক বলেন যে তাঁর জীবনের কোনো একটি বিশিষ্ট পর্বে পুস্তকটি লেখা হয় নি, মাঝে মাঝে ছাড়াছাড়াভাবে রচিত, তবে শেষের দিকের কয়েক বৎসর সমস্ত পুস্তকটিকে একটি অখণ্ডরূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। কারণ, অনুমান হয়, শংকর-দেবের জীবনের শেষের দিকে তাঁর সমস্ত রচনাকে একত্র করে একটি গভীর ঐক্যের সূত্রে গেঁথে দেবার চেষ্টা ছিল প্রবল। তাছাড়া 'কীর্তন ঘোষা' একটি একটানা কাব্য নয়, ছাব্বিশটি কবিতার সংকলন, যেখানে নানা ছন্দে বিরচিত শ্লোক সংখ্যা হচ্ছে ২২৬১। সাধারণভাবে এই সব কবিতাগুলিকে ভাগ করা হয়েছে—আখ্যান, উপাখ্যান, কীর্তন, বর্ণনা এবং বৃত্তান্ত। যে সব কবিতা শোকধর্মী, তাদের বলা হয়েছে—প্রয়াণ গীতা। এর মধ্যে প্রায় বেশির ভাগ কবিতারই আকর সূত্র হচ্ছে ভাগবত পুরাণ। দুটি 'সহস্রনাম বৃত্তান্ত' ও 'ঘুনুচা-কীর্তন' তাঁর দুই শিষ্য রত্নাকর কন্দলী ও শ্রীধর কন্দলী কর্তৃক বিরচিত এবং তাঁদেরই অনুরোধে ঐ সংকলনে স্থান পায়। কীর্তনে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি কবিতাই সংস্কৃতে লিখিত একটি স্বতঃ উৎসারিত কাব্যের মতো স্বাধীন এবং বহু অনুভূতির ও রীতিনীতির বাক্ ও ভাব সমন্বয়। কীর্তন নামটির মধ্যেই ইঙ্গিত আছে যে এটি গীত হবার জন্যই লিখিত ও সম্মিলিত প্রার্থনায় গেয়। মূল কীর্তনীয়া শ্লোকটি সম্পূর্ণ গানের ভঙ্গিতে পড়ে শোনান এবং ঘোষাটির ধুয়া ধরেন এবং দলের অন্য গায়করা তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে এবং তালি দিয়ে সামঞ্জস্য রাখেন।

কীর্তন-ঘোষা শংকরদেবের সুচিন্তিত একটি প্রয়োগ বিদ্যা, যাতে দর্শকরা,

শ্রোতারা এবং অন্যেরা ভক্তিরসে অনুপ্রাণিত হয়। তিনি ভাগবত থেকে কতকগুলি রচনা সংগ্রহ করে এই উদ্দেশ্যে কীর্তন রচনা করেন যাতে ভক্তি-রসাপ্লুত হয়ে তারা তার মাধুর্য আস্বাদন করতে পারে ও নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। ঐ সব কাহিনীর মধ্যে আছে বালক ধ্রুবের সহজভক্তি, প্রহ্লাদের ভীতিশূন্য প্রেরণা, কুব্জার প্রেম, গোপবালকের সখ্য, বিপ্রদামোদর ও উদ্ধবের শুদ্ধা ভক্তি, গজেন্দ্রের ঐকান্তিকী প্রার্থনা, অজমিলের ভগবানের নাম উচ্চারণেই মুক্তি ইত্যাদি। এই ভাবে অসমীয়া ভাষায় কীর্তনে এই প্রথম পাওয়া গেল স্খলিত ভঙ্গিতে আপ্লুত ভাষায় রচিত এক কাহিনীপ্রবাহ যুগপৎ নীতিশিক্ষা ও আনন্দরসে ভরা। আধুনিক পাঠকের কাছেও কীর্তনের গুণ শুধু তত্ত্বজ্ঞান বা নীতিবাক্য নয় বরং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা, সাহিত্যিক রূপসৌকর্য, সুন্দর চিত্রকল্প ভাব ও তার সুনিপুণ রূপায়ণ এবং ছন্দের বৈচিত্র্য যা ঐ রচনাগুলিকে স্বদেশে ভালোবাসায় ও বিদেশে শ্রদ্ধায় মণ্ডিত করে আকর্ষক করে তুলেছিল। শংকরদেবের কবিতা অসমীয়াদের কানে তাদের ভাষার সমতুল্য বৈচিত্র্য ও সংগীত এনে দিয়েছিল। এর লোকপ্রিয়তা সম্বন্ধে শ্রীজ্ঞাননাথ বোরা ঠিকই বলেন, 'যা কিছু ভাব ও অনুমানগ্রাহ্য—সুখ ও কষ্ট, প্রেম ও বিরহ, ক্রোধ ও ক্ষমা কীর্তনে সমানভাবে মিশ্রিত হয়ে ছড়িয়ে আছে। সকল শ্রেণীর পাঠকপাঠিকার কাছে এগুলি নানা ধরনের গানের ও গল্পের বার্তাবহ, নবীনরা এর মধ্যে পায় কাব্যের সৌন্দর্য ও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধেরা ধর্মের উপদেশ। কীর্তন ঘোষা শুধু তার আধ্যাত্মিক রূপের জন্য বিঘোষিত নয়, এর মধ্যে আছে হৃদয়ের উন্মুক্ত প্রসার, দৃষ্টির নিরাবিল সুদূরতা যা সমস্ত শাস্ত্রীয় অনুশীলনের ঊর্ধ্বে।' আমরা এর মধ্যে সর্বকালের পক্ষে প্রযোজ্য মূল্যবান নীতিবাক্য বা উপদেশাবলী পাই তাতে বিস্মিত হতে হয় :

তোমার জীবন কয়েকটি বৎসরের মধ্যেই সীমায়িত তার মধ্যে অর্ধেক যায় নিদ্রায়
বছর বিশেক কাটে বাল্যের ও কৈশোরের লীলায়
দশ বছর কাটে অঙ্গুলি দিয়ে মুদ্রা গুনতে
মনে করে দেখো আরো বিশ বছর তার পরে থাকে

ঐ সূর্য প্রদক্ষিণের প্রহরে প্রহরে এক একটি অনন্ত মুহূর্ত
কেটে যায় দুঃখে কষ্টে ব্যথায়
প্রত্যেকটি সূর্যোদয় নিয়ে আসে জড়তা ও অজানা অসুখ এবং এইভাবেই
গোনা দিনগুলি যায় কেটে চোখের স্বপ্ন যায় ভেঙে
এবং তারার রং যায় মিলিয়ে
যেন একটি বদ্ধ ঘরে দুঃখের পশরা জমা হয়
(প্রহ্লাদ চরিত্র)

আবার নিম্নের এই কবিতাটিতে দেখি একটি শ্রদ্ধা সমন্বিত আত্মনিবেদনের সুর

অজ্ঞান ও আত্মাভিমান পূর্ণ
চতুর্দিকে আমি বেড়াই এই পৃথিবীর নানা চিন্তা নিয়ে
তোমার নেই সেই অহমিকা, তুমি আমাকে নিপাত করো
যেমন একটি সর্প আঘাত করে একটি ইন্দুরকে
(মুকুন্দ স্তুতি)

এবং

আমরা উচ্চ আধ্যাত্মিক সুরের ধ্যানস্তব বচনও ধরতে পারি
আমার বুদ্ধি মেঘাচ্ছন্ন হয় যখনি আমার আমিকে দেহের সঙ্গে
বিজড়িত করি
হায়, বুঝি না যে তুমি রয়েছ আমার মধ্যে হৃদ্দেশে
এবং বৃথাই অন্বেষণ করি তোমাকে বাইরে।
(শিশুলীলা)

উচ্চচিন্তার নিদর্শনও আছে, যেমন

যিনি উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে করেন না ভেদ
তাঁকেই লোকে বলে জ্ঞানীগুণী মহাজন, সমদৃষ্টিতে অছেদ
যিনি দাতাকে ও তস্করকে দেখেন সমান
নীচ ধূর্ত অধঃপতিতদের সঙ্গে করেন তুলনা তাদের
যারা ন্যায় পরায়ণ
(শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ প্রয়াণ)

শুধু দেবতা ও মানুষের গানই তাঁর কণ্ঠে আসে নি

একটা কুকুরের আত্মাও হচ্ছেন সর্বানুভূত ঈশ্বর
যেমন একটি গাধার বা সমাজ বহির্ভূত মানুষেরও ক্ষেত্রে,
এই কথাটি স্মরণে রেখে শ্রদ্ধা জানাও সব প্রাণীকেই।

স্থানাভাবে আরো উক্তি দেওয়া সম্ভব নয়।

তাঁর অন্যসব রচনার মধ্যে 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান' রচিত হয়েছিল যখন তিনি মহেন্দ্র কন্দলীর চতুষ্পাঠীতে ছাত্র। এই পুস্তকটির উপকরণ 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' থেকেই বেশিরভাগ সংগৃহীত। সমগ্র কাব্যে ভক্তিরই জয়গান। তাঁর অল্প বয়সের আর একটি রচনা—রুক্মিণী হরণ। ভাগবত ও হরিবংশ থেকে এর উপাদান সংগৃহীত এবং পুস্তকটি অপূর্ব সৌন্দর্য মণ্ডিত। দুটি পুস্তকের উপক্রমণিকাতেই এই ঋণস্বীকার করেছেন কবি। অথচ এই কাব্যে শাস্ত্রীয় গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৎকালীন সমাজচেতনার ইতিহাস এমন সহজভাবে মিশে গেছে যে মনে হয় যেন তখনকার কালেরই সমাজচিত্র পুরাকালের গোত্রান্তরে বর্ণিত।

বলি-ছলন (বলির সপ্রতিভ পরাজয়) গ্রন্থটি শংকরদেবের পথবৌসীতে অবস্থান কালেই রচিত। এটি ভাগবত পুরাণের অষ্টম সর্গের বালি উপাখ্যানের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। এই কাব্যে দাস্যভাবই, অর্থাৎ প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক অতি প্রবল। এ ছাড়া এই পুস্তকে নীতি ও উপদেশ বাক্যের ছড়াছড়ি—যেমন বিভিন্ন দানে যথোচিত সদ্ব্যবহার, কি ভাবে অর্থ ও ঐশ্বর্য আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অন্তরায় হতে পারে, কামনা বাসনার কুফল, ইন্দ্রিয় ভোগের দমনে যে আত্মতুষ্টি ও পরাশান্তি আসে তার ব্যাখ্যা।

শংকরদেব শুধু কৃষ্ণ কথাতেই আত্মনিয়োগ করেন নি, তিনি রামায়ণ থেকেও তার মালমশলা সংগ্রহ করেছেন। তিনি অসমীয়া ভাষায় রামায়ণের উত্তর কাণ্ড (শেষ অধ্যায়) অনুবাদ করেন। মাধব কন্দলীর রামায়ণী কথায় প্রথম ও সপ্তম কাণ্ড স্থান পায় নি। উত্তরকাণ্ডকে রামায়ণের সারাংশ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেন না রাম সভায় লব ও কুশের গানের মাধ্যমে সমগ্র রামায়ণের একটা ভাবমূর্তি ফুটে ওঠে এইখানে আর একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ শাস্ত্রবাক্য হিসাবে প্রায় মূলানুসারী কিন্তু রামায়ণে তিনি আদর্শ, চরিত্রচিত্রণ বা ঘটনাপঞ্জিকে নিজের ইচ্ছামতো সুসজ্জিত করেছেন এবং গতানুগতিকভাবে অনুবাদে হাত দেন নি। কারণ

এখানে মহাকাব্যের নায়ক মূলচরিত্র নরদেবতা বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার। একটি ভণিতায় শংকরদেব রাম সম্বন্ধে বলেছেন :

তুমিই ত্রিভুবন পাতা ; তুমিই সমস্ত বিশ্বের ধাতা
তুমি অচিন্ত্যনীয় গুণ অজেয় পরাশক্তি
মহাপ্রকৃতির[১] পারে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ গুপ্তবিদ্যা
তোমার আদিও নেই, অন্তও নেই
সেই অনাদ্যন্তবান মহামহিমার সম্ভ্রমের কথা কেউ জানে না
তুমি কর অপসারণ পৃথ্বীর ভার,
বারে বারে অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করে
দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্য
ধর্মসংস্থাপনের ও ধর্মরক্ষার জন্য, ধার্মিকদের আশ্রয়ের জন্য তুমিই
ঈশ্বর—যাকে পূজা করে দেবতারা ও দানবরা শেষ পর্যন্ত তুমিই
একমেবাদ্বিতীয় আর কেউ নয়, আর কেউ নয়।

অসমীয়া সাহিত্যের আর দুটি বিভাগে শংকরদেব তাঁর কৃতিত্ব রেখে গেছেন এবং তিনিই প্রথম পথ পরিচায়ক—বরগীত (ভক্তিমূলক গাথা) এবং আঙ্কিঁয়ানাট (একাঙ্কিকা নাটক)। এই রচনাগুলি কীর্তন ও কাব্যের মতো সহজ সরল বোধগম্য অসমীয়ায় লেখা নয়। এইগুলি ব্রজবুলি নামে একপ্রকার মিশ্র মৈথিল ও অসমীয়া ভাষায় লেখা যা কৃষ্ণ ও গোপীদের মধ্যে মহাকাব্যীয় যুগে প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়। এই বিশিষ্ট মিশ্রভাষা মধ্যযুগের বাঙালী বিহারী ওড়িয়া কবিদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। একথা বলা শক্ত যে তাঁর ভক্তিমূলক কাব্য ও নাটকগুলির জন্য শংকরদেব কেন অসমীয়া ভাষাকে ছেড়ে এই মিশ্রভাষার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। একটি কারণ হতে পারে ব্রজবুলিতে মিশ্র ব্যঞ্জনবর্ণের আধিক্য কম এবং সেখানে স্বরবর্ণেরই প্রাচুর্য বেশি—যার ফলে শ্রুতিমাধুর্য, ধ্বনিগাম্ভীর্য ও উপমার আতিশয্য কাব্যে বর্ণনা করা বা রূপায়িত করা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। এই সহজ গতিময়তা ছাড়াও ব্রজবুলির আর একটি মহিমা ছিল, যা সকল বৈষ্ণবকেই শ্রদ্ধান্বিত করত যে এই পরিভাষা বৃন্দাবনের ভাষা, দেবভাষা—এই ভাষাতেই শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীরা কথা

১ স্বাভাবিকী বলক্রিয়া।

কইতেন এবং এর দ্বারাই 'সাধারণ ভাবে কথ্য ভাষায় যে সব ভাবমুক্তির প্রকাশ্বে প্রয়োজন মেটানো যায় না' সেই অব্যক্তগুলি ব্যক্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে বৈষ্ণব নবজাগরণে। শংকরদেবই আমাদের প্রথম মহাকবি যিনি এই প্রণয়ন সিদ্ধ মিশ্র ভাষায় তাঁর বরগীত ও একাঙ্কিকাগুলি রচনা করেন এবং কী মহান ও চমৎকার তাঁর প্রকাশভঙ্গি। বৌদ্ধ চর্যাপদগুলিই তাঁর বরগীতের গঠন-চাতুর্যে সাহায্য করেছিল। বরগীতগুলিই তাঁর অন্য কাব্যের চেয়ে বেশি কাব্যসুষমায় রসোত্তীর্ণ এমন কি কীর্তনের আখ্যানগুলির অপেক্ষাও। এই ধরনের সংগীতের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং ভক্তিমূলক গানের প্রসারের জন্যই এইগুলি রচনা করেন এবং এই ধরনের মধুর ভাবগম্ভীর ও সুললিত ঈশ্বরীয় ভজন আজ পর্যন্ত অসমীয়া ভাষায় রচিত হয়নি। শংকরদেবের 'বরগীতে' আছে আধ্যাত্মিক পথে সাধকের ক্রমবিকাশের ধারা দার্শনিক সংকল্প, মনন ও নিদিধ্যাসন, তার সপক্ষে নৈতিক যুক্তি ও রীতির অবতারণা। মোটের উপর আমরা পাই একটা আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা, সত্যানুসন্ধিৎসার জন্য আকুলতা, ভগবানের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য বেদনা, ভাবনা, তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য কাতর প্রার্থনা এবং এর জন্য কোনো দিব্য উপায় আছে কিনা যাতে ঈশ্বর সন্দর্শন বা মোক্ষলাভ সম্ভব। কতকগুলি বরগীতে আমাদের উপদেশ দেওয়া হয় ভগবান শ্রীহরির নামশরণ নিতে, গোবিন্দের ধ্যান করতে এবং শ্রীরামের পদাশ্রয় গ্রহণ এবং এই ধরণীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ সুবিধাস্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করতে। প্রত্যেকটি বরগীতই শেষ হয়েছে এই ব্যাকুল প্রার্থনা নিয়ে যেন গোবিন্দের শ্রীচরণে ভক্ত আশ্রয় পায় এবং পায় দুঃখ দুর্দশা থেকে অব্যাহতি।

এই বরগীতগুলিতেই শংকরদেবকে আমরা তাঁর সর্বোচ্চ স্তরে পাই। এইখানেই মিশেছে মেধা ও মনীষার সঙ্গে ভক্তি ও শরণপ্রপত্তির, সাহিত্যিক ও সাধক, কবি ও দার্শনিক, রূপকার ও রসবেত্তা এবং সেইজন্যই ভাব ও ভাষা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে একের শরণে পৌঁছেছে। তা ছাড়া এই সব স্তোত্রাঞ্জলিতে রূপক, প্রতীক ও অনুপ্রাসের সুষ্ঠু প্রয়োগে এগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও উপভোগ্য হয়েছে। এই জন্যই বরগীতের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শংকরদেবের পরবর্তী কবিরাও এই রীতির অনুকরণ করেন। অবশ্য এর মধ্যে মহিলা কবিও আছেন, তবে সবচেয়ে খ্যাতিমান হয়েছেন মাধবদেব যিনি শুধু কবি নন, একজন সুদক্ষ গায়কও ছিলেন। শংকরদেবের আর এক

ধরনের কবিতার নাম 'চতিহা'। কাশীধামে তীর্থযাত্রা কালে তিনি খুব সম্ভব মহামতি সন্ত কবিদের 'চৌতিশা' কবিতার পদাবলী শ্রবণ করেন যা তাঁকে গভীর ভাবে মুগ্ধ করে। 'চৌতিশা' পদগুলি ব্যঞ্জন বর্ণের অক্ষর অনুযায়ী এক ধরনের কবিতা যার মাধ্যমে মর্মগত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও চলে। ইংরেজ কবি চসার যেমন এ, বি, সি, কবিতায় লাতিন বর্ণমালার ব্যঞ্জন বর্ণের সুপ্রয়োগে কাব্য রচনা করেছিলেন, শংকরদেবও তেমনি সংস্কৃত বর্ণমালার ব্যঞ্জন বর্ণের ধারাবাহিক অক্ষরগুলির ক্রমানুযায়ী পয়ার রচনা করেন। এইভাবেই অসমীয়ায় 'চতিহা' কবিতার উৎপত্তি।

'আঙ্কিয়া নাটে'র মধ্যে দুই ধরনেরই আকর্ষণ দেখা যায়—একটি স্থূল ইন্দ্রিয়গত, আর একটি বুদ্ধি ও তত্ত্বগত। আসামের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে এই নাটিকাগুলির অভিনয় অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। তার ফলে জাতীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা এবং সংগীত ও নৃত্যচর্চার উদ্ভব। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য যে এই সব নাটকের যখন অভিনয় আরম্ভ হয় তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তবু লোকমানসে এদের প্রভাব ছিল অসামান্য ও গভীর, কারণ অসমীয়া বৈষ্ণববাদের প্রসারে এর মূল্য ছিল অপরিসীম এবং আজও সে প্রভাব অব্যাহত। শংকরদেবের আঙ্কিয়া নাটকগুলি অসমীয়া কাব্যকে ও কবিকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এবং এই থেকেই আর এক ধরনের বিশেষ কাব্যের উৎপত্তি হয়েছে যার নাম ভটিমা। আবার আঙ্কিয়া-নাটের মধ্যেই শক্তিশালী, গীতিধর্মী, উচ্চমানের অসমীয়া গদ্যের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

শংকরদেবের নাটকের মধ্যে কালি-দমন (বা সর্প কালীয়দমন) আনুমানিক ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে বরদোয়াতে লিখিত, আনুমানিক ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে ধূবাহাটায় থাকা কালে লেখা হয় 'পত্নী-প্রসাদ'। এ ছাড়া ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে 'রাসক্রীড়া' বা 'কেলি-গোপাল', ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'রুক্মিণী-হরণ', 'পারিজাত-হরণ', 'রাম-বিজয়' আমাদের কাছে পৌঁছেছে। শেষোক্তটি রাজা নরনারায়ণের অনুরোধে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহারে থাকা কালীন রচিত। প্রথম তিনটি নাটকের আখ্যানভাগ মুখ্যত ভাগবত থেকে নেওয়া, 'রুক্মিণী-হরণ' ও 'পারিজাত হরণে'র মূল কাহিনী হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ থেকে সংগৃহীত এবং 'রামবিজয়ে'র গল্প রামায়ণ থেকে আহৃত। এইসব আখ্যানগুলির সমাপ্তি ঘটেছে অবিয়োগান্তভাবে সুখের প্রাপ্তিতে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ করা কর্তব্য যে এই ধরনের

নাট্যকারের নাটক প্রণয়নে কিছু বাধা আছে—যেমন এই নাটকগুলির আখ্যান-ভাগ অল্প বিস্তর সকলেরই প্রায় জানা এবং এগুলির উদ্দেশ্য ভক্তিবাদমূলক তত্ত্ব ও তথ্য প্রচার— সেইজন্য নাট্যকারের গতানুগতিক ধারা অবলম্বন ছাড়া উপায় ছিল না, শৈল্পিক রসাভাস বা ক্রটি বিচ্যুতির সংশোধন সংযোজনের অবকাশও ছিল না। শংকরদেব সর্বপ্রথমে ধর্মের উদ্‌গাতা ব্যাখ্যাতা, শিল্প-নির্মাতা নন। তবু 'রুক্মিণী-হরণ', 'পারিজাত-হরণ' ও 'রামবিজয়'-এ তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা প্রকৃত শিল্পীরই। যদিও নাটকের পরিধি ও আখ্যান সীমিত সাধারণের জানা, তবুও তাঁর কৃতিত্ব যে চরিত্রগুলি দীপ্তিমান হয়ে ফুটে উঠেছে।

বহুকাল থেকেই সামাজিক ও ধার্মিক সম্মেলনে কাব্য ও শাস্ত্রপাঠের রীতি ছিল— সেই সূত্র থেকেই এই একাঙ্কিকা বা 'আঙ্কিয়া নাটে'র উৎপত্তি ও প্রসার। 'আঙ্কিয়া-নাট' রচনা করবার পূর্বেই শংকরদেব এই ধরনের আবৃত্তি-যোগ্য কাব্য লিখেছিলেন। নাটকের ও আবৃত্তির মাধ্যমে তাঁর ধর্মমত প্রচারের যে সুবিধা আছে তা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং সেটা যে শুধু আবৃত্তি বা মন্ত্রোচ্চারণের চেয়ে বেশি প্রাণশক্তি সম্পন্ন—সেই কথাও, কারণ শুধু কানে শোনা নয়, চোখে দেখাও চলে।

আর একটি কথার স্বীকৃতির প্রয়োজন যে শংকরদেব যখন তাঁর 'আঙ্কিয়া-নাট' গুলি রচনা করেন তখন তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহুস্থান ভ্রমণ করে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ধরে নেওয়া অসংগত হবে না যে তাঁর বারো বছরের তীর্থযাত্রায় ভারত ভ্রমণ কালে বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের গান, যাত্রা বা নাটক, যেমন 'রামলীলা', 'রাসলীলা', 'যাত্রা', 'কথক', 'যক্ষগান', 'ভাগবতম্' এবং 'ভবই' দর্শন ও শ্রবণ করেছিলেন। স্বদেশে ফিরে আসার পর তিনি নিছক কাব্যমূলক রচনাগুলিকে নাট্যমূলক দৃশ্যে পরিণত করেন এবং এই বিষয়ে ভাগবতপুরাণের আখ্যানভাগ থেকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য পান। শংকরদেবের সময়ে আরও অন্য ধরনের কিছু লোকরঞ্জনী-নৃত্যগীত নাটকাদি অভিনীত হত, যেমন মন্দির-নৃত্য, দেওধানী নৃত্য, পুতুল নৃত্য ও ঝাপালি অভিনয় প্রভৃতি। ঝাপালির সমস্বরে তাল-মান-লয় সংবলিত সংগীত খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং এখনও পর্যন্ত গ্রামগঞ্জে এর প্রতিপত্তি অব্যাহত। এই দলে সাধারণভাবে চার-পাঁচ জন গায়ক থাকে এবং এরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক অংশ সমস্বরে গান গায়। যিনি দলের অধিনেতা, তাঁকেই বলা হয়

'ওঝা' এবং তাঁর সঙ্গীদের 'পালি'। 'পালি'দের মধ্যে একজন হচ্ছেন 'দেনা পালি' অর্থাৎ 'ওঝা'র দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ও প্রধান সহায়ক। 'ওঝা'র কাজ হচ্ছে ধীরে ধীরে আখ্যান বস্তুটিকে বুঝিয়ে দেওয়া ও গানের আরম্ভ বা ধুয়া ধরিয়ে দেওয়া যা শ্রবণ মাত্রই সহকারীরা বা 'পালি'রা তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সঙ্গত (দোয়ার) করবে। এর সঙ্গে চলবে বাদ্য যন্ত্রের সুরের সঙ্গে বা পা ঠুকে তাল দেওয়া, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে 'ওঝা' বা দলপতি সুর বন্ধ করে সহকারী দেনাপালির সঙ্গে কথা কয়, যাতে নাট্যের আখ্যানবস্তু একটা নাটকীয় আলাপে পর্যবসিত হয়ে আখ্যানভাগকে বিস্তৃত করে গতি লাভ করে। এই প্রাক্-বৈষ্ণব ওঝাপালি, নাচ-গান, কাব্য-কথকতাই শংকরদেবকে তাঁর আঙ্কিয়া নাটের মূল সূত্রটি দান করেছে। এই জন্য এই অনুমান অসংগত নয় যে এই ধরনের নাচগান, ওঝাপালি গীত এবং কাব্য আবৃত্তি এবং তাঁর দেশভ্রমণের স্মৃতি হিসাবে অন্য প্রদেশের যাত্রা গীত নাট্যের ছায়া আসামে সম্পূর্ণ নাট্যসৃষ্টির প্রথম প্রয়াস।

যদিও আঙ্কিয়া-নাটের[১] অভিনয়ের উপাদানের সূত্র হিসাবে আসামের প্রাচীন ও স্থানীয় রীতিনীতিই মূল ভিত্তি ছিল তবু সংস্কৃত নাটক ও অভিনয় ধারা শংকরদেবকে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণও বহুল পরিমাণে আছে। নাট নামটি সংস্কৃত 'নাটক' নামেরই অপভ্রংশ। বৈষ্ণব কবিরা এই ধরনের নাটকে নাট্যাভিনয়ের নামকরণ করেছেন যাত্রা, নৃত্য ও অঙ্ক। মাধবদেবের অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তনের নাটিকাগুলির নাম 'ঝুমুরা' জনশ্রুতিতে এদের নাম 'আঙ্কিয়া-নাট'। কিন্তু এইগুলি সংস্কৃত নাট্যরীতির রূপক নয় এবং ঐ অভিনয় রীতির সঙ্গে সাদৃশ্যও নেই। 'আঙ্কিয়া-নাট' নামটি আসামে সাধারণভাবেই ব্যবহৃত হয় এবং এইগুলি বৈষ্ণবধর্মের ভাব সংবলিত এক অঙ্কের একাঙ্কিকা।

এই নাট্যগুলির শিল্পরীতিতেও সংস্কৃত নাটকের প্রয়োগপদ্ধতির কিছুটা সাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয় যেমন নান্দী ও সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার, 'সূত্রধারে'র ভূমিকা এবং 'পূর্বরঙ্গে'র উপক্রমণিকা। অসমীয়া নাটকে সূত্রধারই[২] নাট্যের

---

১ এক ধরনের সংস্কৃত নাটক

২ রঙ্গশালার ব্যবস্থাপক

মূল পরিচালক বিশেষত আঙ্কিয়া-নাটের। সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় যে সূত্রধার নাটকের সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েই অন্তর্হিত হন, কিন্তু অসমীয়া নাটকে তিনি সর্বক্ষণই আসরে উপস্থিত এবং তিনি শুধু পরিচালনা করেন না, নাটকের গতি ও পারম্পর্যও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে শোনান। তিনি গীত বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করেন, তা ছাড়া নাটকের উদ্বোধন তাঁর দ্বারাই হয়, চরিত্রগুলির পরিচয় তিনি দেন, কখন কোন অভিনেতা মঞ্চে আসবেন, যাবেন, তার নির্দেশ দেন এবং কিছু অসংগতি ঘটলে তা বুঝিয়ে দেন বা নৃত্য, গীত বা বক্তৃতার দ্বারা পূরণ করেন এবং সমগ্র নাট্যের গভীর ব্যঞ্জনা তার জীবন নীতির ও বিভিন্ন দিকগুলির ভাব তুলে ধরেন। 'আঙ্কিয়া-নাটে'র বিশেষ তাৎপর্য এবং লোক সমাজে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির একটি কারণ এই যোগ্য সূত্রধারদের দ্বারা নাট্যাভিনয়ের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ—কারণ প্রধানত এইসব নৃত্যগীতগুলি অশিক্ষিত জনসাধারণের সামনেই অভিনীত হত। সুযোগ্য সূত্রধারই ছিলেন অসমীয়া ভাবনার সাফল্যের মূল। তাঁকে শুধু সময়োপযোগী অভিনেতাই নয়, সুগায়ক ও নৃত্যদক্ষও হতে হত। সেই কারণে গ্রামের সর্বাপেক্ষা গুণী শিল্পীকেই সূত্রধারের পদে বরণ করা হত, যাতে তিনিই নাটকটিকে অগ্রসর করে টেনে নিয়ে যেতে পারেন ও অভিনয়কে সার্থক ও সজীব করে তুলতে পারেন। এই ধরনের মেধাবী নায়কদের বাল্যাবস্থা থেকে নৃত্য, গীত ও নাট্যাভিনয়ে শিক্ষা দেওয়া হত।

'আঙ্কিয়া-নাটে' আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর কাব্যরসসিঞ্চিত অবয়ব। এই সব নাটকে গান ও কবিতার প্রাচুর্য ও সমারোহই বেশি এবং রচয়িতাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত নাটকের উদ্দেশ্যকে যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করে প্রকাশের চেষ্টায়। অভিনয় ও চরিত্রের পরিবর্তে বহু দৃশ্য ও ঘটনা আভাসিত হত সূত্রধারের বর্ণনাত্মক কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে। সাধারণ অগুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঙ্ক্তি বা ভাব ভাবনা গানের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হত। নাট্যের কথোপ-কথনগুলি অন্তর্নিহিত কাব্যিক সৌন্দর্যের সহায়কমাত্র। এইসব নাটকে লেখকগণ যত না নাট্যকার তার চেয়ে বেশি কবি। সেইজন্য তাঁদের লিখিত নাটকে কাব্যরসের ব্যঞ্জনাই সমধিক এবং এইগুলিই কাব্যরসাশ্রয়ী নাট্য নামে অভিহিত করাই সংগত।

এই সব পালাগুলির গান ও কবিতাই বিশেষ আকর্ষণ এবং এগুলিকে বলা

হয় আঙ্করগীতি ও 'ভটিমা'। কতকগুলি নাটকে 'বরগীত' ও ভক্তিমূলক গান আছে। প্রত্যেক আঙ্কিয়া গীতে ও নাট্যসংগীতে একটি ধুয়া থাকে, সেটি একটি বিশেষ রাগ তাল ও মানের পরিচায়ক।

সংস্কৃত নাটকের ধারা ও রীতি অনুযায়ী আঙ্কিয়ানাটগুলিও প্রাচীন নাট্য সম্মত অর্থাৎ নান্দী প্ররোচনা প্রবর্তনা ও প্রস্তাবনা আছে। প্রাচীন অসমীয়া নাট্যগুলিতে অনেক সময় ছুটি অষ্টম বা দ্বাদশ চরণযুক্ত যুক্ত নান্দী শ্লোক পাওয়া যায়। একটি দিক এর শুভ ইঙ্গিত-বাচক, অন্যটি নাট্যের বিষয়বস্তুর নির্দেশক। পরবর্তীকালের কতকগুলি পালাতে নান্দী শ্লোককে একেবারে বর্জন করা হয়েছে এবং এর স্থলে শুধু একটি শুভসূচনার সংকেতবহ কবিতা পাঠ করা হত। সংস্কৃত নাটকে নাট্যের পরিচালনায় সূত্রধারের আবির্ভাব নান্দীবচন পাঠের পরে। তাতে এইটেই অনুমান করা যায় যে সূত্রধার নান্দীপাঠ করেন না। কিন্তু অসমীয়া আঙ্কিয়া নাট্যে নান্দীপাঠ সূত্রধারেরই কর্তব্য।

নান্দীর পর সূত্রধার সংস্কৃতে লিখিত একটি কবিতার মাধ্যমে (প্ররোচনা) নাটকের বিষয়বস্তুর উত্থাপন করেন। এর পরেই হয় একটি সুদীর্ঘ কবিতার আবির্ভাব যাকে বলা হয় ভটিমা। ভটিমার পর প্রস্তাবনা। সূত্রধার স্বর্গলোকের একটি শব্দ শুনতে পান। তখন ঐ শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে একটি আলোচনার সূত্রপাত হয় এবং সেই বিচার বিশ্লেষণের অগ্রগতির সঙ্গেই সূত্রধার ক্রমপর্যায়ে আগন্তুক নটনটীদের নাম জানিয়ে দেন। এই আলোচনার শেষে তাঁর সঙ্গী ও সহকর্মীরা রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেন।

সূত্রধার ছাড়াও অসমীয়া নাটকে আরও ছুটি চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায়। তাঁরা হচ্ছেন 'দূত' ও 'বহুভা'। এবং এঁরা নাট্যে উল্লিখিত চরিত্রদের একজন নন। এঁদের উপস্থিতি অভিনয়ের সৌকর্যে এবং তার চলমানতা ও গতিময়তার জন্য—এঁরা শুধু বিদূষক নন, ঘোষকও। দূত ও বহুভা মঞ্চে উপস্থিত হয়ে জানিয়ে দেন কেন বা কোথায় নাট্যের গতি শুরু হবে। প্রয়োজনীয় সংবাদ-দাতার কাজও তাঁদের, যেমন কোন অভিনেতা কখন উপস্থিত হবেন তার ঘোষণা ইত্যাদি। বহুভাদের অন্য কাজও থকে, তাঁরা অনেক সময় একঘেয়েমি ঘোচানোর জন্য নানারকম অঙ্গভঙ্গি, হাস্যকৌতুকের অবতারণা করেন এবং ব্যঙ্গকৌতুকের ও ঠাট্টাতামাশার সাহায্যে দর্শকদের শান্ত রাখবার চেষ্টা করেন। অবশ্য এর কোনো সনাতন নিয়ম বা ঐতিহ্য নেই —যে যেমন পারে, যতটুকু

আয়াস সাধ্য। কিন্তু পরিচালক কঠোর দৃষ্টি রাখেন যে নাটকে মূল বিষয়বস্তুর কোনো অঙ্গহানি না হয়, কোনো বৈসাদৃশ্য না ঘটে—মোটকথা, নাটকের মৌলরূপ যেন অব্যাহত থাকে।

অভিনয়ের প্রারম্ভে যেমন একটি আশীর্বাদী স্তোত্র দিয়ে সূচনা, তেমনি এর শেষেও একটি মুক্তিমঙ্গল প্রার্থনা থাকে এবং সূত্রধার তাঁর প্রযোজিত নাট্যাভিনয়ের যদি কোনো দোষ ত্রুটি ঘটে থাকে তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান। সর্বশেষে তিনি নাটকের নৈতিক প্রতিক্রিয়ার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সত্যের ও ধর্মের পথে চলবার উপদেশ দেন।

আঙ্কিয়া-নাটের অভিনয়ের সাফল্য নির্ভর করে চারটি উপাদানের পারস্পরিক সৌষম্য সহযোগিতার উপর : গান, তাল সংযুক্ত নৃত্য, যথাযোগ্য বাদ্যযন্ত্র থেকে উদ্ভূত মধুর সুর এবং সংলাপ। আমরা আগেই আঙ্কিয়া-নাটের লিরিক প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করেছি, গান ও নানা ছন্দ হল যার উৎস। অসমীয়া নাট্য ভাবনার রূপায়ণে সব চরিত্রই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নৃত্যের হিন্দোলে দোলে, অঙ্গভঙ্গি ও পদক্ষেপ করে ও যথাযোগ্য অভিনয় ভঙ্গি করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে অভিনীত নাটকের গল্প বা আখ্যান ভাগ নৃত্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয় এবং দর্শকদের ভাবাবিষ্ট করবার প্রধান উপাদান হিসাবে নৃত্য ব্যবহৃত হয়। একথা বলা মোটেই অসংগত নয় যে অসমীয়া নাটক অভিনয়ে অঙ্গভঙ্গিসহ নৃত্যই একটি প্রধান অঙ্গ ও মূল ছন্দকে পূর্ণ প্রকাশিত করার উপায়।

এই ধরনের নৃত্য-নাট্যে সূত্রধারই প্রধান নর্তক। নান্দীপাঠের পরেই সূত্রধার সমস্ত গল্পটি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেন এবং যেখানে যে ভাবের প্রকাশ সমীচীন তা দেখিয়ে দিয়ে শ্লোকগুলি আবৃত্তি করেন। অভিনয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই তাঁর কর্তব্য। 'আঙ্কিয়া ভাবনা'র তিনটি প্রধান নৃত্যরীতি হচ্ছে—'সূত্রধার নাচ' 'কৃষ্ণ নাচ' এবং 'গোপী নাচ'। আরও কয়েকটি ভঙ্গি হল 'রাস নাচ' 'নতুবা নাচ' ও 'চালি নাচ'। সবই প্রায় প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের ঐতিহ্য ও আঙ্গিক থেকে সংগৃহীত।

অসমীয়া ভাবনায় নান্দী শ্লোক উচ্চারণের পূর্বে সূত্রধারের নেতৃত্বে গায়ক বাদকের (গায়েন-বায়েন) দল এক প্রস্থ নাচ করে। একে 'ধেমালি' বা 'রঙ্গ' বলা হয়। এতে ভক্তিমূলক গীতাদি গায়েন-বায়েনরা গায় খোল করতালের সঙ্গে। এইসব প্রাথমিক নৃত্যগীতের (সরু ধেমালি, বড় ধেমালি, দেব-ধেমালি,

ঘোষা-ধেমালি) উদ্দেশ্য—দেবতাদের কাছে প্রার্থনা যেন অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হয়, লোকেরা দেয় সাধুবাদ। কখনো কখনো এইসব প্রারম্ভিক নৃত্যগীতেই বহু সময় অতীত হয় এবং মূল নাটকের উপস্থাপনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিলম্ব হয়।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত এবং সংস্কৃত নাটকে গৃহীত 'পূর্বরঙ্গে'র মতোই 'ধেমালি'র সূত্রপাত। ভরতের মতে পূর্ববঙ্গের কুড়িটি বিশিষ্টতা আছে, তার মধ্যে নয়টি পর্দার আড়ালে এবং বাকিগুলি উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। কালক্রমে এই ধেমালি পূর্বরঙ্গকে যথাসাধ্য কমিয়ে এনে স্বল্পায়তন করা হয় এবং একে নাটকের মূল পাঠের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয় না। অসমীয়া আঙ্কিয়া-নাটে নান্দীবাচনের পর 'অলমতি বিস্তারেন'—এই সূত্রটিই প্রাধান্য পায় এবং অভিনেতাদের প্রতি সাবধানবাণী হিসাবেই গৃহীত হয়। সমস্ত অভিনয়ের (পালার) শেষে পুনরায় পদ্যসংগীত ও নৃত্য হয়। তা ছাড়া প্রত্যেকটি ঘটনার পর সূত্রধারের নৃত্যগীতবাদ্য আছে। এগুলি এক হিসাবে পরিচিত অভিনয়ের একঘেয়ে ধারা থেকে অভিনন্দনযোগ্য মুক্তির নিঃশ্বাস।

এই আঙ্কিয়া নাটগুলি রচনার মূল উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন নয়, ধর্মসাধন। এই জন্য জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা ও রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে এগুলি গ্রামের নামঘরে অভিনীত হত, পরে কোনো উৎসব উপলক্ষে, যেমন পূর্ণিমারাত্রে, বীজ বোনার কালে অথবা গ্রামবাসীদের অবসর সময় এগুলি অভিনীত হত। কখনো বা এই সব নাচ যাত্রা অভিনয়ের জন্য অস্থায়ী মণ্ডপও বাঁধা হত, তাদের নাম ছিল —রভাস। মাধবদেব বড়পেটাতে তাঁর দুটি নাটক 'ভোজনবিহার' ও 'দধি মথন' অভিনয়ের জন্য একটি বৃহৎ ঘর নির্মাণ করান যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'বড়ঘর' বা রঙ্গিয়াল ঘর।

আসামে নামঘর গ্রামবাসীদের যৌথ সম্পত্তি। সেখানে প্রতিদিন নামগান, কথকতা, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি হয়। ভক্তমণ্ডলী তা শ্রবণ করেন ও সন্ধ্যাবেলায় প্রার্থনাসভায় যোগ দেন। দিনের বেলায় গ্রামবৃদ্ধরা এখানে সমবেত হয়ে সামাজিক নালিশ, সালিসী বিচার বিবেচনা ও অন্য কাজ করেন ও নিজেদের মতামত দেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের মতো। অসমীয়া ঐতিহ্যরক্ষায় এই নামঘর-গুলির অবদান যথেষ্ট। এইগুলিই রাত্রে আবার অভিনয়শালায় পরিণত হত এবং অসমীয়া সংগীত, নৃত্য ও নাটককে উজ্জীবিত করত।

নামঘরগুলি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় পঞ্চাশ ফুটের বেশি লম্বা পাতা ছাওয়া

দোচালা ঘর (যাকে নাট্য শাস্ত্রে 'বিকৃষ্ট' অভিধা দেওয়া হয়েছে)। এরই একদিকে আর একটি ছোটো ঘর তৈরি হত, যার নাম ছিল মণিকূট (হিন্দু মন্দিরের গর্ভগৃহ)। সেখানে একটি কাঠের সিংহাসনের উপর দেবতার মূর্তি বা একটি পবিত্র ধর্মশাস্ত্র রাখা হত। দীক্ষিত ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কারও সেখানে প্রবেশের অধিকার ছিল না। নামঘরের দুটি বিভাগ। যেটি মণিকূটের কাছে সেটিতে 'অধিকার' বা নামঘরের যিনি প্রধান পুরোহিতের কাজ করেন তাঁর ও ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে এবং অন্যটি অভিনেতাদের জন্য। প্রবেশ পথের নিকটবর্তী স্থানটির নাম—রঙ্গমণ্ডপ; যেখানে সাধারণ দর্শকরা মাদুরে বা মাটিতে সুখাসনে বসে অভিনয় দেখে। কতকগুলি বসার জায়গা গ্রামের গণ্যমান্য বা বরেণ্য অতিথিদের জন্য রক্ষিত হয়। মণ্ডপের মধ্যে দুই সারি স্তম্ভের মাঝে দুই-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে অভিনয় বা যাত্রার আসর বসে—তার নাম রঙ্গভূমি। আর কোনো বিশেষ আয়োজন করা হয় না বা মঞ্চের জন্য উচ্চাসনও নয়। অভিনেতা ও গায়ক বাদকের দল ঐ রঙ্গভূমিকে ঘিরে উপবেশন করে। শুধু একটা সাদা পর্দা বা আড় কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যাতে অভিনেতারা নামঘরের পাশেই সাজঘর বা চো ঘর (ছদ্মগৃহ) থেকে যাতায়াত করতে পারেন। সকল অভিনেতাই রঙ্গমঞ্চে একসঙ্গে আসেন না। তাঁরা ঐ সাজঘরে অপেক্ষা করেন এবং সূত্রধর কর্তৃক নাম ডাকলে বাইরে আসনে, কখনো বা তাঁরা তখনকার কর্মসূচী শেষ হলে, আবার যদি ডাক থাকে তবে গায়ক-বাদকদের সঙ্গেই বসে থাকেন এবং নামডাকের সঙ্গে সঙ্গেই অভিনয়ার্থে চলে যান।

অসমীয়ায় অভিনেতাদের সাধারণ নাম ভাবরীয়া (সংস্কৃত 'ভাবতা' থেকে), অর্থাৎ যাঁরা মনের বিশেষ বিশেষ ভাব ও প্রেরণা দেখাতে সক্ষম। যাঁরা নৃত্যে পারদর্শী তাঁদের 'নর্তক, নটুয়া বা নট' বলা হয় (যেহেতু তাঁরা পরের কার্যক্রম উপস্থাপিত করেন)। যাঁরা গীতবাদ্যের আয়োজন করেন তাঁদের বলা হয় 'গায়েন' (গান যিনি গান) এবং 'বায়েন' (যাঁরা বাজনার দ্বারা অভিনয়ের সংগতি রক্ষা করেন) বা 'বাদ্যকর'।

গ্রামের লোক এখনকার মতো তখনও অভিনয়কে উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন নি। গ্রামীণ লোকেরা নিছক আনন্দের জন্য এই সব উৎসবে মত্ত হতেন। অসমীয়া অভিনয় সেজন্য সদ্যমুকুলিত ভক্তিবাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত উচ্ছ্বাসের ফল। উচ্চবর্ণের সুন্দর তরুণরাই বিশেষত কৃষ্ণ ও রামের এবং

তাঁদের সহধর্মিণীদের সাজে ও নামে অভিনয় করতেন এই কারণে যে তাঁদের অন্যান্য অভিনেতা ও সাধারণ জনগণের নমস্কার গ্রহণ করতে হত। ঐসব অভিনেতাও অভিনয়ের আগে সংযম ও উপবাসাদি করতেন। স্ত্রীভূমিকাগুলি অল্পবয়সের বালকদের দ্বারাই করানো হত।

পূর্বে সংস্কৃত নাটক অভিনয়ে যে সব ব্যক্তি যোগ দিতেন, তাঁদের সম্বন্ধে সমাজে খুব উচ্চ ধারণা ছিল না, কিন্তু অসমীয়া 'ভাবনা' অভিনেতাদের কখনই নীচ বা অসম্মানের চোখে দেখা হত না। এমন কি বহু গণ্যমান্য বিদ্বান ব্যক্তি, রসবেত্তা ও শিল্পী যাঁদের সামাজিক ধার্মিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁরাও অসমীয়া 'ভাবনা' অভিনয়ে যোগ দিতেন এবং তার জন্য তাঁদের কোনো সম্মানহানি বা পদগৌরব বা মর্যাদার হানি হত না।

'অধিকার' যখন অভিনয়ে উপস্থিত থাকতেন তখন তিনিই হতেন 'প্রেক্ষাপতি' অর্থাৎ প্রধান অতিথি বা সভাপতি; তিনি শুধু অভিনেতাদেরই প্রণাম গ্রহণ করতেন না; দর্শকদেরও নমস্কার নিতেন। তাঁদের 'সভাসদ' বা সামাজিক নামে সম্বোধন করা হত।

অভিনেতাবৃন্দের দৃশ্যোপযোগী বিশেষ পোষাক ও দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হত। সেগুলি 'খনিকার' নামে একটি সম্প্রদায়ের কাছে জমা রাখা হয়। এঁরা প্রতিমার মৃত্তিকা বা কাঠের মূর্তি নির্মাণ এবং তাদের নানা রঙে রঞ্জিত করবার কাজে পারদর্শী ও পেশায় মূর্তিগঠক ও চিত্রকর। অভিনেতাদের কাছে এঁদের সাহায্য অপরিহার্য ছিল।

এই 'খনিকার' দল যেমন পূজার জন্য নানা দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে দক্ষ ছিল, তেমনি অপশক্তি বিনাশ বা দুষ্টগ্রহ প্রশমনের জন্য তাদের মূর্তি গঠন করে জলন্ত হুতাশনে জ্বালিয়ে দিত। এই মূর্তির নাম ছিল 'চো'। আবার এরা 'মুখোশ', বিভিন্ন অভিনয়ের জন্য নানা ধরনের যুদ্ধাস্ত্রাদি, যেমন ঢাল, তরোয়াল, ধনুর্বাণ, ক্ষেপণাস্ত্র, গদা প্রভৃতিও তৈরি করত। এরা সাজঘরেও অভিনেতা-দের সাজসজ্জার কাজে সাহায্য করত এবং রাত্রে অভিনয় হলে 'আবিয়া' ও 'মতা' নামে মশাল জ্বালিয়ে দিত। 'খনিকার' বা মুখোশ নির্মাতাদের নানা শিল্প বিষয়ে কর্মপটুতার দরুণ এই পেশাটি প্রায়ই পারিবারিক ব্যবসায়ে পরিণত হয়। এদের কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য ও প্রখরতা এত বেশি ছিল যে মানবদেহপ্রমাণ নানা ধরনের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি বিশিষ্ট মুখোশ নির্মাণেও এরা পারদর্শী ছিল।

এর জন্য শরীরের বিচিত্র ভাবভঙ্গির ও দৈর্ঘ্য প্রস্থের এবং জীব জগতের বিষয়ে এদের জ্ঞান ছিল যাতে নিখুঁতভাবে তাদের নির্দিষ্ট কাজকর্ম সম্পাদনে সফল হয় অথচ নাটকীয় শিল্পকলার উৎকর্ষ কিছুমাত্র নষ্ট না হয়।

এই মুখোশ ছাড়াও নাটকীয় চরিত্রগুলির সঠিক উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন রকমের বস্ত্র ও চিত্রবিচিত্র নকশা পরিকল্পনা করা হত। সূত্রধারেরা 'ঘুরি' বা এক ধরনের আজানুলম্বিত প্রশস্ত পাড় দেওয়া শ্বেতবস্ত্র পরিধান করত এবং গাত্রাবরণ ছিল একটি 'ফাটাউ' বা ফুলহাতা, হাফহাতা বা হাতকাটা একটি গেঞ্জি ধরনের জামা ও একটি রঙিন কোমরবন্ধ যার নাম ছিল 'করধানি'। সে মাথায় দিত এক ধরনের পাগড়ি বা 'পাগ'। সেইটাই শিরস্ত্রাণ। গায়েন-বায়েনদের পোশাকও ছিল ঐ ধরনের, তবে কম মূল্যের সাদাসিধে কাপড়ে তৈরি। অন্য সব পুরুষ অভিনেতারা ধুতি পরত হাঁটু পর্যন্ত এবং সঙ্গে থাকত একটি বক্ষোবাস। এগুলির চাকচিক্য মহার্ঘতা ও কারুকার্য অভিনেতাদের পদানুসারে। স্ত্রী অভিনেতাদের জন্য পোশাকগুলি খুব যত্ন ও তৎপরতার সঙ্গে প্রস্তুত হত, বিশেষ করে মেখলা, 'রিহা' (বক্ষোবস্ত্র) ও চাদর (শাল)। এরা নকল গহনাও প্রচুর ব্যবহার করত।

অভিনয়ের চরিত্রানুযায়ী মুখে বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অন্যত্রও রং মাখা প্রচলিত ছিল এবং এইগুলি প্রস্তুত হত হিঙ্গুল ও হরিতাল মিশ্রিত করে আলাদা আলাদা ভাবে দেশজ ঐতিহ্য অনুযায়ী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কৃষ্ণের শিরোভূষণ ছিল কিরীট—শ্যামবর্ণেই (কৃষ্ণবর্ণ ও নীলবর্ণে মিশ্রিত) রঞ্জিত করা হত, ব্রাহ্মণ বা কোনো ভিক্ষুকে শ্বেতবর্ণে এবং একজন দুরাচারী নৃশংস দুষ্ট লোককে রক্তবর্ণে এবং ভূতপ্রেত দৈত্যদের কৃষ্ণবর্ণে ভূষিত করা হত।

শংকরদেবের নাটকগুলির অভিনয়ের পূর্বে অঙ্গাবরণ ও মুখাবরণ ব্যবহার আসামে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়, বিশেষ করে লোকরঞ্জনার্থ নৃত্যগীতাদিতে। আমরা এর উল্লেখ পাই শংকরদেবের প্রথম নাটক 'ছিন্নযাত্রা'য় যেখানে বিষ্ণু-বাহন গরুড় একটি মুখোশ পরেই রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে। অসমীয়া ভাবনায় যদিও নানা ধরনের মুখোশ প্রথা প্রচলিত ছিল তবু তাদের সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—

১. কতকগুলি বিকৃত দর্শন বা হীনচরিত্রের স্বরূপ ফুটাবার ইঙ্গিত—যেমন

রাক্ষসরাজ রাবণ, তাঁর ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, মৃত্যুর অধিপতি যমরাজ বা রামানুচর বানরাধিপ হনুমান ;

২. পশুচরিত্রের ব্যঞ্জনায় প্রয়োজনীয় আবরণ যেমন গরুড়, কালীয়-সর্প, বরাহ, বানরগণ, জটায়ুপক্ষী ইত্যাদি ;

৩. হাস্যোদ্দীপক রসিক ভাঁড়ের বা ব্যঙ্গ কৌতুককারী চরিত্রের জন্য মাথা ও মুখ ঢাকা দেওয়া মুখোশই অভিনয়ে ব্যবহৃত হত।

কিন্তু নাটকের অনেক স্থানে পূর্ণাবয়ব অঙ্গাবরণেরও প্রয়োজন হত, যেমন রাবণ বধ, কালীয়দমন, স্যমন্তক-হরণ প্রভৃতি নাট্যে। রাবণ বধ ভাবনায় পূর্ণ মানবোচিত দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ও অন্যান্য শৈলীর ইঙ্গিতে একটি সম্পূর্ণ দশমুণ্ড মুখাবয়ব প্রস্তুত করা হত এবং তাতে শুধু দশমুণ্ডই যুক্ত হত না, এমন কি একশতটি হস্তও যা নিয়ে অভিনেতাকে রঙ্গমঞ্চে চলাফেরা করতে হত। কুম্ভকর্ণ ও হনুমানের 'মুখোশ'ও সেই ধরনের হত, অর্থাৎ তাদের জীবন্ত আকৃতির অনুপাতে। কালীয় দমন ও স্যমন্তক হরণ পালাতেও কালীয়-সর্পের মুখোশ জীবন্ত সর্পাকৃতির অনুরূপ। স্যমন্তক মণির জন্য জাম্বুবানের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধের মুখোশগুলি পূর্ণাঙ্গ।

ঐসব মুখোশসজ্জা পরিধান করে শিল্পীদের অভিনয় পাছে ভারগ্রস্ত হয় বা অঙ্গচালনার অসুবিধা হয়, সেই জন্য এই সব বৃহৎ পরিমাপের মুখাবরণগুলি ছিন্ন বাঁশের টুকরা ও কাপড় দিয়ে প্রস্তুত করা হত। রসিক বা ভাঁড়ের দলের অভিনেতারা কাদা, কাপড়, গাছের ছাল ও অমসৃণ কাগজে তৈরি হাল্কা ধরনের মুখোশ পরত। কলাগাছের বল্কল ও খোলা দিয়েও মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে কাজ চালানো হত।

বেশিরভাগ সময়েই এইসব ভাবনার অভিনয় শুরু হত সন্ধ্যায় এবং চলত সারারাত্রিব্যাপী। কখনও বা সন্ধ্যার পূর্বেই বৈকালে অভিনয় আরম্ভ ও রাত্রে শেষ হত। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন নাটকগুলির যেমন মাধবদেবের 'চোর ধরা' বা 'পিম্পারা গুচুবা' সন্ধ্যার পূর্বেই সমাপ্ত হত। শেষরাত্রে কোনো নাটকেরই অভিনয় হত না। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে ভাবনা হত শীতকালে অর্থাৎ মাঘ থেকে বৈশাখের প্রথম পর্যন্ত, যখন কৃষিকর্ম সাধাবণত বৈশাখের প্রথম পর্যন্ত বন্ধ থাকত এবং অন্য কাজকর্মও কম। কখনো কখনো কয়েকজন গ্রামবাসী নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে ইচ্ছা মতো নানা পালার নানা চরিত্রের

অভিনয় অভ্যাস করত ও সেই বিষয়েই ব্যস্ত থাকত। তাদের নামকরণ ছিল—'বড় খেলিয়া ভাবনা'র দল অর্থাৎ খেল বা অনেকগুলি নাট্যপালা থেকে খণ্ড খণ্ড ভাবে সংগৃহীত চরিত্রের দল নিয়ে অভিনয় করা বা মিশ্র রূপায়ণ।

অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট পদক্ষেপ হচ্ছে যে নাটকের ও অভিনয়ের মাধ্যমে একটি নূতন ধরনের সাহিত্য কৃষ্টির ও রূপ সৃষ্টির উদ্যোগ। শুধু তাই নয়, একে একটি সুসম্বদ্ধ আকৃতি দেবার প্রচেষ্টা। যদিও অসমীয়া নাট্যের মধ্যে একটা সুনীতি ও সদ্ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রাচীন পরিবেশের প্রাবল্য ছিল তবু দেশজ ও লোক সাহিত্যের প্রাণপ্রতিম নৃত্যকলাকে ঐ নাট্যরীতির ও গীতির অঙ্গীভূত করে নিতে বিশেষ অসুবিধা হয় নি এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পৈশ্বর্যের কিছু কিছু নিদর্শনও তার মধ্যে স্থান পেয়েছিল।

একথা সত্য যে আসামে বৈষ্ণব আন্দোলন অসমীয়া সাহিত্যের জয়যাত্রার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির সূচনা করে, তবে মহাপুরুষ শংকরদেবের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও সদ্‌গুণাবলীই ঐ সাহিত্যকে শনৈঃ শনৈঃ উর্ধ্বমার্গে উন্নীত করে। শংকরদেব নিজেই ছিলেন তাঁর বহু পরিষদের ও ভক্তের অনুপ্রেরণার কেন্দ্র। তাঁর বিশ্বস্ত ও প্রধান শিষ্য মাধবদেব একজন সুবিখ্যাত উজ্জ্বল সাহিত্য প্রয়াসী এবং গুরুর উপদেশে বহু কবিতা ও নাটক রচনা করেছিলেন। 'কথাগুরু চরিতে' লিপিবদ্ধ আছে—কি ভাবে তিনি 'নামঘোষা' বা 'হাজারি ঘোষা' নামে দার্শনিক তথ্য ও তত্ত্ব সংবলিত পদগুলি রচনা করেন। মাধবদেব, শংকরদেবের অনুরোধে বিষ্ণুপুরী সন্ন্যাসীর 'ভক্তি-রত্নাবলী' অনুবাদ করেন এবং 'রাজসূয়' নামে একটি কাব্যও রচনা করেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে শিষ্যের অনুরোধে ও তাঁর প্রতি অনুরাগ বশত শংকরদেব 'নাম ঘোষা' ও 'ভক্তিরত্নাকর'-এর প্রথম পদটি রচনা করে দেন। শংকরদেবের কাছে তাঁর ঋণ অসীম। শংকরদেবের আর একজন ভক্ত ও বহু গ্রন্থের সুলেখক রাম সরস্বতী তাঁর অনুরোধে মহাভারত অনুবাদ করেন। তিনিও শংকরদেবের কাছে বহুভাবে ঋণী। ব্রাহ্মণবংশীয় অনন্ত কন্দলীর ভাগবতপুরাণের দশম স্কন্ধের অনুবাদ সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক গল্প প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ অনন্ত কন্দলী নাকি স্বপ্ন দেখেন যে তাঁকে শংকরদেবের ভুক্ত অন্নাংশের প্রসাদ গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে। তিনি শংকরদেবকে সেই কথা জানালে তিনি তাঁর ভোজ্যাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণের মর্মার্থ জানিয়ে আদেশ দিলেন যে ভাগতবতপুরাণের দশম স্কন্ধের অনুবাদের যে সব অংশ

শংকরদেব শুরু করেছিলেন তাঁর উপর তা সমাপ্তির ভার অর্পিত হল। ভাগবতপুরাণের অনুবাদের ভার তিনি অর্থাৎ শংকরদেব তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যবর্গকে দিয়েছিলেন এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় এই মহতী কর্ম প্রচেষ্টা ফলবতী হয়।

উপরেই বলা হয়েছে তার পরে শংকরদেবের সাহিত্য সাধনার বিষয়ে বিশেষ নতুন করে কিছু বলবার প্রয়োজন হয় না। এবং নূতন কিছু বক্তব্য রাখার প্রয়োজনও সামান্য। তাঁর সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জনমনোরঞ্জন ও সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার। সেইজন্য এই সাহিত্যের রঙে, রসে ব্যঞ্জনায়, প্রকাশরীতিতে একটু ভিন্নতর আঙ্গিক ও রচনাশৈলী থাকতে বাধ্য— যেগুলি জীবনধর্মের সীমার সংকেত। যেহেতু ধর্ম, সদাচার ও সুনীতি পরস্পরের পরিপূরক ও অবিভাজ্য, তাই তাঁর রচনাগুলির মধ্যে নীতিবাক্যের প্রাচুর্য ছিল। সেইজন্য তিনি মহাকাব্য ও পুরাণাদির গল্প, আখ্যান ও আপ্তবাক্য দ্বারা ঐ রচনাগুলি সুশোভিত করেছেন, সময়োপযোগী নীতিবাক্য সংগ্রহ করেছেন এবং সত্য, দয়া, দান, কৃপা, অহিংসা, ক্ষমা, অনসূয়, ধৃতি, শ্রদ্ধা, দম প্রভৃতির গুণকীর্তন করেছেন, কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মান, মাৎসর্য বা অসূয়া প্রভৃতি পাপকর্ম দুঃখ ও বিনাশের দিকে নিয়ে যায়। নীতিবাক্য বা তত্ত্বকথা সত্ত্বেও তাঁর রচনাবলীতে এমন একটা বিরাট উদার ও প্রাঞ্জল পরিবেশ গড়ে উঠেছে যে এই সাহিত্যের একটা সার্বজনীন আবেদনও আছে যা প্রত্যেক মানব মানবীর হৃদয়কেই অভিভূত করে। অনেকগুলির মধ্যেই আমরা পাই দেশকাল অতীত এক শাশ্বত মানবধর্মের সত্যপ্রকাশ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে শংকরদেবের রচনাতে প্রকৃতিচিত্রও বেশ কিছুটা স্থান জুড়ে আছে। সত্য কথা বলতে কি প্রকৃতির নানা বর্ণনার মধ্যে তাঁর ধর্মপিপাসা মূল আকর থেকে উত্তোলিত লৌহপিণ্ড হলেও কিন্তু সুচিত্র সুদৃশ্য অলংকারে পরিণত হয়ে কাব্যসুষমায় মণ্ডিত হয়েছে। নদী, সাগর, কুঞ্জ, বন, পর্বতাদির শোভায় অভিভূত হয়ে কবি মনের আনন্দে অপরূপ সংগীত সৃষ্টি করছেন ও তা গাইছেন। তিনি তাদের যে ভাবে দেখেছেন বা সেগুলি তাঁর চোখে যে ভাবে প্রতিভাত হয়েছিল, তারই চিত্র কথায় এঁকেছেন এবং তাতে নিজের ভাব, ভাষা বা প্রতিক্রিয়া প্রয়োগ করেন নি। যদিও ঐসব দৃশ্য থেকে তিনি কোনো আধ্যাত্মিক বাণী সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন নি, তিনি জেরাল্ড ম্যানলি হপকিন্সের মতো প্রকৃতির প্রতিটি বিচিত্র শোভাতে ভগবানের মহীয়ান

রূপ সন্দর্শন করতেন। 'হরমোহন' কাব্যে দিব্য উপবনের যে বর্ণনা পাই বা 'গজেন্দ্র উপাখ্যানে' চিত্রকূটের যে সুস্পষ্ট চিত্র জেগে ওঠে, তার মধ্যেই ঐ ভাব পরিস্ফুট। প্রত্যেকটি কাব্যের গভীরে কবির ভাবপ্রবণ অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রকৃতির সম্যক্ পর্যবেক্ষণ এক একটি মহান দৃশ্যপটের অবতারণা করে।

শংকরদেব তাঁর রচনাবলীতে সংস্কৃত সাহিত্যের অলংকার শাস্ত্রের কাব্যিক রীতিনীতির ও প্রয়োগবিধির পক্ষপাতীই ছিলেন এবং এইভাবেই নিজের কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যের রূপচিত্র, বক্তব্য এবং ভাবগুলি পুরাতন সংস্কৃত কবিদেরই অনুকরণে, যেমন বিদ্যুৎ বা বিজুলি রেখার সঙ্গে বা 'তপ্ত সুবর্ণ'-র সঙ্গে কোমল কমনীয় তনুর তুলনা বা হস্তীশুণ্ডের সঙ্গে কদলীবৃক্ষের, শ্বেত দণ্ডের বা 'কম্বুকণ্ঠ'-র সঙ্গে শঙ্খের, হস্তের সঙ্গে ভলিত ভুজঙ্গের, মৃণাল-দণ্ডের সঙ্গে প্রসারিত বাহুর বা প্রস্ফুটিত পদ্মের বা চম্পক কলির সঙ্গে বা কনক শলাকার সঙ্গে অঙ্গুলিরাজির। আরও বহু ধরনের তুলনা বা উপমা দৃষ্টি-গোচর হয় যেমন বঙ্কিম চক্ষুর দৃষ্টির সঙ্গে কামদেবের শরাসনের পদ্মকোরকের বা কাখোভা পক্ষীর আঁখি পল্লবের সঙ্গে মন্মথের ধনুর্বাণের, মানুষের মুখের সঙ্গে চন্দ্রের আননের বা 'তিলফুল জিনি নাসা'র কিংবা কন্দুলী ফুলের মতো পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠ, সুপক্ক চেরীফলের মতো রক্তিম ঠোঁট, দাড়িম্বদানার মতো বা সুগঠিত মুক্তাবলীর মতো সুদৃশ্য দন্তরাজি, বদরি ফুলের মতো বা সুউন্নত কলসের মতো স্তনযুগল, রাজহংসের মতো গমন ভঙ্গি বা হস্তীযূথের মতো গজগতি বা মৃগরাজের (অর্থাৎ সিংহের) মতো পদক্ষেপ, কোকিলের মতো কণ্ঠস্বর এবং আরও শতশত উপমায় ভর্তি। নাট্যে শব্দ-অলংকার বা কাব্য সৌকর্যের মধ্যে অনুপ্রাসের তাঁর ছিল বেশি আগ্রহ এবং নানাবিধ শব্দচয়নের নৈপুণ্যে, বৈচিত্র্যে ও প্রয়োগে, তাদের ঝংকারে ও তানে তাঁর কাব্য ছিল পূর্ণ। অলংকারের মধ্যে বিচিত্র উপমারাশির ধারাবাহিক প্রয়োগ কবিগণের এক প্রিয় পদ্ধতি, একটি ভাবকে বিশদ করতে এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। কখনো বা একটি বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করতে উপমামালা একটি স্তবক জুড়ে ব্যবহার হয়। শিশুপাল রুক্মিণীর পাণিপ্রার্থী ছিল এই বারতাটিকে হৃদয়ঙ্গম করাবার জন্য অন্তত বারোটি উপমা ও সমধর্মী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। রুক্মিণী বলছেন—এই শিশুপাল আমাকে বিবাহ করতে চায়। আমার জীবন এখন ভালোর দিকে গতি নিয়েছে—তার কি স্পর্ধা যে আমাকে বিবাহ করতে চায়, একটি ধূর্ত

শৃগাল একটি সিংহিনীকে গ্রাস করবে, সে কি একটি শিশু যে আকাশের চন্দ্রমাকে হস্তগত করবে, না ভেকবংশের একজন যে অমৃতপিপাসু, আমার জন্য শিশুপালের আকাঙ্ক্ষাও তদ্রূপ। সে যেন একটি বায়স যে যজ্ঞে নিবেদিত কিন্তু পরিত্যক্ত নৈবেদ্যাদির উপর আসক্ত বা একজন পতিত ব্রাহ্মণ যে অনেক কিছু মূল্যবান দান সামগ্রী আশা করে বা যেমন একজন ব্রাহ্মণহন্তা অথচ স্বর্গে যাবার বাসনা তার অটুট—সেইরূপ রাজা শিশুপালও আমাকে কামনা করে। সে চায় যে রুক্মিণীর স্বামী হবে, কিন্তু ত্রিলোকেশ্বর মাধবের প্রতি চক্ষু নিমীলিত রেখে কে এই শিশুপালকে পছন্দ করবে? কে এমন মূর্খ মানুষ আছে যে সিংহকে অনাদর করে শূকরকে বরণ করে নেবে? এমন কে আছে যে শুভ্র দুগ্ধকে অগ্রাহ্য করে মৎস্য ধৌত জল পান করতে চায়?

শংকরদেবের রচনাগুলি অন্যান্য অলংকারেও ভূষিত। তাঁর লেখার একটি বিশেষ গুণ যা জনগণকে মুগ্ধ করেছে তা হল তিনি তাঁর রচনায় বিবিধ ধরনের প্রবাদবাক্যকে সাবলীলভাবে গ্রহণ করেছেন। এইগুলি অনায়াসবোধ্য, দেশের মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত, জনগণের সাধারণ জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ, সত্য মিথ্যাবোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথচ সেগুলি চরিত্রশক্তি ও সহজ জ্ঞানের নির্দেশক।

শংকরদেবের রচনার যত কিছু গুণ বা দোষত্রুটি থাকুক না কেন, বা তার পরিধি যত সীমাবদ্ধ হোক, গত পাঁচ শতাব্দী ধরে এইগুলি অসমীয়া জনমানসে আনন্দ, প্রেরণা, সান্ত্বনা এবং জ্ঞান দিয়েছে। তাঁর নিজের জীবিতকালে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলে সমাদৃত হয়েছেন এবং পরবর্তী যুগে তাঁর কাব্য পরশ-পাথরের মতো অন্য কবিদের আকৃষ্ট করেছে এবং তাদের রচনার বিচার বিবেচনার মানদণ্ডরূপে গৃহীত হয়েছে ও তাদের কৌলীন্য দান করেছে। অসমীয়ারা তাঁকে সম্মান দেয়, শ্রদ্ধা জানায়, কারণ তিনি সাহিত্যের দিক্‌বলয়কে প্রসারিত করে দিয়েছেন নব নব কল্পনায় ও চেতনায় এবং ভারতের অন্য প্রাদেশিক সাহিত্য থেকে এবং বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সত্য শিব সুন্দরকে আহরণ করে এনে দেশজ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমরা মাধবদেবের অনুকরণে বলতে পারি—"পূর্বে প্রেমামৃতধারাগুলি স্বর্গেই প্রবাহিত হত, শংকর এলেন ত্রিদিবের স্রোতস্বতীগুলির বাঁধ ভেঙে দিলেন এবং দেখ, এখন ঐ অমৃতধারা সারা পৃথিবীকে প্লাবিত করছে।" যদিও কালের

পরিবর্তনে যুগে যুগে সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়ে যায়, কাব্যচেতনার পরিধি, মূল্যবোধ, আদর্শের পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়, নব নব সৃজনী প্রতিভা ও সাহিত্য-পন্থার উদ্‌গম হয়, তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে শংকরদেবের কাব্যে চিরন্তনীর ছাপ পড়েছে। আজও তাঁর একাঙ্কিকাগুলি অভিনীত হয়, তাঁর বরগীতগুলি সাদরে গীত হয় এবং উৎসাহ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই তাঁর কাব্যগুলি পঠিত হয়। আমাদের জাতীয়, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক এই পিতৃ-রিকৃথকে যেন আমরা সযত্নে রক্ষা করতে পারি।

অসমীয়া বৈষ্ণব আন্দোলনে এর পরের নামই তাঁর প্রিয় শিষ্য মাধবদেবের। তিনিও অসমীয়া সাহিত্য গগনের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—একটি দীপ্যমান জ্বলন্ত অর্চিরেখা। তাঁর জন্ম লক্ষ্মীপুরের লেটেকুফুকরি গ্রামে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন শাক্ত, পরে শংকরদেবের সংস্পর্শে এসে তাঁর পরিবর্তন ঘটে এবং শংকরদেব তাঁকে তাঁর মতে দীক্ষিত করে নেন। সেই সময় থেকে মাধবদেব শংকরদেবের ছায়া এবং তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত অনুরক্ত ভক্ত ও অনুগামী। তাঁকে লাভ করে আসামের বৈষ্ণব আন্দোলন এক নবচেতনায় জাগ্রত হয় ও নূতন শক্তি আহরণ করে। তাঁর ভিতরে সুপ্ত ছিল বিরাট জ্ঞান, অদ্ভুত চরিত্রশক্তি, যার প্রয়োজন ছিল সামাজিক ও ধর্মজীবনে নূতন বিপ্লব আনবার জন্য। সেই যুগের উপযোগী জ্ঞানী ও বিদ্বান ছাড়াও তিনি ছিলেন সুগায়ক। শংকরদেবের উপদেশের প্রায় বিরুদ্ধতা করেই তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন। এবং তাঁর আদর্শ অনুযায়ী একটি সন্ন্যাসী সংঘও গড়ে ওঠে যার নাম ছিল 'কেবলীয়া', যাঁরা বিবাহ করতেন না। প্রকৃতপক্ষে মাধবদেবই বৈষ্ণবসত্র গঠনে ও এক আজীবন ব্রহ্মচারী সংঘ স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁর নিয়মাবলীও সুকঠোর ছিল, তবে শংকরদেবের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা সুবিদিত। মাধবদেব এই সব সত্রের সন্ন্যাসীদের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন ও দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ অবশ্যপালনীয় নিয়ম হিসাবে বিধিবদ্ধ করেন ও দীক্ষাকালে এই সংকল্পগুলি ঘোষণা করতেন। শংকরদেবের মহাপ্রয়াণের পর যখন তিনিই সংঘাধিপ হলেন তখন তাঁর এই অনুশাসন সকল আচার্য[১] ও তাঁদের

---

১ গুরু সম্প্রদায়

শিষ্যদের উপরও প্রযোজ্য হওয়ায় এই বিধি নিষেধগুলি সম্বন্ধে মহাপুরুষীয়া[১] বৈষ্ণব সমাজে বেশ কিছু মনান্তর ও মতান্তর ঘটে।

মাধবদেবের প্রথম সাহিত্যিক প্রয়াস—'জন্মরহস্য'—বা পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে এই ধরিত্রীর সৃষ্টিস্থিতি ও ধ্বংসের বিবরণ প্রণয়ন। তাঁর পরবর্তী সাহিত্যিক রচনা—বিষ্ণুপুরী সন্ন্যাসীর 'ভক্ত রত্নাবলী'র গদ্য থেকে পদ্যে পরিবর্তন। ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে এই সুপরিচিত গ্রন্থখানির অসমীয়ায় পদ্যে অনুবাদ শংকরদেবের আদেশেই মাধবদেবের কীর্তি। এই অনুবাদে তিনি 'কান্তিমালা' নামক ভাষ্যের কিছু কিছু অংশও যুক্ত করে দিয়েছিলেন। মাধবদেব 'রামায়ণ'-এর আদিকাণ্ড অনুবাদ করেন। তাঁর আর একটি বহু প্রশংসিত রচনা 'রাজসূয়যজ্ঞ'—মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞের নানা কাহিনী এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। পুস্তকটি পদে পদে স্বাদু এবং জনসাধারণের বোধগম্য করবার জন্যই লিখিত। অনেক কিছু কৌতুহলো-দ্দীপক ঘটনার বিবরণ এতে স্থান পেয়েছে। কবির কাব্যপাঠে বোঝা যায় যে তিনি বিখ্যাত সংস্কৃত কবি মাঘ ও অন্যান্যদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই সব রচনার পর মাধবদেবের কবি হিসাবে প্রাজ্ঞতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়। একদিকে যেমন তিনি সহজ সরল সুন্দর কবিতা লিখতেন, তেমনি অন্যদিকে গভীর দার্শনিক তথ্য ও তত্ত্ব বিচারবিশ্লেষণেও সুপটু ছিলেন। তাঁর বিশাল মনীষা ও মেধা, বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান ও অপার বিদ্যাবত্তাই শংকরদেবের বৈষ্ণববাদকে সুবিস্তৃত বনিয়াদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে মাধবদেবের শ্রেষ্ঠ রচনা 'নামঘোষা' বা 'হাজারী ঘোষা' (হাজার শ্লোকের সংগ্রহ) শুধু আসামের নয়, সারা ভারতের দার্শনিক ভক্তি সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্যপূর্ব স্থান অধিকার করে আছে। এটি শুধু বহুপঠিত নয়, অনেকেই যে এই গ্রন্থ থেকে স্তবাদি আবৃত্তি করতেন, তাও নয়, এই পুস্তকটি অসমীয়া বৈষ্ণব সাধনার একটি বিশিষ্ট স্তম্ভ। নামঘোষায় বিধৃত মাধবদেবের জীবনবেদকে জীবনবাদে ভাগ করে জীবনবোধে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এই ভাবে—মায়া কাকে বলে তার ফলাফল, এই ভূমণ্ডল কী ও তার বিবরণ ও বর্ণনা, ব্রহ্মের স্বরূপ ও শ্রীরূপ কী, আত্মো-পলব্ধির পন্থা, জীবের মনস্তত্ত্ব এবং এই মানবজীবনের পরিণাম।

১ শংকরদেবের শিষ্যসংঘ

সবপ্রথমেই নামঘোষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মায়ার ঘোরে নিদ্রিত মানুষ স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনাগুলিকে তৎকালিক সত্য বলে মনে করে। সুচারুভাবেই রূপায়িত হয়েছে যে যদি কোনো মানুষ সুষুপ্তির স্বপ্ন দেখে এবং সেইটেকেই সত্য বলে মনে করে কিন্তু সেটা যে তারই সৃষ্টি একথা ভুলে যায়, মায়ার খেলাও অনেকটা সেই ধরনের। তার প্রভাবে ব্যক্তি সত্তার ভ্রান্তি হয়, তার প্রকৃত রূপ কী সে তা ভুলে যায় এবং এই অসত্য পৃথিবীকেই সে মনে করে সত্য—সেইজন্য মাধবদেবের উক্তি—হে হরি, অবিদ্যা আমাদের এমনই বিভ্রান্ত ও বিমোহিত করে দেয় যে তোমার সত্যমূর্তিতে তোমাকে জানতে পারি না। মাধবদেবের সুস্পষ্ট বক্তব্য যে আমরা যা কিছু দেখি তা নাম। তাই নাম বা রূপের মধ্য দিয়ে সবই ভ্রান্তি এবং এই মনোবিকারকেই নির্মূল করে দিতে হবে।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এই পৃথিবীর বিকাশ নেতি থেকে নয়। ভাগবতের মর্ম হচ্ছে যে এই ধরণীর সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সবই কৃষ্ণের ইচ্ছায়। নামঘোষায় এই ব্যাসকূটকে সমাধান করা হয়েছে এই বলে যে এই পৃথিবী পুরুষ ও প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হলেও এর মূল কারণ এবং এই দুইয়েরই রক্ষাকর্তা হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর নারায়ণ।

এই ধরাধামের অন্তরের যিনি অধিবাসী সেই পুরুষের দুই রূপ—ক্ষর ও অক্ষর—অর্থাৎ একদিকে তিনি ক্ষয়শীল আর একদিকে অক্ষয়। উত্তমপুরুষ যিনি তিনিই পরমাত্মন অব্যয়, তিনিই মহাপ্রভু, তিনিই ত্রিভুবনেশ্বর সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন। তাই ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং ব্রহ্মই একমাত্র প্রকৃত সত্তা। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, সর্বগ এবং সর্বানুভূ। মাধবদেব বলেন—আমার প্রণতি নাও প্রভু, নমি আমি তোমায় বারে বারে—তুমি যে সকল কালের, তোমায় কেউ কলঙ্কিত করতে পারে না—তুমিই একমাত্র সত্য ও সৎ, তুমিই চিরকালের নরের অয়ন বা আশ্রয়, নারায়ণ, তুমিই শিব, অর্থাৎ মঙ্গল ও কল্যাণ—তুমিই আদি, তুমিই অন্ত, তুমিই সেই চরম নির্গুণ সত্তা। তুমিই সেই পরম পুরুষ যিনি আদ্যন্তবান ভগবান। তুমিই একমাত্র সত্য চেতনা যার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এক কথায় নামঘোষা এই ঘোষণাই করেছে।

নামঘোষা বলে যে একমাত্র ব্রহ্মই সনাতন, অনন্ত, সদাশয়, সত্য, সর্বত্র বিরাজিত, অদ্বিতীয় এবং অনির্বচনীয়। এক কথায় যা কিছু নাম ও রূপের

ভেদ আমরা দেখতে পাই সবই ব্রহ্মের রূপান্তর গোত্রান্তর। ব্রহ্ম সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান, কাল, পাত্র বা কারণের অতীত। ব্রহ্ম হচ্ছেন শুদ্ধ, অভেদ, অবিনশ্বর পূর্ব চেতনার পূত আধার। যার আদি নেই বা অন্ত নেই তার মধ্যে বিরাজমান হওয়া যায় না। তাই ব্রহ্ম যেন আকাশের বিরাটত্ব যার আদি বা অন্তকে পরিমাপ করা যায় না। এই অপরিমেয় ব্রহ্মই এই বিশ্বের স্রষ্টা, ধাতা, পাতা ও লয়কর্তা। এই পরমব্রহ্মই একাধারে অন্তর্লীন ও বহির্লীন, সব দিকেই পরিব্যাপ্ত আবার সব কিছুরই অধিকর্তা, ইনি ত্রিভুবন জুড়ে অথচ বাইরে। ইনি ত্রিগুণাতীত এবং ভালোতেও নেই মন্দতেও নেই। ইনি সম[১], নরোত্তম[২], নির্বিকার[৩], নিরঞ্জন[৪], সবার উপরে তিনি সহজানন্দ[৫], স্বরূপানন্দ[৬] এবং পরমানন্দ[৭]।

নামঘোষা অনুসারে আত্মোপলব্ধির দুই সোপান—ভক্তি ও গুরুর কৃপা। নামঘোষার উপদেশ অনুসারে ভক্তিই সহজতর পন্থা। এই ভক্তিবাদ জ্ঞান, কর্ম বা যোগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান ও কর্ম ভক্তি বিহনে বিফল। নামঘোষার উক্তি—সত্যযুগের জন্য যোগ বা ধ্যানই সার্থক পন্থা ছিল, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে পূজা, অর্চনা, আচার ইত্যাদি, কলিযুগে[৮] নামজপ—হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈবকেবলম্। এই বিশাল ভবার্ণবের পারের একমাত্র কাণ্ডারী হরিনাম, মুক্তির আর কোনো পথ নেই। ভক্তিভরে হরিনাম কীর্তন কলিযুগের একমাত্র সত্যধর্ম। যিনি রাম বা কৃষ্ণনামের অজেয় কবচ পরে নিজেকে আচ্ছাদিত করে রাখেন, তিনি আর সত্ত্ব রজঃ বা তমোগুণের তাড়নায় আক্রান্ত হন না। হরিনাম গানের কবচের এমনি মাহাত্ম্য যে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুও তাঁর পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদকে নানাভাবে পীড়ন করেও তাঁর দেহের একটি কেশাগ্রেরও ক্ষতি

---

১ সমান

২ লোকেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

৩ পরিবর্তনহীন

৪ অমলিন

৫ যেখানে আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত

৬ যেখানে মহাপ্রকৃতির সত্যরূপ আপনি স্ফূর্ত

৭ সর্বোত্তম আনন্দ

৮ যুগ একটি সময়বৃত্ত—চারিযগ—সত্য ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—বর্তমানে কলিযুগ

করতে পারেন নি। প্রয়োজন নেই বেদ, শাস্ত্র বা তন্ত্রাদি পাঠের, এমন কি সারাদেশব্যাপী তীর্থযাত্রার। যদি এই ভবসংসারের দুঃখ জ্বালা থেকে নিবৃত্তি পেতে হয়, তবে সেই বিপদের একমাত্র সুষ্ঠু সমাধান—গোবিন্দের পুণ্যনাম স্মরণ। নামঘোষা এই প্রসঙ্গে গুরুর সাহায্যের উপর বিশিষ্ট মূল্য দান করে। আত্মোপলব্ধির প্রধান উপায় সৎগুরুর উপর নির্ভরশীলতা ও তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ। নামঘোষায় গুরুভক্তির উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে—শিষ্যদের কাছে গুরুই ভগবান বা তাঁর প্রতিভূ। দুইয়ের মধ্যে গুণগত কোনো প্রভেদ নেই, যদিও গুরুর মাধ্যমেই ভগবান আপনি ধরা দেন। গুরু এবং ভগবান দুইজনেরই চিত্ত মধুর, বিধুর, স্নেহশীল, ক্ষমাপ্রবণ এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন—এই পৃথিবীর মঙ্গলই তাঁদের চিন্তা, তাঁরা অহমিকাশূন্য এবং নিজেদের হৃদয়মাধুর্য ও গুণে সকলকেই আনন্দের দৃষ্টিতে দেখেন।

গুরু ব্রহ্মেরই প্রতীক এবং তিনিই শিষ্যকে সেই উপলব্ধির শিখরে 'হাত ধরে মোরে নিয়ে চল' বলে নিয়ে যেতে পারেন, জীবনমুক্ত অবস্থায় পৌছিয়ে দিতে পারেন—শাস্ত্র সেই দুর্গমদুস্তর পন্থার সন্ধান দিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মের সত্য নিত্য জ্ঞান গুরুর সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়। সেই জন্য গুরুই আত্মোপলব্ধির প্রধান এবং প্রকৃত সহায়।

নামঘোষার মতে জীব ব্রহ্মের থেকে অপর নন। কিন্তু অবিদ্যা বা মায়া পদে পদে বাধা দিচ্ছে। জীবের অন্তর্নিহিত শক্তি ব্রহ্মের মতোই অনন্ত ও অসীম। কিন্তু জীবাত্মা সেই পরমাত্মন্ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে না—অবিদ্যার দ্বারা সে বোধ আবৃত। সে মনে করে যে এই অবাস্তব দেহটাই বুঝি আত্মা এবং এই ধরণীর নানা দেহজ সুখে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে থাকে। যখন অবিদ্যার বিনাশ ঘটে তখন কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ ঘটে, যেন তিনি কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছেন। মায়ার দ্বারা আবৃত এবং অহং জ্ঞানের দ্বারা অহংকৃত হয়ে জীব সংসারের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে থাকে। এই অহংজ্ঞান যতক্ষণ না বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ এই সংসার থেকে মুক্তি নেই।

নামঘোষায় তাই বারে বারে এই প্রার্থনাই জানানো হয়েছে যে—হে কৃষ্ণ, এই জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করো তুমি। এই কামনার ঘূর্ণিপাকই জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের আবর্তনচক্রের জন্য দায়ী। মানুষ কামনা করে, তারই দাস হয়ে তদ্রূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং ফললাভ করে অনুরূপ। জন্মজন্মান্তরের

ধারা বেয়ে এই কামনা বাসনার স্রোত চলছে এবং তাদেরই তাড়নায় মানুষ ছুটে চলেছে। এই বিষয় বাসনার উচ্ছেদই আত্মোপলব্ধির পথ এবং পরমানন্দ লাভের একমাত্র উপায়।

নামঘোষার মতে সব আধ্যাত্মিক চেষ্টার পিছনে আছে কীভাবে তা পাওয়া যায়—যং লব্ধা চাপবং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ—যা পেলে সব লাভই তুচ্ছ মনে হবে। নামঘোষায় আত্মোপলব্ধি ভক্ত ও ভগবান এক হয়ে অদ্বৈতে লীন হওয়া নয়। এখানে ভগবানের সাযুজ্য সামীপ্য লাভই যথেষ্ট, যেখানে জীব শুধু হরিনাম করেই রসাপ্লুত হতে পারে। এখানে ভক্ত, মুক্তির চেয়ে রাম-কৃষ্ণ নামানন্দে মগ্ন হয়ে থাকতেই ভালোবাসে। এক কথায় কৃষ্ণ ভক্তিতে নিমজ্জিত হয়ে অখণ্ড আনন্দ সুধারস পানই উদ্দেশ্য। যাঁরা একমনা এবং ভক্তিতে অটল তাঁরা আর কিছু চান না শুধু নাম-সাগরে ডুব দিয়ে চিরকালের চরম আনন্দ রস পান করতে চান ; তাঁদের কাছে তার চেয়ে মধুর ও মঙ্গলদায়ক বা আশ্চর্যময় অনুভূতি আর কিছু নেই।

এ ছাড়া, নামঘোষায় অনেকগুলি স্তোত্র ও গীতি আছে যেখানে অনুতাপ, অনুবোধ, আত্মদমন এবং আত্মানুরাগ লিপিবদ্ধ। এইসব কাব্যমীমাংসায় মানব-মনের সনাতন ক্রন্দন কাব্যে ঘনীভূত হয়েছে এবং অপরূপ উল্লাসে ফুটে উঠেছে। গ্রন্থটির শেষ কয়েকটি পরিচ্ছেদ ভক্তদের পরমপূজ্য কৃষ্ণনাম উচ্চারণের জন্য উপদেশ কথামৃত রূপে ব্যবহৃত হয়। নামঘোষার একটি সার্বজনীন আবেদন আছে সেইটি মহান সাহিত্য উপনিষদ ও গীতার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যেন একসুরে বাঁধা। চিন্তার গভীরতা, দৃষ্টিভঙ্গির একতা এবং ছন্দ ও শব্দমাধুর্য নামঘোষাকে একটি রসোত্তীর্ণ কালজয়ী শাশ্বত গ্রন্থ রূপে অভিনন্দিত করে এবং মাধবদেবের কবিত্ব শক্তি ও দার্শনিক চিন্তার ও চেতনার একটি বিরাট স্মৃতিচিহ্ন বহন করে। মাধবদেব কতকগুলি একাঙ্কিকাও (আঙ্কিয়ানাট) লিখেছেন, যেমন 'চোর ধরা' 'পিম্পরা গুচুভা', 'কোটোরা খেলোভা', 'ভূষণ হোরাভা', 'ভূমি লুটিভা'—সবই কৃষ্ণের বাল্যলীলার ছবি। মাধবদেবের এইসব আঙ্কিয়ানাটগুলিতে গানের সংখ্যা ও সংস্কৃত শ্লোকের উক্তি শংকরদেবের অপেক্ষা কম এবং সেই জন্য এদেশে মাটির মানুষদের কাছে সহজবোধ্য চিত্তাকর্ষক। মাধবদেব বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর বরগীতের মাধ্যমে জনগণের অত্যন্ত প্রিয় হয়েছিলেন। এইসব প্রাণমাতানো ভক্তিগীতিগুলির মাধ্যমে তিনি নিরভিমানে

যেন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছেন, সেই পরমপুরুষের পাদপদ্মে যাঁর ইচ্ছায় ও আশীর্বাদে সব পাপতাপ সম্পূর্ণরূপে ধৌত হয়ে বিলীন হয়। তাদের কতকগুলির মাঝে আছে বৃন্দাবনের সরস বর্ণনা যেখানে শিশু ও কিশোর কৃষ্ণই সব গাথার কেন্দ্র। এই সব গীতগুলি শৈশববয়সের কৃষ্ণকে অবলম্বন করে লেখা বলে শুধু তাঁর শৈশব ও বাল্যলীলার ছবি নয়, সময়োচিত ভাবনার চিত্রও। এইসব বরগীতে, ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব ও বিরাটত্ব মানবোচিত গুণে বিভূষিত হয়ে উঠেছে। শিশু ও কিশোর কৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রকৃতির সৌন্দর্য এখানে মানসিক উপাদানে আরও মধুর, বিধুর ও বিশদভাবে ব্যক্ত। শিশুর চিরকালীন মনকে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আরোপ করে তাকে বর্তমানের উপযোগী এবং সহজ সরল ও তীব্র হাস্যরসে অমৃত ঝরিয়েছিল। মাধবদেবের লেখনী নব নব ভাবে ঐসব চিরপরিচিত চিত্রগুলিকে অঙ্কিভ করে জীবনের অতি পরিচিত ও পরিমিত ঘটনারাজিকে নূতন রসে মণ্ডিত করেছে। কতকগুলি কবিতা অতিবজীবন্তভাবে শিশুকৃষ্ণের বালসুলভ চাপল্য, চাতুরী ও ছলের চিত্র এঁকে ও তাঁর রঙ্গবিলাস দেখিয়েছে, বিশেষ করে মা যশোদার কাছে পুত্রের নানাবিধ আদর আবদারের কথা ও কাহিনী সুন্দর ভাবে অঙ্কিত। কতকগুলি গীতি বিরহের আবার কতকগুলি পুত্রবিচ্ছেদে মায়ের হৃদয়বিদারক বিলাপের ধ্বনি—তার মধ্যে সর্বজয়ী কম্পমান মাতৃস্নেহ যেন গভীর ভালোবাসায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণ যে মা যশোদার চোখের মণি—তাঁর সব কিছু কাজ কৃষ্ণকে ঘিরে এবং বালগোপালই তাঁর সুদীর্ঘ তপস্যা, কষ্ট ও প্রার্থনার ফল যদিও সেই ফললাভ হয় তাঁর বেশি বয়সে। রাস্তায় তখনও অরুণের আলো ভালো করে ফোটে নি, সেই আধো অন্ধকারেই সখাদের সঙ্গে খেলার জন্য আমাদের কৃষ্ণ-ঠাকুরটির অন্তর্ধান। মা যশোদা খুঁজে খুঁজে আকুল এবং কখন তাঁর সোনার চাঁদ ফিরবেন সেই ভাবনায় ব্যাকুল। এই অস্থির মন নিয়েই তাঁর প্রহরের পর প্রহর কাটে ; স্বাভাবিক ভাবেই বেলা বাড়ে, মাতৃহৃদয় সন্ত্রস্ত ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মা যশোদাকে জিজ্ঞাসা করতে হয় রাস্তার পথিকদের—হ্যাঁগা, তোমরা কি কেউ দেখেছ আমার কৃষ্ণকে ! শেষপর্যন্ত পায়ে পায়ে এগিয়ে যান যমুনার তীর পর্যন্ত, তাঁকে দেখতে না পেয়ে হাহুতাশ করেন, কান্না জুড়ে দেন এবং অবশেষে সংজ্ঞা হারান। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর আবার কাঁদতে বসেন—

"তিনি অঝোরে কাঁদছেন, নয়নাশ্রুতে বিগলিতধারা দুইগণ্ডদেশ—তিনি

ডাকেন—যদুবংশের চোখের মণি, তুমি কোথায় ? এবং শেষ পর্যন্ত হতাশায় ধুলায় গড়াগড়ি দেন। এই রকমের ভালোবাসা স্বর্গীয়"।

এই ধরনের বিরহ-বিচ্ছেদ কাহিনী বর্ণনায় মাধবদেব আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ ভাবের তুমুল তাণ্ডবতার চেয়ে তার গভীরতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। খুব স্বল্প কথায় তিনি নিজের আত্মার সংবৃত্তিরই ছবি এঁকেছেন এবং তাঁর নিজের মনের ব্যকুলতাকে শোকসন্তপ্তা মাতার বিরহ-ব্যথার আর্তিতে পরিণত করে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। এইসব গীতাগুলির স্বরছন্দ তাল এমন এক সুন্দর বৈচিত্র্যে ভরা যে পুত্রের অদর্শনে বুকফাটা কান্না নিয়ে মায়ের ব্যথা তাকে এমন সুন্দর ভাবে রসায়িত করেছেন কবি, যে পলাতক শিশু যেন যে মুহূর্তে লাফিয়ে মাতৃক্রোড়ে বসবে এবং মৃদু হাস্যে মাকে আদর করবে এবং মাও তাকে প্রত্যুত্তরে সজোরে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবেন। অসমীয়া বৈষ্ণব সাহিত্য এইভাবে অপরূপ কাব্যে শৈশব ও বাল্যলীলার অনন্য সৌন্দর্য এবং মাতৃপ্রাণের বিরহবেদনার একটি চিরকালীন চিত্র রেখাবদ্ধ করেছে তা অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে একটি চমৎকার যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন—যেখানেই গভীর ও অকৃত্রিম ভালোবাসা আছে, সেইখানেই এবং সেইটিই ঈশ্বরের সত্যি-কার পূজা। যখনই আমরা মানুষকে ভালোবাসি তখনই ভগবানকে অনুভব করি। শিশুর ঐ কোমল ক্ষুদ্র আননে এমন কী একটা আছে যা সকলকে মুগ্ধ করে। সেটা যে কী তা বোঝাই মুশকিল—সুবিধা মতো বাক্যের অভাবে তাকে আমরা বলি—সৌন্দর্য। এই সুন্দরতমকে ধরতে গিয়েই আমরা অনেক সময় আমাদের হৃদয়ের গভীরতম কেন্দ্রের স্পর্শ পাই। যোগীরা সেই লাভের জন্যই আহার বিশ্রাম ত্যাগ করে এই সুন্দরের সন্ধানে বের হন। কিন্তু মা তাঁর কোলের ছোটো একটি মানবকের মুখের দিকে চেয়েই সেই অমৃতরস ও সৌন্দর্যসুধারস পান করেন। তাই এইসব গীতে প্রতিটি মায়ের কোলের শিশুই সেই যশোদানন্দনের রূপ নেয়। সর্বজনীন একই হন বহু এবং নিজের সন্তানই যেন যশোদা নন্দন। স্বর্গের দেবতা মর্ত্যের শিশুরূপে মানবকে আরও নিকটে নিয়ে যাবার এই নিত্য প্রয়াস।

শংকরদেবের মহাপ্রয়াণের পর মাধবদেব আরও আটাশ বছর বেঁচেছিলেন। তিনি বেশিরভাগ সময়ই ছিলেন বড়পেটার প্রধান সত্রের নিকটে গণখুচি এবং

সুন্দরীদিয়া সত্রে। এইখানে মাধবদেব পূর্ণ কোচ রাজ্যের অধিপতি রঘুদেবের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর নিকট এই অভিযোগ উপস্থাপিত হয় যে কোচরাজাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামাখ্যার বিরুদ্ধে মাধবদেব প্রচার চালাচ্ছেন। সেইজন্য রঘুদেব তাঁকে বন্দী করে তাঁর রাজধানী বিজয়নগরে নিয়ে আসবার আদেশ দেন। কিন্তু এই অভিযোগ মিথ্যা প্রামাণিত হওয়ায় তিনি সসম্মানে মুক্তি পান। তারপর মাধবদেব কিছুদিন হরগ্রীব মাধবের মন্দিরের নিকট হাজোয় অবস্থান করেন। কিন্তু এখানেও স্বয়ং রাজা ও ব্রাহ্মণরা তাঁর উপর বিরূপমনোভাবাপন্ন হওয়ায় তিনি শেষ পর্যন্ত পশ্চিম কোচ রাজ্যে চলে যান। রাজা নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে যথোচিত সংবর্ধনা জানান এবং তাঁকে ও তাঁর শিষ্যদের রাজধানীর নিকটেই ভেলডুয়ার নামক একটি গ্রামে উপনিবিষ্ট করান এবং রাজার বদান্যতায় এইখানে একটি সত্র তিনি স্থাপন করেন ও সশিষ্য বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এখানেই তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল শান্তিতে অতিবাহিত করেন। এবং রাজবাটীর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও তাঁদের সহধর্মিনীদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেন। এখানেই বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ রচনা 'নামঘোষা' পুস্তকটির শেষ রূপ দেন। তিনি ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্থানে অর্থাৎ ভেলডুয়ারেই মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

এই দুই মহান বৈষ্ণব নেতা শংকরদেব ও মাধবদেব রচিত 'বারিত' (বরগীত) ও 'আঙ্কিয়ানাট'গুলিই শতাব্দীর পর শতাব্দী অসমীয়া ভক্তি-সাহিত্যে রসস্রোতের ধারা বুকে নিয়ে এক বৃহৎ এবং মুখ্য স্রোতস্বতীতে পরিণত হয়েছে, যেখানে অন্য সব উপনদী এসে মিশে একে বেগবতী করে তুলেছে। প্রভাতসূর্যের জাগরণ থেকে সন্ধ্যাদীপের ক্ষণ পর্যন্ত ভক্তিমূলক নানা অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন শংকরদেব। এগুলির নাম 'প্রসঙ্গ' এবং এগুলির অভিনয় হত সারাদিনের নানা সময়ে ও বিভিন্ন পর্যায়ে। শংকরদেবের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ পদক্ষেপ যে ভক্তিরসকে উজ্জীবিত করে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন নাট্যগীতির মাধ্যমে। তিনি এই রীতি প্রচলন করেন যে প্রত্যেক মঠাধীশ বা সত্রাধিকার তাঁর শিষ্যদের পুরোহিত হিসেবে দীক্ষার সময় এইসব গীত বা আঙ্কিয়ানাট অভিনয় করাবেন। এইভাবেই অসমীয়া সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে সাহায্যও সম্ভব হয়েছে। প্রথম দিকের এক

সত্রাধিকারী ছিলেন গোপাল আটা (১৫৪৭-১৬১১) যিনি মাধবদেব কর্তৃক দ্বাদশধর্মাচার্যদের একজন নিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি কলঝর সত্র ও কলসংহতি নামে শংকরদেব সমাজের মধ্যেই উপসম্প্রদায় গঠন করেন। অহটগুড়ি সত্রের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরাম আটা ও তাঁর পুত্র রামচন্দ্রদ্বিজ প্রাচীন রীতি অনুযায়ী বহু স্তব স্তুতি রচনা করেছিলেন। তাঁরা আহোম নৃপতি চক্রধ্বজ সিংহের (মৃত্যু ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) সমকালীন। এঁদের লেখার মধ্যে শংকরদেবের ভাবভাষা পদলালিত্য বর্তমান। এঁদের লেখার বৈশিষ্ট্য এই যে অসমীয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁরাই প্রথম কৃষ্ণ ও রাধার যুগল প্রেমের অবতারণা করেন—যে প্রসঙ্গ এর আগে অসমীয়া সাহিত্যের জাগরণের দিনে অজানা থাকায় আলোচিত হয় নি।

অসমীয়া বৈষ্ণব নবজাগরণের আর একটি বিশিষ্ট রূপ হল এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদীক্ষা শুধু পুরুষদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, নারীরাও এতে যোগ দিয়েছিলেন এবং এই জাগৃতি সকল স্তরেই প্রবেশ করে সত্যিকার গণ জাগরণের রূপ নিয়েছিল। মহিলা কবিদের মধ্যে কনকলতা বা লক্ষ্মী আঈ-এর নাম প্রসিদ্ধ—তিনি শংকরদেবের পৌত্রবধূ ছিলেন এবং কিছু ভক্তিমূলক স্তব ও প্রণতিস্তোত্র রচনা করেছিলেন। তিনি শুধু আসামের প্রথম মহিলা কবি ছিলেন না, তিনিই প্রথম অসমীয়া রমণী যিনি সত্রের অধিনায়িকা পদে বৃত হন।

ভাগবতের পরে মহাভারতই অসমীয়াদের কাছে প্রাধান্য পায়। মহাভারতকে তাঁরা একটি বিশিষ্ট বৈষ্ণব প্রামাণ্যগ্রন্থ বলেই গণ্য করেন। অনুবাদের মাধ্যমেই নিজেদের মনের মতো বিষ্ণু ও কৃষ্ণ কথাই সন্নিবিষ্ট করে ভক্তিপদাবলী রচনা করতেন, যাতে শুধু ঐহিক কথার সারমর্মই থাকত না, উপস্থাপিত হত বৈষ্ণবজনোচিত ত্যাগ, বৈরাগ্য, সদাচার, সহজ সরল জীবনযাপনের নির্দেশ, সত্যবাদিতা, তীর্থভ্রমণের গুণকীর্তন ইত্যাদি। অসমীয়া লেখক লেখিকাদের মধ্যে মহাভারতীপন্থী কবিদের মধ্যে রাম সরস্বতীই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তিনি শুধু অতি জনপ্রিয় পদকর্তা বা কবি নন, একজন অক্লান্ত সুধী লেখক যিনি সেই সময়ের পদরচয়িতাদের মধ্যে কবিশিরোমণি নামে খ্যাত ছিলেন। রাজ-আদেশে তিনি মহাভারতের অসমীয়া অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন এবং সুচারুরূপে তা সুসম্পন্ন হয়। তাঁর মহাভারতের অনুবাদ স্থানে স্থানে মূল সংস্কৃত থেকে কিছু বিপরীত ছিল। তিনি নানা ছদ্মনামে মহাভারতের বৃহৎ অংশ অনুবাদ করেন। —তিনি অনিরুদ্ধ, কবিচন্দ্র, ভারতভূষণ এবং শ্রীনাথ নামেও নিজেকে অভিহিত

করেন। কবি নিজেই বলেছেন যে তিনি ত্রিশহাজার শ্লোক অনুবাদ করেছেন এবং অন্যেরা তিন হাজার, একহাজার নয়শত নিরানব্বুইটি আদি পর্বের পদ, সভাপর্বের একহাজার তিয়াত্তরটি পদ তাঁর পুত্র গোপীনাথ পাঠকের সহযোগিতায় অনুবাদ করেছেন। সমগ্র বনপর্ব এবং উপপুরাণগুলি রাম সরস্বতীর নিজের অনুবাদ। অসমীয়া বনপর্বের বিশেষ কয়েকটি অংশ আছে যেমন আদিবনপর্ব (৮৩৩ পদ) পুষ্পহরণ বনপর্ব (৫৮৪ পদ), মণিচন্দ্র ঘোষ পর্ব (১০৮৫ পদ), বিজয়পর্ব (২২২২ পদ), শেষ বাণপর্ব (৭১৮ পদ) এবং সিন্ধু যাত্রা পর্ব (১৮৪২ পদ)। অসমীয়া মহাভারতের বনপর্বে এছাড়াও আছে—কুলাচল বধ (১৮৪৭ পদ), বাঘাসুর বধ (৪১২৫ পদ), খটাসুর বধ (১৮২ পদ), কুর্মাবলী বধ (৩৬৬ পদ), অশ্বকর্ণ বধ (৬১১ পদ), যজ্ঞাসুর বধ (৩০৪ পদ) এবং ভোজকতা বধ। প্রত্যেকটিকে বলা হত বধকাব্য এবং তাদের প্রত্যেকটিই ছিল অতি দীর্ঘ কিন্তু আকৃতি ও প্রকৃতিতে তারা ছিল স্বাবলম্বী। পুরাকালের দৈত্যদানব, দেবদেবী, রাজন্যবর্গ, মুনিঋষি ও সাধুদের সম্বন্ধে যে সব প্রবাদবাক্য বা গল্প প্রচলিত ছিল বা তাদের বীরত্ব গাথা ও অলৌকিক কাহিনীর সমাবেশ ঘটত, সেইগুলি থেকেই উপাদান সংগ্রহ করে পাণ্ডবদের অতিমানবিক বীরত্বগাথা গ্রথিত হয়েছে এই সব বধকাব্যে। স্বাভাবিক ভাবেই এইগুলিতে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব বা দুষ্ট কর্তৃক শিষ্টের দমন এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মের ও সত্যের জয়ই ঘোষিত হয়েছে। মূল মহাকাব্যের গল্পের সঙ্গে এই সমস্ত কাহিনীগুলির মিল খুব কমই দেখা যায়।

এ ছাড়া রাম সরস্বতী উদ্যোগ এবং কর্ণ পর্বও অনুবাদ করেন এবং বিদ্যা-পঞ্চানন নামে তৎকালীন এক কবির সহযোগিতায় ভীষ্মপর্বও অনূদিত হয়। দ্রোণপর্ব অনুবাদ করেন তিনি এবং তাঁর দুই পুত্র গোপীনাথ ও দামোদর। কংসারি কায়স্থ বিরাটপর্ব অনুবাদ করেন ১৩২১টি পদে—তাঁর অনুবাদ সম্পূর্ণ মূলানুগত। কংসারি নিজে একজন সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং রাম সরস্বতী পর্যন্ত তাঁকে কবি ও ঋষি বলে অভিহিত করতেন। এই পর্বের অনুবাদের কিছুটা অংশ শ্রীমন্ত গভরু খাঁয়ের নামে প্রচলিত আছে—তিনি অত্যন্ত ধীরস্থির ভাবে যত্নের সঙ্গে পদগুলি রচনা করেন। অন্যদের মধ্যে ছিলেন দামোদর দাস (শল্যপর্ব), জয়নারায়ণ (স্তুতিপর্ব), লক্ষ্মীনাথ দ্বিজ (শান্তিপর্ব) আর ছিলেন গঙ্গা দাস, সুবুদ্ধি রায় এবং ভবানী দাস; এঁরা একত্রে অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেন। একথা মনে রাখা উচিত যে অসমীয়া মহাভারত, মূল

সংস্কৃত মহাভারতের একেবারে নিছক অনুবাদ নয়। এই পুণ্য গ্রন্থটিকে সামনে রেখে তার আখ্যায়িকাগুলিকে কোথাও বিস্তৃত করে লেখা হয়েছে, কোথাও বা কিছু ঘটনা পরিত্যক্ত হয়েছে, কোথাও কিছু নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে— মোট কথা এই যে মহাভারতকে কেন্দ্র করে এই সম্পাদনা। এখানে দেশজ ছাপ স্পষ্ট এবং এটি সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুসরণ ছাড়াও দেশজ মহাকাব্যের রূপ গ্রহণ করেছে। এতে ফল হয়েছে যে দেশের মৌলিক ধারার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সূত্র স্থাপিত হয়ে গ্রামীণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এবং আনন্দের, বাস্তবতার, রসের সন্ধান দিয়েছে। অসমীয়া কবিরা ইচ্ছা করেই নীতিস্মৃতিশ্রুতি দর্শনের ব্যাসকূটগুলিকে দূরে রেখে তর্কবিচারবিশ্লেষণের পন্থা পরিত্যাগ করে এমনভাবে এতে কৃষ্ণকথা বা বৈষ্ণবজনোচিত ভাব ভাষায় মণ্ডিত করেছেন যে অসমীয়া মহাভারত ভক্তিরসবাদপ্লুত গীতিনাট্যে পরিণত হয়েছে এবং জনসাধারণের কাছে তা সহজবোধ্য ও আপাতসিদ্ধ কথামৃত বলেই প্রতিভাত। বৈষ্ণব কবিরা এই অনুবাদগুলির জনক হওয়ায় মহাভারতের অসমীয়া সংস্করণ সত্রাধিকারদের বৈষ্ণবভাষ্য হয়ে ভক্তিবাদেই প্রবল হয়ে উঠেছে। অসমীয়া সংস্করণে বহু ঘটনার বর্ণনা আছে যা মূল সংস্কৃত মহাভারতের কোনো প্রচলিত সংস্করণে পাওয়া যায় না, (হয়তো কোনো অর্বাচীন অপ্রচলিত পাণ্ডুলিপিতে এর ইঙ্গিত থাকা অসম্ভব নয়) যেমন পঞ্চপাণ্ডবের পিতা মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যু কাহিনী। মূল সংস্কৃতে আমরা পাই যে পাণ্ডু সুন্দরী মাদ্রীর সঙ্গে বনবিহার করছিলেন, এমন সময় মদনতাপে পীড়িত হয়ে মাদ্রীকে আলিঙ্গন করলে তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটে। কিন্তু অসমীয়া কবিরা তাঁকে অন্যভাবে চিত্রিত করেছেন। এখানে দেখি পাণ্ডু ঋষিমুনিদের সঙ্গে রাজসভায় ধর্মালাপ ও নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন ওদিকে সন্ধ্যা আগতপ্রায় এবং সান্ধ্য উপাসনা না করে তিনি জলগ্রহণ করবেন না, সারাদিন অভুক্ত, তাই কুন্তী বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং সপত্নী মাদ্রীকে বলেছিলেন—তুমি সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাক, তোমার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে দিবাকর অস্তগমনে বিলম্ব করবেন এবং মাদ্রী কুন্তীবাক্য পালন করেন। যখন সভা ভঙ্গ হল এবং পাণ্ডু প্রাসাদে নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন করলেন তখনও সূর্য অস্তমিত নন দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন যে কুন্তীর অনুরোধে মাদ্রী নিজের রূপলাবণ্য দেখিয়ে সূর্যদেবকে কিছুক্ষণের জন্য অস্তগমনে নিরস্ত করে ছিলেন। এই কথা শ্রবণ করে তিনি নিজেই কামাতুর হয়ে পড়েন এবং

কুন্তীর নিষেধ সত্ত্বেও অভুক্ত অবস্থায় মাদ্রীর সঙ্গে রতিবিহারে প্রবৃত্ত হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

এই কাব্যে স্থানীয় বহু ঘটনার পরিবর্তিত রূপ মহাভারতের আখ্যায়িকা ও গল্পের সঙ্গে মিশে গেছে, যেমন অসমীয়া সংস্করণে আদিপর্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় রাজা ভগদত্তের উপস্থিতি ও দ্রোণপর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর প্রাণ-বিয়োগের কথা বর্ণিত হয়েছে। এটা খুব অসমীচীন বা অসংগত নয় যে দেশজ-ভাষায় অনুলিখিত সংস্করণে অসমীয়া জীবনযাত্রার সামাজিক পরিবেশ ও সংস্কৃতির স্পর্শ পড়বে। এই ভাবে বহু স্থানে দেশজ স্থানীয় প্রলেপ পড়েছে এবং তার পূর্ণ তালিকা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কাব্যের বহুস্থানে যে সব চিত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে ঐ দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুল ফল, জীবজন্তু, গাছ গাছড়া, তৃণগুল্ম, বিবাহকালীন নানা আচার আচরণ বিধি ও জীবনযাত্রার নানা লৌকিক সূত্র, বেশভূষা, অলংকার, খাদ্য ও পানীয়, উৎসব ও আনন্দ—অনুষ্ঠানের নানা প্রকরণ, গীত বাদ্যের উপকরণ, প্রভৃতি প্রবেশ লাভ করেছে। আদি অসমীয়া ভাষার বিবর্তনও এই সব কাব্যে চিহ্ন রেখে গেছে। এই উদাহরণগুলি অনন্য সাধারণ। কবিরা বিভিন্ন সূত্র থেকে এই সব পদ বা শব্দ ব্যবহার করতেন, তার মধ্যে অনেকগুলিই এখন প্রায় ব্যবহৃত হয় না বা তাদের অর্থ সুস্পষ্ট নয়।

মহাভারতের অনুবাদ অসমীয়া সাহিত্যের প্রসার ও জনপ্রিয়তাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সূত্র অবলম্বনে ঐ গ্রন্থগুলি কথা ও কাহিনীর, গল্পের ও উপমার, প্রাচীন প্রবাদ ও প্রবচনের এক সুবর্ণখনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান-কালের সাহিত্যিকরা এই সব রচনা থেকে প্রেরণা, জ্ঞান ও আনন্দ আহরণ করছেন। গ্রাম্য জনগণের কাছে এই মহাকাব্য শুধু এক আনন্দের উৎস নয়, একটি ধর্ম ও নীতি গ্রন্থের আকরও বটে। অনুবাদকরা বারে বারে ভারতীয় ঐতিহ্যের মানদণ্ডের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন—যেমন সত্যের প্রতি আগ্রহ, সংযম, নিষ্ঠা, সংহতি, কায়, মন, বাক্যের পবিত্রতা ও মানসিক গুণাবলীর প্রতি আচার আচরণে সুষ্ঠু চর্চা। শল্যপর্বের একটি উক্তি খুব সংগতভাবেই উদ্ধৃত করা যায় যে "শাস্ত্র আমাদের ধর্মের ও নীতির প্রয়োজনই সাধন করে না, ঐহিক উন্নতি, জীবনের আনন্দ, আধ্যাত্মিক মুক্তিও সফল করে"।

রাম সরস্বতী জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-র একটি অসমীয়া সংস্করণ প্রণয়ন

করেন। এটিকে ঠিক অনুবাদ বলা চলে না কারণ অসমীয়া কবি এর মধ্যে ভাগবত পুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ থেকেও কিছু কিছু ভক্তিমূলক শ্লোক মন্থন করে এক নব কলেবরে নানা পুষ্পরাজিতে সুসজ্জিত করেছেন, যাতে তার ভোগবাসনার তৃষ্ণা কমে গিয়ে বৈষ্ণব প্রেমের ত্যাগের ধারায় জীবনস্রোত প্রবাহিত হয়।

রাম সরস্বতীর আর একটি জনপ্রিয় কাব্য ভীমচরিত। অসমীয়া সাহিত্যের অন্যত্র ভীমচরিত্র অবলম্বনে এমন একটি সম্যক রসসিঞ্চিত আখ্যান পাওয়া যায় না। মহাভারতের আদিপর্বের ভীমের কৈশোরের একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে এই আখ্যায়িকাটি বিবৃত হয়েছে। গদা হস্তে এক বিরাট বলিষ্ঠ পুরুষ হারকিউলিসের মতো দণ্ডায়মান—তিনি বিশেষ ভোজন পটুও বটে। এই গ্রন্থে ভীম শিবের ষণ্ডরক্ষক ও পালক—শিবের জীবন এক মূর্তিমান ছন্নছাড়া উদাসীর কাহিনী। এখানে শিব একজন সদাব্যস্ত চাষী—কিন্তু তাঁর সাংসারিক বুদ্ধি নেই। স্ত্রী পার্বতী ও দুটি বালক পুত্র নিয়েই তাঁর দুঃখকষ্টের ও অভাব অনটনের সংসার। এইজন্যই বইটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। তা ছাড়া বইটি যেন কৃষক সমাজের বাস্তব ছবি ও তাদের সংসারে সাধারণ সুখের কথাই বর্ণনা করেছে।

রাম সরস্বতীর পুত্র কলাপচন্দ্রও একজন স্বনামধন্য কবি ছিলেন। তিনি ভাগবতপুরাণের চতুর্থ স্কন্ধের কিছুটা অনুবাদ করেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় গ্রন্থ হচ্ছে 'রাধা চরিত'। এই পুস্তকটির গৌরব তার ভাষা বা ভঙ্গির বা রচনা শৈলীর জন্য নয়—তার বিষয়বস্তুর আবেদন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনী সচরাচর অসমীয়া বৈষ্ণব কবিরা চিত্রিত করেন নি। কিন্তু তাঁর রাধা-চরিতে কলাপচন্দ্র এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে রাধাপ্রেমের বিচিত্র লীলা-সংবাদ অসমীয়া পাঠকপাঠিকাদের উপহার দেন কিন্তু তার মধ্যে কোনো রকম ইন্দ্রিয়জ লালসা বা কামকাহিনীর বিবরণ ছিল না যেটি সত্য হোক বা মিথ্যা হোক রাধা কৃষ্ণ কথায় থাকে। কবি রাধাচরিত্রের ভক্তিমূলক দিকটাই অর্থাৎ মনে প্রাণে আত্ম সমর্পণ এবং ভগবানের কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনে ভাবটিই সযত্নে প্রকাশ করেছেন। ভোগবিলাসলালসাবিহীন আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠার চিত্রই রাধা। কবি সেই অনুভূতিকেই কাব্যে সংযত ও সংহত ভাবে রূপ দিয়েছেন—শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁর বিরহব্যাকুল বেদনায় এবং তাঁর অদর্শনজনিত দীর্ঘ যন্ত্রণায়। মোট কথা 'রাধা চরিতে' ভগবানকে কান্ত ভাবেই আত্মসমর্পিত ভজনাই উপজীব্য।

গল্পের ধারা এইরূপ—কৃষ্ণ-প্রেমে গরবিনী রুক্মিণী একদিন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে? কৃষ্ণ অনেক ভক্তের নাম করে বললেন যে কেউই কিন্তু বৃন্দাবনের গোপীদের অতিক্রম করতে পারেন নি এবং তাঁদের মধ্যে রাধাই হচ্ছেন অতুলনীয়া। স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণীর গর্বে একটু আঘাত লাগে। তিনি বললেন—প্রভু, তাঁকে একবার দেখতে পাই নে? শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পাঠালেন তাঁকে আনতে। উদ্ধব সেখানে গিয়ে দেখেন যে বহির্সংসার ভুলে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা অবিরল কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করছেন। তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করে তাঁকে কৃষ্ণের আমন্ত্রণও জানালেন এবং বললেন যে রাধা যেন তাঁর যৌবনকালের রূপরসমণ্ডিত হয়েই আসেন। রাধা তখন একটি অতি সুন্দরী যুবতী স্ত্রীরূপে উদ্ধবের সঙ্গে এলেন, যাঁর কাছে রুক্মিণী ও অন্য কৃষ্ণপ্রিয়াদের অত্যন্ত নগণ্য দেখাতে লাগল। যেমন সূর্যের উদয়ে চন্দ্র ম্লান হয়ে যায়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের অন্য মহিষীরাও রাধার পূর্ণ সৌন্দর্যের অবর্ণনীয় জ্যোতির কাছে মলিন হয়ে গেলেন—তাঁকে দেখাচ্ছিল যেন তিমিরনিবিড় রাত্রির ঘন তমসায় একটি জ্যোতির্ময় মৃণাল বৃন্ত। তখন রুক্মিণী ও অন্যেরা তাঁকে অনেক কিছু উপহার দিলেন। তিনি সে সব কিছুই গ্রহণ করলেন না, শুধু বললেন যে জন্মজন্মান্তরে তিনি যেন শুধু কৃষ্ণ আরাধনাই করতে পারেন।

রাম সরস্বতীর সমসাময়িক কবিদের নামোল্লেখ করেই পূর্ণচ্ছেদ টানা সংগত হবে না। একজনের কথা বলতেই হবে—তাঁর নাম কংসারি কায়স্থ। তিনি তাঁর যুগে একজন ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি-সম্পন্ন সাধু বলেই খ্যাত। কংসারির মহাভারত অনুবাদ প্রায়ই মূলের সঙ্গে সর্বদিকে সংগতি পূর্ণ এবং তাঁর অনুবাদ অন্যসব কবিদের প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করেছে।

এই সময়ের আর একজন সাহিত্যিক জ্যোতিষ্ক অনন্ত কন্দলী। কামরূপ জেলার হাজো নিবাসী ব্রাহ্মণবংশীয় সন্তান তিনি। তাঁর প্রকৃত নাম হরিচরণ। অনন্ত কন্দলী তাঁর গভীর বিদ্যাবত্তার দরুণ সাহিত্যিক উপাধি পান। কিন্তু জনগণের কাছে ঐনামেই তিনি বিখ্যাত। নর-নারায়ণের সভায় তিনি শংকরদেবের সমসাময়িক ছিলেন, তাঁকে গুরু হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতি স্নেহবশত শংকরদেব ভাগবতপুরাণের দশম স্কন্ধের অর্ধেক অনুবাদের (যা বাকী ছিল) ভার দেন।

অনন্ত কন্দলীর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—মহীরাবণ বধ, হরিহর যুদ্ধ, বৃত্রাসুর বধ,

ভারত-সাবিত্রী, জীবস্তুতি ও কুমার-হরণ কাব্য। কুমার-হরণ কাব্য শংকরদেবের রুক্মিণী হরণের মতো খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কুমার-হরণ কাব্যে অর্‌ফিউস ইউরিপাইডিস বা ল্যান্সলট্‌ ও গুইনিভিয়ারেরই ধাঁচে উষা-অনিরুদ্ধের প্রেমও সুচারু প্রেমকাব্য হিসাবে গড়ে ওঠে। তিনি ভাগবত পুরাণের চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং নবম স্কন্ধেরও পদ্যানুবাদ করেন।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই যুগের আর একজন স্মরণযোগ্য কৃতী লেখক। তিনি নিজেই বলেন যে তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বাস করতেন এবং একজন ভক্ত শাক্ত বলেই বিখ্যাত ছিলেন। এক বিতর্ক আসরে পরাজিত হয়ে তিনি বিষণ্ণ মনে কাশীযাত্রা করেন এবং সেখানে বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী নামে এক শিক্ষকের কাছে পুনরায় হিন্দুশাস্ত্রগুলির পাঠ গ্রহণ করেন। কাশীতেই তিনি পদ্মপুরাণের একটি অংশ পান এবং সেইটিকে অসমীয়া পদ্যে 'স্বর্গখণ্ড রহস্য' নামে প্রকাশ করেন। কাশীতেই তিনি হরির উপাসক হন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে শংকরদেবের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তাঁর শিষ্যত্বে বৃত হন। পরে তিনি গুরু শংকরদেবের জীবনী লেখেন এবং ভাগবত পুরাণ ও ভবিষ্যৎ পুরাণেরও কিছু কিছু অনুবাদ করেন।

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহধর্মিণীও বেশ শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন এবং রাজা নরনারায়ণের সভায় বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যকে বেদ ও শ্রুতিতে ব্যক্ত জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিচারে পরাস্ত করে রাজার প্রশংসা লাভ করেন।

অপর একজন সমসাময়িক কবির নাম উল্লেখ করা উচিত—শ্রীধর কন্দলী, যিনি শংকরদেবের বিশেষ প্রিয় শিষ্য ছিলেন। শংকরদেব বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে কীর্তনঘোষার একটি পরিচ্ছেদ 'ঘুনুচা যাত্রা' লেখবার ভার দেন। কিন্তু তাঁর প্রধান সাহিত্যিক সাফল্যের নিদর্শন একটি অপেক্ষাকৃত অল্প আয়তনের কবিতা 'কান খোয়া' (কান খাওয়া) যেখানে কৃষ্ণ কাহিনী থেকে গৃহীত একটি ছেলে ভোলানোর ছড়ার আমেজ আনে। শিশু কৃষ্ণ একদিন খুব কাঁদছিলেন। মা যশোদা তাঁকে শান্ত করবার ছলে ঐ গল্পটির অবতারণা করেন। কৃষ্ণ ভীত হয়ে মায়ের কোল জুড়ে বসলেন এবং কেবলই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে এই দানবের আকৃতি প্রকৃতি কি রকমের কারণ তাঁর পূর্বতন অবতারের সময় এই দৈত্যের সাক্ষাৎ বা খবর পান নি। মা যশোদাকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে

হয় যে এই ধরনের দৈত্যের কল্পনা তাঁর নিজের এবং কৃষ্ণকে শান্ত করবার জন্য এই গল্প তৈরি করেছিলেন। এখনও পর্যন্ত আসামে দুরন্ত ও কাঁদুনে ছেলে-মেয়েদের শান্ত করার জন্য এই 'কান খোয়া' দৈত্যের গল্প প্রচলিত আছে যে ছোটো ছেলেমেয়েরা বেশি কাঁদলেই সেই রাক্ষসটা এসে তাঁদের কান খেয়ে ফেলবে। এই গল্পের প্রচার এত বেশি যে আজও সন্ধ্যাবেলায় ঘরোয়া বৈঠকে এই সব কাহিনী সুর করে গেয়ে ছেলেমেয়েদের থামানো ও ঘুম পাড়ানো হয়।

অসমীয়াদের বৈষ্ণব আন্দোলন সারাভারত আন্দোলনের অংশবিশেষ এবং অন্যত্র বৈষ্ণবপন্থীরা যে সব শাস্ত্র গ্রন্থ প্রামাণিক বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, আসামের বৈষ্ণবাচার্যগণও সেই সব গ্রন্থকে প্রামাণিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, অসমীয়া বৈষ্ণবরা নিজেদের জন্য নূতন করে কোনো বৈষ্ণবশাস্ত্র বা ধর্ম গড়ে তোলেন নি। তা ছাড়া আসামে বৈষ্ণবধর্মের মূল তত্বই হচ্ছে ভক্তিবাদ ও আত্মসমর্পন এবং সেখানে দার্শনিক তত্ব বা পুঁথিগত বিচার বিশ্লেষণের বেশি স্থান ছিল না। তবুও বৈষ্ণবতত্বের ও চিন্তার মূল কথা পাওয়া যায় শংকর-দেবের 'ভক্তি-রত্নাকর' ও 'ভক্তি প্রদীপ' এই দুইটি গ্রন্থে, যে সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই মন্তব্য করেছি। 'ভক্তি-রত্নাকর' ব্যতীত মাধবদেবের 'নামঘোষা' অসমীয়া বৈষ্ণব দর্শনের একটি স্বীকৃত অন্যতম গ্রন্থ। ভট্টদেবের সংস্কৃত 'ভক্তি-বিবেক', রামচরণ ঠাকুরের 'ভক্তিরত্ন', নরোত্তম ঠাকুরের 'ভক্তি প্রেমাবলী' ও গোপাল মিশ্রের 'ঘোষারত্ন' অসমীয়া বৈষ্ণববাদে এক প্রামাণিক বিশ্লেষণের জন্য স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

বৈষ্ণবীয় অসমীয়া দার্শনিক লেখকদের একটি বিশেষ অবদান এই যে বৈষ্ণববাদীরা গীতার বহু ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও অনুসরণ প্রকাশ করেছেন গদ্যে ও পদ্যে। শংকরদেব ও মাধবদেব গীতার শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন বহু স্থানে, তাঁদের বর্ণিত ভক্তিবাদ মুক্তিবাদ ও পুনর্জন্মবাদের পক্ষে। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ গ্রন্থের মধ্যে গীতার সমস্ত শ্লোক ও তাদের ভাষ্য রচিত হয়নি। এর প্রথম সূত্রপাত করেন ভট্টদেব অসমীয়া গদ্যে শ্রীধর স্বামীর ভাষ্যানুসরণে। পদ্যে গীতার সারাংশ ব্যাখ্যার প্রথম চেষ্টা হয় কামরূপ নিবাসী গোবিন্দ মিশ্রের দ্বারা। তাঁর গীতাভাষ্যে বেশ উঁচু দরের কবিত্বশক্তি এবং অসমীয়া ভাষার ওজস্বী ও সঠিক ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর ভাষা সতেজ, মার্জিত, সুন্দর ও সহজেই মুখস্থ করা যায়।

বৈকুণ্ঠনাথ কবিরত্ন ভাগবত ভট্টাচার্যকে লোকে সাধারণত ভট্টদেব বলেই জানত এবং তিনি ১৫৫৮ থেকে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং 'কথাভাগবত' এবং 'কথাগীতা'র লেখক বলে অনুমান করা হয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভট্টদেবের 'কথাগাথা' পড়ে অভিমত প্রকাশ করেন, "সুদূর ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ভট্টদেবের 'কথাগীতা' অসমীয়া সাহিত্যে অভিনব…এটি অসমীয়া গদ্য সাহিত্যের এক নূতন দিগ্বলয়—এ যুগের এই ধরনের গদ্যরীতি অন্য কোন সাহিত্যে লক্ষিত হয় না, পৃথিবীর ইতিহাসে কেবল ইংলণ্ডে হুকার ও ল্যাটিমারের লেখা ছাড়া।"

ভট্টদেবের গদ্যরীতির আলোচনার পূর্বে দেখা যাক কেন তিনি পদ্যে লেখার সাধারণ ঐতিহ্য ত্যাগ করে গদ্যের পথ ধরলেন। এর প্রধান কারণ, তাঁর জীবনে দামোদরদেবের বিরাট প্রভাব এবং তাঁরই অনুজ্ঞায় ভট্টদেব এইসব শাস্ত্রচর্চা গদ্যে লিপিবদ্ধ করেন যাতে স্ত্রীলোকেরা এর তত্ত্বমূলক গভীর বাণী ও অর্থগুলি সহজে গ্রহণ করতে পারে। ভট্টদেব বহুলাংশে এই বিষয়ে সফলকাম হন। যুগের চরিত্র এবং ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা ও শ্রদ্ধাই তাঁকে চালিত করেছিল। ভট্টদেবের 'কথাভাগবত' ও 'কথাগীতা' গভীরভাবে পাঠ না করেও যে কোনো পাঠক স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে তিনি এইগুলি সাধারণের জন্যেই লিখেছিলেন যাতে তাদের কাছে এই অমৃতবাণী সহজগম্য হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ও আধ্যাত্মিকরসসিঞ্চিত গ্রন্থের অসমীয়াতে প্রকাশ ও ব্যাখ্যা ভারতীয় শাস্ত্র ও দর্শন পরিক্রমার ইতিহাসে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, কেননা তথ্য ও তত্ত্বের এমন সহজ ও সুবিশাল পরিচয় যে কোনো পাঠকের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করতে বাধ্য।

ভট্টদেবের শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য তাঁর লেখনীকে শুধু কৌলিন্য ও সৌষম্য মণ্ডিতই করেনি, তিনি অননুকরণীয় ভাবে অসমীয়া ও সংস্কৃত ভাব ও ভাষার আদান প্রদান ও শব্দচয়নে এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যে গভীর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার সঙ্গে অসমীয়া সাহিত্যে নব নব শব্দ প্রয়োগে একটি নূতন ভঙ্গির স্রষ্টিকর্তা তিনি। সেইজন্য তাঁর ভাষা ও বক্তব্য সমান তালে চলেছে। তিনি অসমীয়া ও সংস্কৃত দুটি ভাষা থেকেই এমন ভাবে শব্দ চয়ন ও ভাবগ্রহণ করেছেন যে আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ করলে তখন মনে হয় যেন এক ধর্মমহাসভার কথকতার মধ্যে আমরা চলেছি এবং সেই দিব্য কথকটি সহজ

সরল সরস ভাবে সেই নিত্যসত্য লীলাতত্ত্বটিকে সালংকারে নানা উপমায় এমন প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে শ্রোতাদের সব বিবাদ বিরোধ দূর হয়, দ্বিধাদ্বন্দ্ব লোপ পায়, অথচ কথাগীতার মাধ্যমে তাদের মনে যে কল্পনার আবহাওয়া ও অবয়ব গড়ে ওঠে তা সাধারণ জনমানসের চিন্তা ও চেতনার পরিপন্থী নয় বা সেই আদর্শগুলিকে ক্ষুণ্ণ করে না।

যদিও ভট্টদেবের বেশিরভাগ লেখাই অনুবাদ তবু তাদের মধ্য দিয়েই তাঁর স্বকীয়তা প্রকাশমান, এর বিশেষ কারণ—লেখকের অননুকরণীয় লেখন ভঙ্গি। একে শুধু একভাষা থেকে আরেক ভাষায় রূপান্তর মনে করলে ভুল হবে, গোত্রান্তর বা রসান্তর ঘটেনি—মূলের রূপরসব্যঞ্জনাকে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন না করে অসমীয়া ভাষায় নব অবদান বললেও অত্যুক্তি হয় না, অনুবাদ অনুকরণ ছাড়াও অনুসরণ—এ যেন 'রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে অমর করহ তুমি'। লেখক এমনি সুচিন্তিত ও সরসভাবে তথ্যগুলিকে, ভাষ্যকারদের টীকাটিপ্পনিগুলিকে আত্মসাৎ করে তাঁর পসরা সাজিয়েছেন এবং সুনির্বাচিত উপমাগুলিকে তুলে ধরেছেন যে তিনি ভাষান্তরেরও এক নূতন রীতির দখিন দুয়ার খুলে দিলেন যা তাঁর মধ্যযুগীয় পূর্বসূরীয়দের অনুবাদকে ম্লান করে দিল।

ভট্টদেবের সংস্কৃত সাহিত্যে এত প্রগাঢ় জ্ঞান ও ব্যাকরণে এত কুশলতা ছিল যে তাঁর উপাধি হয়েছিল ভাগবত ভট্টাচার্য। ভট্টদেবের মূল সংস্কৃত রচনাও আছে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যে সংস্কৃতের মতো পরিণত সাহিত্যের সাহচর্যে আসায় সংস্কৃত শব্দবিন্যাসের ধারা ও অন্যান্য রীতি ধীরে ধীরে অসমীয়াতেও প্রবেশ করে, বিশেষ করে মূল সংস্কৃত থেকে অনূদিত গ্রন্থ সমূহে, সেখানে স্বভাবতই অধিক তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু গ্রন্থকার কোথাও বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠেন নি, কারণ তিনি বুঝতেন কাদের জন্য তিনি লিখছেন, অর্থাৎ শুধু শিক্ষিত পণ্ডিতদের জন্য নয়। তবে ঐসব ধর্মীয় গ্রন্থে মাঝে মাঝে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার তাদের শুধু গুরুগম্ভীরই করত না, মন্ত্র উচ্চারণের মতো এক স্বচ্ছন্দ অনুভূতিরও সৃষ্টি করত। শব্দ গঠন ও চয়নে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিনীতিই মেনে চলতেন। এর ফলে অসমীয়া সাহিত্যেও সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথা পদ্ধতি প্রবেশ করে। এই বিচিত্র মিশ্রণের একটি অপরূপ ফল 'কথাগীতা'। কিন্তু সেখানে আমরা এমন সব শব্দ সম্ভারের এবং সেইগুলির

কিছুটা অপপ্রয়োগ দেখি যা সাধারণ জনমানসে প্রায় দুর্বোধ্যই হয়ে ওঠে এবং জটিলতার সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পদবিন্যাসে ক্রিয়াপদ লুপ্ত হয়েছে বা অন্যত্র অন্য অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে যাতে সুস্পষ্ট মাত্রাজ্ঞান ও কি অর্থে তার ব্যবহার সেই বোধই অস্পষ্ট।

অসমীয়া সাহিত্যে ভট্টদেবের রচনাগুলি এক দিকপরিবর্তনের সূচনা করে। তাঁর দার্শনিক ও দীর্ঘ গাথাগুলি গদ্যে লিখিত হলেও ব্যাকরণ সম্মত কিনা সে দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। তাতে অসমীয়া গদ্য সাহিত্য ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করে, শব্দগঠনে পারিপাট্য ও সার্থক অর্থবহতা এনে দেয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে ধর্মতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেন স্বচ্ছ ও বিচার বিশ্লেষণে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 'কথাগীতা'র গদ্যরীতি, বাক্যালাপ ও বিশেষভাবে তার তর্কপ্রণালী লক্ষ্য করবার বিষয়। তাঁর উত্তরসূরী বৈষ্ণব পন্থী অসমীয়াদের জন্য তিনি এই নূতন রীতি স্থাপন করেন। এই ধরনের গদ্য রচনা পরবর্তী যুগে অসমীয়া চরিতপুঁথি লেখকদের (বিশেষভাবে 'কথা ভাগবত') প্রভাবিত করেছিল এবং তাদের সম্মুখে এক সমুজ্জ্বল আদর্শ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অসমীয়া সাহিত্যে অতি গুরুতর বিষয়—বৈষ্ণবীয় ধর্মপ্রচারের স্ফূরণের সঙ্গে সঙ্গে চরিতপুঁথি লেখার অভ্যাস। এই সূত্রপাত মহাপুরুষ শংকরদেবের পূত-জীবনী লেখার উৎসাহে ও উদ্যমে। ক্রমশ বৈষ্ণব সাধুসন্তগুরুদের জীবনী লেখাও অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এবং ঐসব জীবনীরচয়িতাদের সত্র ও সত্রাধি-কারীরা তা পাঠ করতেও উৎসাহ দিতেন এবং সকলে একত্রে বসে শুনতেন। এই ভাবে 'কথা গুরু চরিতে' শংকরদেব ও মাধবদেবের জীবনের নানা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মাধবদেবই এই রীতি প্রবর্তন করেন এবং প্রতিদিন সশিষ্য সত্রে বসে গুরুর জীবনীকথা পাঠ করতেন। এই ধারা পরেও অন্য বৈষ্ণব মহাজনদের জীবনী লেখাতে অনুসৃত। আজও সত্রে সমবেত প্রার্থনার পর ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্য প্রত্যহ সন্তদের জীবনকথার আলোচনা ও পাঠ হয়। এইটি মাধবদেবই প্রচলন করেন।

জীবনী লেখাকে অভিহিত করা হয়েছে যে এই ধরনের সাহিত্যসৃষ্টি অন্য ধরনের লেখার চেয়ে সমধিক সূক্ষ্ম এবং মানবিক। প্রকৃত কথা এই যে জীবনী লেখককে এক বিগতযুগের মানুষকে তার পারিপার্শ্বিকে সঠিকভাবে পরিস্ফুট করতে হয়। একে শুধু প্রশস্তি বা নিন্দার গাথা বলা যায় না। এটি একটি

মানবিক চেতনা সংযুক্ত শিল্পকলা, যাতে রসিক মনের অন্তরের নিগূঢ় ভাবগুলির দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনাও বিভাসিত হয়। সেইজন্য এই চরিত পুঁথিগুলির মূল্যায়ন আজও হয় এবং পাঠকদের মনকে স্নিগ্ধ করে। অসমীয়া ধর্মসাহিত্যে এর মূল্য তাই এত বেশি।

পূর্বেকার বেশিরভাগ চরিত পুঁথিই পদ্যমিশ্রিত গদ্যে লেখা এবং তাদের সাহিত্যিক মূল্যও খুব উঁচু ধরনের নয়। তবে ঐতিহাসিক তুলাদণ্ডে এর মূল্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রায় সমকালীন তথ্য ও তত্ত্ব নিয়েই তার সাহিত্যিক কৃতিত্ব। রামচরণ ঠাকুর পদ্যে একটি বৃহদাকায় 'শংকর চরিত' লেখেন। মাধবদেবের ভগিনী উর্বশীর পুত্র তিনি। যদিও রামচরণ শংকরদেবের সমসাময়িক তবুও তাঁর বিস্তৃত ও বিরাট লেখায় সত্য ঘটনার সঙ্গে এমন কিছু কথা ও কাহিনী মিশে গেছে যা থেকে নিছক অন্ধ স্তাবকতার আভাস পাওয়া যায়। আবার কিছু কিছু কথা বিকৃত হয়েছে বা সংযোজিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। ভাগবত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কথা ও কাহিনী শংকরদেবের জীবনীর সঙ্গে বিজড়িত হয়েছে। অবশ্য ভক্তরা দাবী করবেন যে সিদ্ধ মহাপুরুষরা অন্তর্লীন ভগবানেরই প্রতিরূপ—ব্রহ্মবিৎরা ব্রহ্মেরই সমতুল (ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি)। সেইজন্য কৃষ্ণে সমর্পিত প্রাণ শংকরদেবের জীবনীও কৃষ্ণের লীলারূপের দোসর। রাম-চরণের পুত্র দৈত্যারি ঠাকুর কিন্তু ভাবলেশহীন নাতিদীর্ঘ শংকর জীবনী লেখেন। এতে তাঁর পিতৃদেবের বহুভাষণের ভ্রান্তি এড়িয়ে তিনি একটি বিশেষ তথ্যমূলক মূল্যায়ন করেছেন এবং এরই সঙ্গে মাধবদেবের জীবনীর একটি তথ্য-মূলক বিবরণও উপস্থাপিত করেছেন। ভূষণদেব, তিনি শংকরদেবের শিষ্য চক্র-পাণির পৌত্র ছিলেন, তখনকার জানা ইতিহাস ও ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করে যতদূর প্রবাদ ও ঐতিহ্যের ধারার মধ্যে সত্য পাওয়া যায় তারই ভিত্তিতে শংকরচরিত রচনা করেন। এ লেখায় তাঁর পূর্বপূর্বসূরীদের সংগৃহীত বহু তথ্যই স্থান পেয়েছে। অবশ্য রামানন্দের আলোচনার মধ্যে তথ্য সংক্রান্ত কিছু কিছু মতভেদও আছে পূর্ব চরিতলেখকদের সঙ্গে। তাঁর লিখিত জীবনীতে গোপাল-দেবের জীবনী সম্বন্ধেও কিছু সংগ্রহ আছে। রামানন্দ নিজে কালসংহতি নামে একটি সম্প্রদায়ের আচার্য ছিলেন। এবং সেইজন্য তাঁর লিখিত জীবনীতে ঐ সম্প্রদায়ের ভাষ্য অনেকটা প্রতিফলিত হয়েছে।

শংকরদেবের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর উপদেশ, শিক্ষাপ্রণালী ও রীতিনীতি

নানাজনে নানাভাবে ব্যাখ্যা, অনুমান ও ভাষ্য করেন, যার ফলে মহাপুরুষীয়া ধর্মের গঠন প্রণালীতে চারটি উপশাখার জন্ম হয়—যেমন ব্রহ্মসংহতি, পুরুষ সংহতি, নিকা সংহতি এবং কাল সংহতি। দামোদর দেব, পুরুষোত্তম ঠাকুর, মথুরাদাস আটা এবং গোপাল আটা এর প্রতিষ্ঠাতা ও হোতা। কালক্রমে এই সব উপদলগুলি মূল কাণ্ড থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বাধীনভাবেই নিজেদের মতামত প্রচার ও শিষ্য সংগ্রহ করতে থাকে এবং বহু বড়ো ও ছোটো সত্র খুলতে থাকে। একটি বিশিষ্ট ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বাধিকারপ্রাপ্ত আচার্যরাই এগুলি পরিচালনা করতেন, তাঁদের বলা হত সত্রাধিকার, মোহান্ত বা ভাগবতী, যাঁরা পুঁথি বা ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করতেন তাঁদের বলা হত 'ভাগবত পাঠক'; যাঁরা শাস্ত্রাদি বা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন তাঁদের নাম ছিল 'শ্রবণী' অর্থাৎ বিশেষভাবে শ্রোতা। তাছাড়া ছিল 'গায়েন বায়েন' যাঁরা সংঘের গায়কবাদকের দল। যাঁরা উপস্থিত উপাসক উপাসিকাদের প্রসাদ বিতরণ করতেন তাঁদের বলা হত 'দেওরী' বা 'বিলনিয়া'। তাছাড়া যিনি বা যাঁরা এইসব দ্রব্য সংগ্রহ, রক্ষা ও তার সুষ্ঠু বিতরণের ভার প্রাপ্ত হতেন, তাঁদের নাম ছিল 'ভাণ্ডারী' বা 'ভরালি'। এ ছাড়া প্রধান সত্রাধিকার বা মঠাধীশের ব্যক্তিগত সেবকের নাম ছিল 'আল-ধারা', যিনি লিখতেন তাঁর নাম ছিল 'লিখক'। তাছাড়া ভক্ত ও শিষ্যের দল—(যারা কাজে, উৎসবে, ব্যসনে, পূজায় পার্বণে বা পারলৌকিক হিতের জন্য এই সব বৈষ্ণব সত্রে যাতায়াত করত পাঠ শুনত ও ক্রিয়াকর্মে যোগদান করত)। প্রতিটি নতুন সত্রেই সেই সত্রের জন্য বিশেষভাবে 'প্রসঙ্গ' লিখিত হত এবং এইভাবে নানাধরনের পৌরাণিক ও মহাপুরুষদের কাহিনী অসমীয়া ভক্তি সাহিত্যে স্থান পায় এবং একটি বিরাট বুরুঞ্জী সাহিত্য শাখা গড়ে ওঠে। মাধবদেবের মহাপ্রয়াণের পর তাঁরই নির্দেশে ভবানীপুরিয়া গোপাল আটা, গোপালদেব নাম গ্রহণ করে মাধবদেব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং উপমা, কাহিনী ও নানা আখ্যান দিয়ে তাঁর বক্তব্য সুচারু ও সুনিষ্ঠভাবে লোক সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করতেন এবং সেই জন্যেই জনসাধারণের কাছে তিনি 'কথাসাগর' নামে পরিচিত ছিলেন। গোপালদেব কামরূপ জেলার কলঝরে একটি সত্র স্থাপন করেন এবং সেখানে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহাবসান ঘটে। রামানন্দ দ্বিজ, রামানন্দ দাস এবং রামগোপাল তাঁর জীবনীকারদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান

অধিকার করে আছেন। সকলেই প্রাচীন ধারা ও ঐতিহ্য অনুযায়ী বর্ণনার পক্ষপাতী।

বৈষ্ণব আন্দোলনের আর একজন মুখ্য হোতা দামোদরদেব (১৪৮৮-১৫৯৮) ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করলেও শংকরদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শংকরদেবের পরলোকপ্রয়াণের পরেই তাঁর সঙ্গে মাধবদেবের মতভেদ হয় এবং তাঁর পরিচালিত শংকরীয়া বৈষ্ণবদল ত্যাগ করেন এবং নিজের একটি সংঘ স্থাপন করেন, যেখানে অন্য হিন্দু দেবদেবীর অর্চনা আচার বিচার প্রচলিত রাখা হয়েছিল। এই জন্যেই দামোদরদেবের ধর্মদলে বহু ব্রাহ্মণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁদের 'দামোদরীয়া' বল হত। দামোদরদেবের সমকালীন, রামরায় দ্বিজ নামে এক শিষ্য ও নীলকণ্ঠ দাস নামে আর এক ভক্ত তাঁদের রচিত 'গুরুলীলা' ও 'দামোদর চরিত'-এ নানা কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, বিশেষ করে দামোদরদেব কর্তৃক সত্র স্থাপনের। এইসব কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য এই যে সমসাময়িক লেখকদের (তিনি ভক্ত বা শিষ্যই হন) বা সাধারণ সমাজের উপর এইরূপ বৈষ্ণব সংঘের কী প্রতিক্রিয়া ঘটত (হয়তো তা অতিরঞ্জিত বা সম্যক বিকৃত নয়) তা জানা যায়। এইটুকু বোঝা যায় যে এক বৈষ্ণবসমাজের মধ্যেই নানা ভাবের তারতম্য ছিল এবং মূল সমাজ ও তার শিক্ষাদীক্ষাকে অগ্রাহ্য না করেও তা সমৃদ্ধ হয়েছে নানা ভাষ্যে, টীকায় ও সদুক্তিকর্ণামৃতে। ধর্মচর্চার পথপ্রদর্শক রূপে তাঁরা বরণীয় ও স্মরণীয়। রামানন্দ তাঁর 'বংশী গোপালদেবের চরিতে' দামোদরদেবকে বংশী গোপালের গুরু বলে অভিধা দিয়েছেন, যাঁকে তিনি পূর্ব আসামে প্রচার কাজের জন্যে পাঠিয়েছিলেন, অবশ্য তাঁর দল ত্যাগের পূর্বে। পূর্ব আসামে বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস জানার জন্য একটি অপরিহার্য গ্রন্থ হল রমাকান্তর 'বনমালীদেব-চরিত'। বনমালীদেব (আ. ১৫৭৬) বংশীগোপালদেবের শিষ্য এবং পূর্ব আসামে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের জন্য দায়ী। তাঁর এই মহৎ কর্তব্যসাধনে তিনি আহোম নৃপতি জয়ধ্বজ সিংহের রাজসাহায্য পান। রমাকান্ত শুধু একজন ভক্তই ছিলেন না, তিনি সমসাময়িক ঘটনাবলীর দিকেও প্রখর দৃষ্টি রাখতেন এবং দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। সেইজন্য তাঁর প্রতিপালক রাজার জীবনের বহু ঘটনাও লিপিবদ্ধ করেছেন যা তৎকালীন অসমীয়া (বিশেষ করে পূর্ব আসামের) সমাজের চিত্র ও আহোম রাজন্যবর্গের রাষ্ট্রব্যবস্থার উপরও আলোকপাত করে। এই প্রসঙ্গে আমরা বৈষ্ণব গুরুদেব ও

সত্রদের সম্পর্ক বিষয়ে নানা মন্তব্য পাই। বিখ্যাত আহোম রাজা রুদ্রসিংহের রাজত্বকালে (১৬৯৭—১৭১৪) গোবিন্দদাস কর্তৃক সংকলিত 'সৎসম্প্রদায় কথা' (যদিও অল্প পরিসরের) আসামে গুরু ও সত্রদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ও তার মানবিক মূল্যবোধ, বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন চর্চার অপেক্ষাও একটি ঐতিহাসিক চেতনার চিত্র বহন করে যার মূল্য অসীম। তাঁর লেখা ছিল ইতিহাসধর্মী, ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ পঙ্ক্তি ও সর্বোপরি সত্যের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা।

এই সব কাব্যে রচিত সন্ত মহাপুরুষদের জীবন আলেখ্য পর্যালোচনায় এই সত্যটিই প্রতিভাত হয় যে এইসব গাথায় শুধু তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রারই সূত্র পাচ্ছি না, যেগুলি ভক্ত শিষ্যদের প্রণতিরসাপ্লুত হতে বাধ্য তবু সেই ঝংকারের মধ্যে দিয়েও উত্তরপুরুষদের কাছে এসেছে সমাজ জীবনের নানা রঙে রঙিন একটি বৃহত্তর আদর্শের ছবি, একটি ধ্যানধারণাবিশ্বাসের উচ্চমার্গের চিত্র। তাই গুরুচরিতগুলি ঐতিহাসিক উপাদানেরও মূল্যবান আকর—শুধু সত্রের বা তদাধীশের বা ভক্তদের খুঁটিনাটি নানা সংবাদ বা পঠনপাঠন শিক্ষার ব্যবস্থার কথা, বিত্তাদানের কথা, সে যুগের সামাজিক পরিবেশে জীবনযাত্রার কথা। এইসব চরিতপুঁথির বিশেষ মূল্য এই যে জনসাধারণের মনে সন্ত মহাপুরুষদের কার্যকলাপ কীর্তিত হয়ে জনগণের মনকে আকৃষ্ট করত। এইজন্য ভট্টদেবের সময় থেকে মননধর্মী জীবনকথার সঙ্গে এই সব চরিতপুঁথির বিশেষ পার্থক্য ছিল। এইগুলি লিখিত হয়েছিল জনসাধারণকে উদ্‌বোধিত করার জন্য। সেইজন্যই এইগুলি লেখা হয়েছে চলতি ধরনের সহজবোধ্য জনসাধারণের কথ্য ভাষায়। কথ্য বা চলতি ভাষাকে তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয় এইটি জানা উচিত। বাক্যসংকলনের রূপ, আত্মনেপদী ও ক্রিয়ারূপ এবং সেই ভাষার শব্দ সম্পদের পরিধি। জে. ভ্যানড্রাইসির মতে "কথ্যভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বক্তব্যপ্রকাশের সঙ্গে চিন্তাধারার সামঞ্জস্য রাখা—তবেই শব্দসম্ভার প্রকৃতভাবে নিয়ন্ত্রিত ও প্রবুদ্ধ হয়। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে কথা বলার ভঙ্গিতে ও বলবার উৎসাহে ও উত্তেজনায় অনেক সময় শব্দ স্বতোৎসারিত বেগে আপনি বেরিয়ে আসে। তখন সেই আবেগের ফলশ্রুতিই কথ্যভাষা। তখন নিয়মানুযায়ী ভাষাগঠনের ক্রিয়াবলী ঐ দৃঢ় ও বলবান আবেগের কাছে পরাজিত হয়"।—তা ছাড়া প্রত্যেক কথ্যভাষার একটি নাটকীয় ভঙ্গি আছে। প্রত্যেকটি চরিতপুঁথিতে কথোপকথনগুলি

এমন ভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, যে সেগুলি একটি বিশেষ ঘটনার প্রতীক ও জীবন্ত প্রকৃতি গ্রহণ করে। কোথাও শব্দবিন্যাস দীর্ঘ, কোথাও হ্রস্ব, যখন যেখানে যেমনি প্রয়োজন তার সঙ্গে ভাবের ও গতির সমতা সার্থক ও সুন্দর হয়। অথচ এই বাক্যবিন্যাসে নানা ধরনের উক্তির প্রয়োজন—কোনটি নির্দেশনার, কোনটি জিজ্ঞাসার বা কোনটি অন্য কোনো ধরনের ভাবকে অবলম্বন করে বাক্যের স্থিতিস্থাপকতার জন্যে। আমাদের দৈনিক কথাবার্তায় বা আলাপ আলোচনায় এই ধরনের নানা সূত্রের মালা গাঁথতে হয়, যাতে একঘেয়েমি কাটে এবং বৈচিত্র্য ফোটে।

ব্যাকরণ-নীতির নিয়মানুগ ব্যবহার দৈনিক কথ্য ভাষায় নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হতে পারে না। অসমীয়া ব্যাকরণানুযায়ী প্রথমে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ অর্থাৎ যে বক্তব্য প্রকাশিতব্য, তারপর অন্যান্য ধারা ও সর্বশেষে ক্রিয়াপদ। কিন্তু একটা অনিয়মানুগ আবেগে বক্তা প্রথমেই ব্যবহার করে যা তার কাছে বিশেষভাবে জনগণের কাছে বোধগম্য করতে হবে। তাছাড়া সঠিক কথার সুষ্ঠু যোজনারও একটা মোহ আছে লিখনভঙ্গিকে আকৃষ্ট করার। যদিও চরিত পুঁথিতে সাহিত্যিক স্ফূর্তি বিকাশের কোনো চেষ্টা নেই, তবু তাদের গদ্যরীতি একেবারে নিরলংকার নয়। তাদের বাক্যবিন্যাসে বহু তুলনামূলক শব্দসম্ভার, বৈচিত্র্য, অনুপ্রাস, পুনরাবৃত্তিতে কার্যকরী হয়ে উঠেছে। পূর্বেই কথিত হয়েছে যে চরিতকথার মৌল উদ্দেশ্য—শুধু ধর্মবিষয়ক সত্য, নিষ্ঠা, বা রাজসভায় তর্কবিচার বা কলহ প্রচার নয়—এগুলির মূলে মহাজনদের দৈনিক জীবনযাত্রার কাহিনী প্রকাশ। সেইজন্য পাঠক-পাঠিকারা বা জনসাধারণ অস্বস্তি বোধ করেন না কারণ এখানে তাঁরা নিজেদেরই সমাজের একজনের জীবন কাহিনী শুনছেন সশ্রদ্ধভাবে—কোনো গুরুগম্ভীর তাত্ত্বিক বা আত্মিক আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ বিচার নয়। সাধারণ তথ্য ও তত্ত্বের উপর একটু নৈর্ব্যক্তিক, ধার্মিক বা দার্শনিক প্রলেপ পড়ে নি যে তা নয় কারণ চরিত পুঁথির কাহিনীগুলি মূলত তত্ত্ব ঘেঁষা হলেও সহজবোধ্য, কারণ যিনি বলেছেন বা লিখেছেন তিনিও যে ভক্তদেরই একজন এবং তাঁর বক্তব্যে একটা বীরপূজা বা গুরুশিষ্য সংবাদের ভক্তিভাব থাকা বিচিত্র নয়, কারণ সেই ভাব ও ভক্তির সঙ্গে গুরুর মাধ্যমে তাঁর মনের সজীব সংযোগ। শুধু ঘটনার রটনা বা দিনপঞ্জি জ্ঞাপনই তো উদ্দেশ্য নয়। তাঁকে দেখাতে হবে যে গুরু কি বস্তু, কিভাবে শিষ্যকে

প্রভাবান্বিত করেন, তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেন, প্রেরণা দেন—যাতে অন্যসকলেও তদ্ভাবভাবিত হতে পারে। এইসব চরিত পুঁথিতে ভক্ত লেখক নিজের সুখ দুঃখ, জীবনে আনন্দ ও অশ্রুর, পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার মধ্য দিয়ে কিভাবে গুরু সান্নিধ্যে শুধু আসেন তা নয়, তাঁর অন্তরঙ্গ প্রসাদ পান, তার বিবরণও দেখি নিষ্ঠায়, সেবায়, বিশ্বাসে ও কৃপায়। এইসব লেখার আর একটি তাৎপর্য এই যে সাধারণ মানুষ কিভাবে এই সব প্রাণবান ভক্তিমান অসমীয়া মহাপুরুষদের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে বদলিয়ে গেল এবং তাঁরাও এই সব জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের প্রতিদিনের সুখ দুঃখ সংস্কারের ভাগী হলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চরিত পুঁথিগুলির বিচার করলে দেখা যায় যে মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গির এক একটি অপ্রতিরোধ্য মন মাতানো ছবি, যেখানে গুরুশিষ্য-শিষ্যাদের একটি আন্তরিক, ঘনিষ্ঠ ও চিত্ততোষক প্রতিবেদন গড়ে উঠেছে।

বিশেভাবে লক্ষ্য করতে হয় যে এইসব পুঁথিতে গুরুশিষ্য-শিষ্যা সংবাদের মধ্যে এমন একটা আত্মার আত্মীয়সুলভ ঘরোয়া ভক্তির পরিবেশ প্রতিফলিত হয়েছে যা অতীব মনোরম ও সহজবোধ্য। এই বিশিষ্ট গুণটি যে শুধু কথ্যভাষায় চরিত কথাগুলি বর্ণিত হয়েছে সেইজন্য নয়, সমস্ত সমাজের আবহাওয়াটাই ছিল একটা আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ত সদিচ্ছা ও ভালোবাসার প্রকাশ। এই তন্ময়তা ও মন্ময়তাই এই রসধারাকে সাধারণগ্রাহ্য শ্রুতিতে পরিণত করেছে ও বহুবন্দিত স্তুতিনন্দিত গুরুকাহিনীগুলিকে স্বর্গ হতে মর্ত্যে নামিয়ে পার্থিব রসে সিঞ্চিত করে সকলের গ্রাহ্যবস্তু করে তুলেছে। অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলি প্রাত্যহিক স্পর্শ পেয়ে সমাজের নিত্য বিলাস বিবর্তে কাব্যে স্থান পায়। ভক্তদের এই উচ্ছ্বাসময় গীতি যেমন তাদের গুরুদেবের সঙ্গে মানসিক মিলন ঘটিয়েছে, তেমনি জনসাধারণের সঙ্গেও, যাঁরা এইসব বাণী পাঠ বা শ্রবণ করে শুধু উপকৃত হন নি, তাদের সার্বজনীন মানবতাবাদের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছেন, যদিও এইসব লেখার মধ্যে শুধু গম্ভীর ভাব বা আধ্যাত্মিক আলোচনা নয়, রঙ্গরস, ঠাট্টা তামাসা ব্যঙ্গ কৌতুক সবই ওতোপ্রোত ভাবে আছে, যা আজকের পাঠকের মনকে মুগ্ধ করে।

আধুনিক মানবচেতনা সংশয়াচ্ছন্ন তাই আজ এর প্রয়োজন অনেক তীব্র বিচার বিশ্লেষণ যথার্থ ধর্মীয় মহাত্মাদের শিক্ষার ফল। ভগবদগীতায় বর্ণিত হয়েছে

যে, যেসব মানুষ সুষ্ঠু বিচার বিশ্লেষণে পারঙ্গম নন তাঁরা শাস্ত্রের বাক্য নিয়েই ব্যস্ত, তার ব্যাখ্যা করেন, তার অন্তরের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যকে ধরতে পারেন না। তাঁদের মন এই পৃথিবীরই কামনা বাসনায় ব্যস্ত এবং তাঁরা স্বর্গের দুয়ারে উপবিষ্ট হয়ে আমি বুভুক্ষু, আমার এই চাই বলে কান্নাকাটি, আবেদন নিবেদন করেন। তাঁরা মনোগ্রাহী করে চমৎকার উপমা বা ভাষা ব্যবহার করতে জানেন, আচার বিচার, হোম-যাগযজ্ঞেরও বিধান দিতে পারেন, কিন্তু তাঁরা আসলে শুধু কর্মফলের প্রভাবে 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা ভবে' এই সত্যই মানেন, আর কিছু জানেন না। এই ধরনের বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন বা সত্যিকারের আধ্যাত্মিক এষণা হারিয়েই তাঁরা চেতনা একাগ্রমুখী করে ভগবদ চিন্তায় মন সমর্পণ করতে অক্ষম।

এইটেই আশ্চর্যের বিষয় যে আজকের দিনের শিক্ষিত ও মনের দিক থেকে উন্নত ও সচেতন মানুষের কাছে এই বিচার বুদ্ধি অনাদৃত। মনস্বী অ্যালডুস্ হাক্সলী বলেন যে মানব জাতির মানস গঠনে নিত্যনূতনের জন্য ক্ষুধা, বৈচিত্র্য বোধ এবং ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরের বিচরণ স্পৃহাই দায়ী—তাঁরা স্থাণু হতে চান না। কিন্তু সাধুসন্তদের মনে এই চিন্তা ও চেতনাই সর্বশেষের রূপ নেয় যে একই সব হয়েছেন এবং সবাই সেই একম্-এর প্রকাশ। এই জাগ্রত ভগবানের উপলব্ধির সত্যতা ও সততাই তাঁদের একমাত্র সম্বল। তাঁদের এই একমুখী অন্যসব কিছুকে 'এহবাহ্য' বলে ত্যাগ করে। তাঁরা "সব সময়েই, সকল অবস্থাতেই স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করে কাজ করে যান, সহিষ্ণুতার সঙ্গে এবং অদমনীয় দান এষণায়"। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে আধুনিক যুগে তাঁদের জীবনচরিত পড়বার আমাদের সময় বা স্পৃহা নেই—অপঠিতই থাকে।

ভারতীয় বিশ্বাস যে মানুষ যতদিন জীবিত থাকে ততদিন তাঁরই মধ্যে অবস্থান করে, তিনি সর্বভূতস্থ, সর্বত্র, সর্বগ এবং মুক্তি এই জীবনেই। এই উক্তি উপনিষদের যুগ থেকেই প্রচলিত। সন্ত কবীর লিখেছেন—এখন যদি তাঁকে পাওয়া যায়, তবে তিনি তখনও দুষ্প্রাপ্য নন, যদি তা না হয়, আমাদের মৃত্যুর নগরেই যেতে হবে—তাই জীবনের মূল্য—মৃত্যুর দুয়ার দিয়ে অমৃতের তীর্থে যাত্রা—মুক্তির পথে। এবং এই মুক্তিই সম্ভব ভক্তির মাধ্যমে, অবতার পুরুষদের কৃপায়। ভক্ত সন্ত বার্নার্ডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বৈষ্ণব সন্ত সাধুও

বলতে পারেন যে ভগবান সাধারণত অপৌরুষের বিদেহী ও দর্শনাতীত ; তাঁকে দেখতে হলে বা পেতে হলে এই দেহের মাধ্যমেই তা সম্ভব—তখনই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা কামভাবনা ছেড়ে তাঁরই প্রীতি ইচ্ছায় পর্যবসতি হয়ে ওঠে। সাধুসন্ত মহাপুরুষদের জীবনী এই স্বর্গীয় প্রেমেরই ছবি বিশ্বাসী পাঠক-পাঠিকার কাছে তুলে ধরে। এই বৈষ্ণবীয় পুনর্জাগরণ সমাজের সব দিকেই এক নব বারতা এনে দিয়েছিল। এই যুগটি বিস্তারের যুগ। যুবক পণ্ডিতের দল বারাণসীতে গমন করে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নগরজীবনের স্বাদ পেত এবং দেশে ফিরে তার প্রচলন করত। সাধারণ মানুষরা তীর্থযাত্রায় যেত ও সাধু মহাত্মাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাদের মানসিক পরিধিও বিস্তৃত হত, কখনো কখনো কবির দল একত্রে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হতেন, অপরপক্ষকে পরাজিত করতে পারলে যেন যুদ্ধ জয় করে আসছেন এমন ভাব দেখাতেন। তাতে একটা বিশেষ সুবিধা ছিল যে এতে রাজানুগ্রহলাভের বিশেষ আশা থাকত। কোচ রাজন্যরা শিল্পকলা ও সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারই একটি নিদর্শন পাওয়া যায় কবি রাম সরস্বতীর একটি ভণিতায়। রাজা নরনারায়ণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—আমার রাজা আমাকে আদেশ করলেন যে অসমীয়া ভাষায় সমগ্র মহাভারতকে অনূদিত করতে হবে। রাজসভায় ঐ সম্পর্কে যা কিছু টীকা ভাষ্য ছিল সবই তিনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে চাইলেন। গাড়ি ভরতি ঐ সব গ্রন্থ ও পুঁথি আমার বাড়িতে প্রেরিত হল এবং আমাকে উৎসাহ দেবার জন্যে আমার সব কিছু অভাব-অনটনের ভার তিনি গ্রহণ করলেন। শুধু অর্থ নয়, বিত্ত নয়, পরিধেয় বস্ত্রাদি, ভৃত্য সব কিছু প্রয়োজনেরই সুব্যবস্থা করে দিলেন।

বিখ্যাত দার্শনিক কার্লাইলের মতে ইতিহাস হচ্ছে মহৎপুরুষদের জীবনের বৃত্তান্ত এবং সত্যিই এই যুগসন্ধিক্ষণের দুই ক্ষণজন্মা পুরুষ হচ্ছেন শংকরদেব ও মাধবদেব এবং এই যুগের ইতিহাসে রঞ্জিত ও বর্ণিত হয়েছে তাঁদের জীবনালেখ্য। যেন আকাশে সূর্য ও চন্দ্রের উদয়। অন্যেরা এই দুই বিরাট পথিকৃৎদের সার্থক অনুচর। তাঁরা যা বলেছেন বা লিখেছেন তারই অনুবৃত্তি করে তাঁরা ঐ যুগ সাহিত্যকে আরও প্রস্ফুট করে তুলেছেন। তাঁদের পরিকল্পনার বিস্তৃতি, ভাবের গাম্ভীর্য, ভাষার সৌকর্য ও মুক্ত পরিধি জনসমাজকে শিক্ষা, স্থৈর্য ও বিষয়ানুরাগের যাথার্থ্যের উপর নির্ভরতাকে নাগরিক মর্যাদায়

উত্তীর্ণ করে। এই যুগের অন্যসব লেখকরা সংস্কৃত ক্লাসিক সাহিত্যেরই অনুবাদী ও অনুকরণকারী। তাঁদের লেখায় পাওয়া যায় দীর্ঘ উচ্ছ্বাস, তর্ক-মূলক ভাবপ্রবণতা, এবং অনেক সময় একটি বিশেষ মতের প্রবর্তনা এবং মাঝে মাঝে একক ও যৌথ গান। গাথা-প্রচারক ও কাব্য প্রণেতাদের মধ্যে সাধারণ জীবনপ্রণালীর ধারাতে, চিন্তাচেতনাতে অর্থাৎ মানবিক তরঙ্গবেগই বেশ প্রতীয়মান। অবশ্য এই মানবিক হাবভাবভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে সীতা, উষা বা বেহুলা প্রভৃতি ঐতিহ্যবহ নামের মধ্য দিয়ে, কিংবা তারা যুগচিত্রও বটে যেখানে নরনারীর মিলন-বিরহ-বার্তাও কল্পনায় উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

ছন্দ, অনুপ্রাস ও লিখন প্রণালীর ক্ষেত্রেও এইসব লেখকরা পুরাতনের নবীকরণত্ব দাবী করতে পারেন। তাঁরা বেশিরভাগই লিখেছেন মিত্রাক্ষর ছন্দে অর্থাৎ মিল করা পদ্যে, যাদের বলা হয় পদ, দুলারি এবং ছবি। প্রত্যেক পরিচ্ছেদই স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং একটি বিশিষ্ট ভাবের চিত্রোদ্ঘাটন করে। পদগুলি চতুর্দশপদী যেখানে অষ্টম পদের একটি যতি থাকে। দুলারি ও ছবি ছয়টি করে বাক্যবিন্যাসের গুচ্ছ। দুলারিতে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম লাইনে (Verse) ছয়টি শব্দ (Syllable) থাকে এবং অন্যগুলিতে আটটি। যখন এইগুলি স্বরে উচ্চারিত হয়, তখন স্বরের দৈর্ঘ্য ও হ্রস্বতায়, শব্দের আধিক্য অনাধিক্য মিল খেয়ে যায়।

যেহেতু এই যুগের কবিরা মধ্যযুগীয়, তাই তাঁদের কাব্যে আমরা পাই শুধু চাকচিক্যময় শব্দচিত্রণ নয়, নানা তুলনামূলক শব্দ ব্যবহার, অনুপ্রাস, ব্যঙ্গ-কৌতুক। এর বেশিরভাগই সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আহরণ করা এবং এতে তাদের পাণ্ডিত্য প্রমাণিত হত। তাদের কাব্যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার এবং প্রকৃতির চিত্রও পাওয়া যায়। এই সব কারণে এই কাব্যগুলি লোক মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিল।

বৈষ্ণব আন্দোলন সাধারণ জনগণের সাংস্কৃতিক রসবোধের মাত্রাকে উন্নীত করেছিল। সাধারণ মানুষের চিত্তে অনালোকিত অনেক কোণ আলোকিত ও উজ্জ্বল হয়েছিল। এটা শুধু ধর্ম প্রচারের প্রভাব নয়, একটা আত্মানুসন্ধান ও আত্মিক উন্নতিরও পরিচয় এবং অসমীয়া জনগণের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবন বৈষ্ণব আন্দোলনের পূত স্পর্শে নূতন নূতন ভাবে চিন্তায় ও চেতনায় সমৃদ্ধতর ও রসায়িত হয়েছিল। সমাজ সচেতনতার বিষয়ে দুটি তথ্য উপস্থাপিত করা

যায়—একটি সত্র স্থাপন ও একদল মঠাশ্রয়ী এবং শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত নিয়মানুগ কর্মসক্ষম কর্মীর উৎপত্তি ও দ্বিতীয়ত নামঘর স্থাপন যেগুলি শিক্ষাসদনের কাজ করত এবং জনগণকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের পরিধিতে যোগদানে উৎসাহিত ও উদ্‌বোধিত করত। সত্রগুলি শুধু ধর্মস্থান ছিল না, স্থায়ী বসবাসকারী ছাত্রদের শিক্ষাক্ষেত্রও বটে। সত্রাধিকারের সহযোগিতায় ও তাঁর সুব্যবস্থায় এই সব শিষ্য, ভক্ত বা জ্ঞানপিপাসুর দল একত্রে থাকবার সুবিধা পেতেন এবং তাঁদের ঐহিক, পারলৌকিক সব দায়িত্বই এই সব সত্রেই বর্তাত। এই সব মঠাধিবাসীরা শুধু বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতেই শিক্ষালাভ করতেন না, তাঁদের বৈদিক ও পৌরাণিক, শ্রুতি ও স্মৃতি গ্রন্থেরও পাঠ নিতে হত। তা ছাড়া সত্রাধিকার ও তাঁর সহকর্মীরা ('ভাগবতী' ও 'পাঠকরা') শিক্ষকতা করতেন এবং এই সব শিষ্যদের নানাভাবে শিক্ষা ও সদুপদেশ দিতেন, তাঁদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তর্ক ও আলোচনায় যোগ দিতেন। তাছাড়া এই সব শিষ্য দ্বারা সংস্কৃত মূল গ্রন্থ ও পুঁথি অসমীয়া অনুবাদ, প্রতিলিপি ও অনুলিপি করতেন ও এই সব ছাত্রদের লিখিত পরীক্ষাও নেওয়া হত। এই ভাবে বহু বৎসর শিক্ষা ও শৃঙ্খলার মধ্যে বাস করে বৈষ্ণব আচার ও ক্রিয়াকর্মে ও শাস্ত্রজ্ঞানে অভ্যস্ত হলে তাদের দেশের দূরদূরান্তরে নানা স্থলে প্রচার কার্যে প্রেরণ করা হত এবং উপযুক্ত সময়ে সত্র প্রতিষ্ঠার জন্যেও। এর ফলে শিক্ষার প্রচার এবং প্রসারও বাড়ত। অসমীয়া সংস্কৃতির উন্নতির ইতিহাসে সত্রগুলির দান কম নয় এবং বহু খ্যাতনামা শিক্ষক শুধু নয়, সুপরিচিত যশস্বী, দার্শনিক পণ্ডিত ও কবির দল সৃষ্ট হয়।

এরাই হল সংস্কৃতির জনাদরের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান। নৃত্যসংগীত মুখর আঙ্কিয়ানাট আজও নামঘরে অভিনীত হয়। এবং গ্রামীণ মানুষ রামায়ণ মহাভারত বা ভাগবতের মানব জীবন ও ধর্মের গভীর সমস্যা সংবাদিত মহৎ কাহিনী দেখতে আসে। বৈষ্ণবেরা বহু নতুন উৎসব অনুষ্ঠান জুড়ে দিয়েছেন—তার ফলে নাট্যাভিনয়ের সুযোগও বেড়ে গেছে, সমস্যা বিদ্ধ মানুষের মনের আনন্দ প্রকাশের সুযোগও বেড়েছে।

নামঘরগুলিও অসমীয়া গ্রামভিত্তিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বিকাশের পথে ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে সবিশেষ সুপরিচিত হয়। এই সব স্থানে শুধু শাস্ত্রগ্রন্থ বা সাহিত্যিক পুস্তকগুলিরই আলোচনা হত না তৎসংক্রান্ত দর্শন ও ধর্মের মৌল প্রশ্নগুলিও বিবেচিত হত, তর্ক বিতর্ক হত

এবং গ্রামীণ লোকেরা নূতন নূতন ভাবের ও উপলব্ধির অনেক কিছু শিক্ষালাভ করত। নামঘরগুলি তখন এবং আজও অপরোক্ষভাবে গ্রামগুলির পঞ্চায়েত সভার বিকল্প হিসাবে কাজ করত এবং এই সব স্থানে শুধু শাস্ত্র পুরাণ মহাপুরুষীয় বাণীর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন বা আলোচনাই হত না—এগুলি গ্রামীণ রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচার ও আলোচনা সভার বৈঠক বাড়িরও কাজ করত। অসমীয়া গ্রাম্যজীবনে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় জীবনের যৌথ সংহতির একটি যোগসূত্রও ছিল।

এই সত্র এবং নামঘরগুলি নাটক গানবাজনার শিক্ষানীড় হিসাবেও ব্যবহৃত হত এবং তাদের সম্প্রসারণের ও বিস্তারেরও সহায়তা করত। সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলা যেতে পারে যে এইগুলি জাতীয় জীবনের সংস্কৃতি ও ধর্মমূলক এক একটি প্রচারকেন্দ্র ছিল। এইখানে গ্রামের লোকেরা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতপুরাণের গাথাগুলি ভক্তিভরে শুনতে আসত। বৈষ্ণববাদীরা এইগুলিকেই অবলম্বন করে নব নব উৎসবের প্রবর্তন করে, যেমন যাত্রা, নাটক, নাটকের অভিনয়।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে বৈষ্ণবীয় জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে সংস্কৃত চর্চার বিশিষ্ট প্রসার জনগণের মানসিক চেতনাকে সমুন্নত করেছিল। এই সংযোগ জাতীয় চিন্তায় একটি পুনর্জাগরণের ধারা নিয়ে এসেছিল যা পূর্বতন যুগে দেখা যায় নি। জাতীয় জীবনে সংস্কৃত ও সেই যুগের ভাবধারা অসমীয়াদের চিন্তা ও চেতনা পুষ্ট, পরিণত ও পরিপক্ক করতে সহায়তা করে, অসমীয়া ভাষাকে নতুন দিগদর্শনের নির্দেশ দেয় এবং একটি কালজয়ী সাহিত্যসৃষ্টির বীজবপনের শক্তি দেয়। এই মহমিলনের ফলে অসমীয়া সাহিত্য ও জাতীয় সমাজ একটা চাকচিক্যময় সংযত সংহত রূপ লাভ করছে—যার ফলে অসমীয়া সাহিত্যের সাগরতীরে বহুর দান নিহিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আহোম ও অসমীয়া সাহিত্য

পূর্বের এক অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি যে অসমীয়া ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে মানবজাতির থাই শাখার বহু গোষ্ঠী ও উপজাতি পূর্ব আসামে শতাব্দীর পর শতাব্দীতে আগমন করে উপনিবিষ্ট হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্থহুং মুং ডিহিংগিয়া রাজা (১৪৯৭-১৫৩৯) চুটিয়া, কাচারী, ভূঁইয়া ও নাগাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। রাজশক্তির আনুকূল্য ছাড়াও এই যুগটির বৈশিষ্ট্য শংকরদেবের বৈষ্ণব আন্দোলন। স্থহুং মুং-এর পরবর্তী স্থলেখংমুং গর্গয় রাজা (১৫৩৯-১৫৫২), স্থখাম্পা খোরা রাজা (১৫৫২-১৬০৩), প্রতাপসিংহ (১৬০৩-১৬৪১), জয়ধ্বজ-সিংহ (১৬৪৮-১৬৬৩) এবং চক্রধ্বজ সিংহ (১৬৬৩-১৬৬৯) প্রভৃতি সকল নৃপতিই প্রভূত প্রতাপশালী ছিলেন এবং সুষ্ঠুভাবে ও দৃপ্ত চিত্তেই রাজ্য-শাসন করতেন। তাঁরা মুঘলদের কয়েকটি অভিযানকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন এবং পূর্বভারতের ইসলামের অগ্রগতিকে রুদ্ধ ও প্রতিহত করেছিলেন। তাঁদের শাসনকালে আসাম বহুদিক থেকেই উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি তাঁদের রাজত্বকালে সুসংযত ও সংহত হয়েছিল। অসমীয়া সাহিত্য ও শিল্প রাজসভায় বিশেষ সমাদর ও মর্যাদা লাভ করত।

১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে টুংখুঙ্গিয়া বংশের গদাধর সিংহ আসামের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হবার পূর্বে তিনি একসময়ে তৎকালীন নৃপতি লোরা রাজার রুদ্রদৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচবার জন্যে পলাতক হন। তাঁর পত্নী কুমারী জয়মতীকুয়ারীকে লোরা রাজা কারারুদ্ধ করেন ও স্বামীর গন্তব্যস্থল ও ঠিকানা জানবার জন্য পীড়ন করেন। সাধ্বী জয়মতী কিছুতেই তা জানাতে সম্মত হন না, এমন কি যখন তাঁর স্বামী স্বয়ং লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে এসে তাঁকে পীড়ন থেকে মুক্তির জন্যে সেই অনুরোধ রক্ষা করতে বলেন তখনও। জয়মতী স্বামীকে সৈন্যসংগ্রহে উৎসাহ দেন এবং লোরা রাজাকে পরাজিত করে সিংহাসন অধিকার করবার পরামর্শ দেন যাতে ঐ দুষ্ট নৃপতির কুশাসন থেকে

দেশের জনগণ স্বস্তি ও শান্তি পায়। জয়মতী শেষপর্যন্ত অত্যাচার ও নিপীড়নে দেহত্যাগ করেন এবং আজ পর্যন্ত তিনি পতিব্রতা সতী সাধ্বী নামে কীর্তিতা। প্রতিবৎসর তাঁর আত্মাহুতির দিবসটি সশ্রদ্ধভাবে পালিত হয় এবং এখনও তাঁর নাম ও স্মৃতি কবিদের নাট্যে ও কাব্যে প্রেরণা জোগায়।

গদাধর সিংহ শক্তিশালী রাজা ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে মুঘলরা আসাম থেকে শেষবারের মতো বিতাড়িত হয়। রাজা কিন্তু নিজে ঘোর শাক্ত ছিলেন এবং বৈষ্ণবপন্থীদের উপর অত্যাচার করতেন। বৈষ্ণব মোহান্তরা তাঁদের শিষ্যদের উপর যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করতেন, সেটাকে তিনি রাষ্ট্রশক্তির শত্রুতা সাধন বলে মনে করতেন এবং ঐ আন্দোলনকে রাজবিরোধী ভীতির অন্যতম কারণ বলেই গণ্য করতেন। গদাধর সিংহ সেইজন্য বৈষ্ণব মোহান্তদের সম্পত্তি কেড়ে নেন, তাঁদের সত্র থেকে তাড়িয়ে দেন এবং বেশ কয়েকজন ঐ মতাবলম্বীকে হতাহত করেন। গদাধর সিংহের পরবর্তী রাজা রুদ্রসিংহ (১৬৯৬-১৭১৪), ঐসব বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি পুনরায় মঠাধীশদের বা তাঁদের উত্তরাধিকারী-দের ফিরিয়ে দেন এবং কয়েকজন রাজানুগ্রহও লাভ করেন। কিন্তু তিনি নিজে শাক্তমতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে তিনি নদীয়া (বঙ্গদেশ) থেকে কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য ন্যায়বাগীশ নামে একজন বিখ্যাত শক্তি সাধক ও পণ্ডিতকে আসামে আমন্ত্রণ করে আনেন এবং তাঁর মৃত্যুশয্যাতেও সেই ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। আহোম অধিপতির ও তাঁর দলের সম্ভ্রান্ত সমাজের এই শাক্তধর্ম গ্রহণ বৈষ্ণব ও শাক্তদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে।

রুদ্রসিংহ একজন কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন পরাক্রান্ত উচ্চাভিলাষী নৃপতি ছিলেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন যে পূর্বদেশীয় হিন্দু রাজাদের সহযোগিতায় মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটা ফলবতী প্রচেষ্টা গড়ে তোলার। রুদ্রসিংহ সাহিত্য ও শিল্পকলার একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি শিল্পী, স্থপতি, গায়ক এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের আসামে আসবার জন্য রাজ-আমন্ত্রণ জানাতেন। রুদ্রসিংহের পরে তাঁর চার পুত্র পরপর রাজত্ব করেন—সেবাসিংহ, প্রমত্তসিংহ, রাজেশ্বর সিংহ ও লক্ষ্মীসিংহ। এর পর রাজপদে বৃত হন লক্ষ্মীসিংহের পুত্র গৌরীনাথ সিংহ (১৭৮০-৯৫) এবং তাঁর পরবর্তী নৃপতি কমলেশ্বর সিংহ (১৭৯৫-১৮১৮)। শিবসিংহ, প্রমত্তসিংহ এবং রাজেশ্বর সিংহের (১৭১৪-১৭৬৯) রাজত্বকালে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল এবং রাজারা শিল্প ও

সাহিত্যচর্চায় ও তার পৃষ্ঠপোষকতায় মন দিতে পেরেছিলেন কিন্তু ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই দেশে অশান্তি, গৃহযুদ্ধ, নানারকম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় এবং শাসনযন্ত্র প্রায় অচল হয়ে পড়ে, যার ফলে এই সব বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য বহির্সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে কমলেশ্বর সিংহের ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত সিংহ রাজপদে অভিষিক্ত হন। তাঁর রাজসভার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সভাসদ প্রধানমন্ত্রী পূর্ণানন্দ বড়গোহাঁইনের উপর নানা কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পদচ্যুত করবার মানসে ব্রহ্মদেশীয় নৃপতির কাছে সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ জানান। ১৮১৭ সালে ব্রহ্মদেশীয়রা আসাম আক্রমণ করেন কিন্তু তাঁরা রাজধানীতে প্রবেশ করবার আগেই পূর্ণানন্দের প্রাণবিয়োগ ঘটে। চন্দ্রকান্ত কিন্তু ১৮১৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং পুরন্দর সিংহ কর্তৃক তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। চন্দ্রকান্ত ১৮২১ সালে সিংহাসন পুনরায় উদ্ধার করেন কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়দের সঙ্গে তাঁর আবার যুদ্ধ বাধে এবং ১৮২২ সালে তিনি বঙ্গদেশে পলায়ন করেন এবং বর্মীরাই আসামের সম্পূর্ণ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সেটা খুব স্বল্পস্থায়ী হয় এবং ১৮২৪ সালে ইংরেজরা আসামে প্রবেশ করে ও বর্মীদের বিতাড়িত করে। পরে ইয়াণ্ডবুর সন্ধিপত্র অনুসারে (১৮২৬) আসাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক অধিকৃত হয়। পুরন্দর সিংহকে ১৮৩৩ সালে উত্তর আসামের করদরাজারূপে স্বীকৃতি দিলেও তিনি নির্দিষ্ট কর দিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁকে পদচ্যুত করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজেই ১৮৩৮ সালে উত্তর আসাম অধিকার করে নেন। এই ভাবে পূর্বভারতে ছয়শো বৎসরের আহোম রাজত্বের স্বর্ণযুগের উপর যবনিকাপাত হয়।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, আহোম শাসনে আসাম একটি দৃঢ় এবং উন্নত রাষ্ট্রতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল, মুসলমান আক্রমণ ও আগ্রাসন প্রতিহত করেছিল ; দেশে মোটামুটি শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। আহোমেরা দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেছিল এবং প্রান্তদেশের আদিবাসী শাসকদেরও। ফলে আসাম একটি দৃঢ় সংবদ্ধ ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে একটি একক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল এবং এর ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাভিত্তিক ঐক্যও গড়ে ওঠে ও সমগ্র ভূখণ্ডে জনগণের মধ্যে একটা একতার ভাবও জেগে ওঠে।

আহোম শাসনের প্রথমদিকে তারা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি লাভ ও নিজেদের শাসক সম্প্রদায় হিসেবে প্রভুত্ব রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল এবং নিজেদের সাধারণ কৃষক জনসমাজের গণ্ডি থেকে দূরে রাখবার প্রয়াস করেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ এই সত্যই প্রতীয়মান হল যে বিজয়ী সুখফার সঙ্গে যে কয়েকজন তাদের নিজের লোক এসেছিল তাদের দ্বারা দেশ শাসন অসম্ভব, সামাজিক সংশ্রবও রাখতে হয়। সেইজন্য মুঘল সম্রাট আকবরের মতো তারা আসামের হিন্দুদের সঙ্গে বিবাহাদি কার্য সম্পাদনে বাধ্য হয় এবং তাদের সমান স্বীকৃতিও দিতে হয়। এইসব নতুন আহোমরা উচ্চরাজপদ ও অন্যান্য অধিকার প্রাপ্ত হয়ে সমগ্র দেশকে ঐক্যবোধে জাগ্রত করবার সুযোগ পায়। শেষ পর্যন্ত আগন্তুক আহোমরা সম্পূর্ণভাবে হিন্দু আচার বিচার, দেবদেবীর মাহাত্ম্য স্বীকার করে হিন্দু সম্প্রদায়ের রক্ষকে পরিণত হয় এবং ইসলামের দুর্বার গতিকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়।

এই সময়কার ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পূর্ণ হবে না যদি আহোম নৃপতিদের হিন্দুধর্মের প্রসারের চেষ্টার কথা লিপিবদ্ধ না করা হয়। রাজা সুদঙ্গফা বাসুনি আনোয়ারএক ব্রাহ্মণবংশে প্রতিপালিত হন। কিন্তু আচার বিচার,
রাজা প্রতাপসিংহের সময়েই হিন্দু প্রভাব আরও বিস্তৃতি লাভ করে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের তিনি বিশেষ সম্মান করতেন কারণ প্রবাদ আছে যে তিনি যখন রাজকুমার, তখন এক অশরীরী অসুর তাঁর দেহাশ্রয় করে এবং ব্রাহ্মণদের শোধন মন্ত্রে তিনি ঐ অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভ করেন। প্রথম আহোম রাজা যিনি হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হন তাঁর নাম জয়ধ্বজ সিংহ এবং তাঁর উত্তরসূরীরা (লোরা রাজ পর্যন্ত) বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয় নেন। গদাধর সিংহ বৈষ্ণবদের উপর প্রসন্ন ছিলেন না এবং শাক্তদেরই অনুগ্রহ বর্ষণ করতেন এবং তাঁর রাজত্বকাল থেকেই শাক্ত পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণরা রাজসভায় প্রাধান্যলাভ করেন এবং এর ফলে শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মধ্যেও ঝগড়া, মনোমালিন্য ও সংঘর্ষ বাধে। শিবসিংহের মহিষী রাণী ফুলেশ্বরী যখন মোয়ামারিয়া দলের বৈষ্ণবদের শক্তি-পূজায় নিমন্ত্রণ করে অপমান করেন, তখন বৈষ্ণবদের মধ্যে আহোম রাজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই ধর্মীয় বিদ্রোহই আহোম শক্তির পতনের অন্যতম কারণ। এই ধরনের আত্মকলহ এবং ধর্মীয় অসংযমের নানা চিহ্নও ঐ যুগের সাহিত্যে চিত্রিত আছে। এও দেখা যায় যে ঐ সময়ে বহু

শাক্ত-দেবদেবীর উদ্দেশ্যে আহোম নৃপতিরা মন্দির নির্মাণ করেছেন এবং এইগুলি শাক্ত সংস্কৃতির পাদপীঠ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এইসব স্থানে শাক্ত মন্ত্রাদি সংস্কৃতে ও অসমীয়ায় নিত্য পাঠ ও আলোচনা হত এবং অসমীয়া সাহিত্যে শাক্ত শাখা বেশ উন্নতি লাভ করে।

এ ছাড়া আহোমদের আর এক কৃতিত্ব যে তারা বিভিন্ন ভাষাভাষী ও নানা আচার-বিচারে বিশ্বাসী জনমতের সঙ্গে একটা সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপন করেন। একথা সত্য যে আহোম নৃপতিরা পূর্বপুরুষদের ধর্মকর্ম সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন নি, তাঁরা হিন্দুধর্মের অনুগামী বলেই পরিচিত হতে চাইতেন এবং তাঁদের জীবনযাত্রাও সেই ধরনেই নিয়ন্ত্রিত হত। তাঁদের রাজ্যাভিষেক-কালে আহোম ও হিন্দু দুই ধরনের ক্রিয়াকলাপ ও আচার পালিত হত। প্রত্যেক রাজা সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে আহোম 'ঋক্ষভান' ব্রত পালন করতেন এবং দুটি নাম গ্রহণ করতেন, একটি অসমীয়া হিন্দু নাম, অপরটি আহোম নাম। আহোম রাজারা ইন্দ্রবংশজাত বলে দাবী করতেন। ক্রমশঃ আহোম ও হিন্দু দেবদেবীরা এক পর্যায়ভুক্ত বলেই স্বীকৃত হত এবং বলা হত যে তাদের ভিতরে যে ভিন্নতা, তা শুধু ভাষার এবং প্রচারের। তাই আমরা দেখি যে 'চাওফা' অর্থাৎ স্বর্গাধিপতি আহোমদের জনক বা 'লেংদান' অর্থাৎ ইন্দ্রের সমকক্ষত্ব লাভ করেছেন। 'জাচিংফা' হয়েছেন সরস্বতী, লুংচাইনেট হয়েছেন বায়ু, কানফা দেবী, খুনটুন—সূর্য, খুনবান—চন্দ্র এবং লাউথে—বিশ্বকর্মা।

ধর্ম আচরণে ও ক্রিয়াকলাপে ক্রমশঃ একটা ঐক্য বোধ এসে যায়। তাঁরা হিন্দুশাস্ত্রাদিকে পবিত্র মনে করতেন এবং ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব মোহান্তদের শ্রদ্ধা করতেন, তাছাড়া মঠ, মন্দির, সত্র রক্ষার জন্য রাজকীয় অর্থেরও ব্যবস্থা ছিল। সেই সঙ্গে অহমীয়া পুরোহিতদের তাঁরা ছাড়েননি এবং তাঁরা নিজেদের আচার অনুযায়ী বিবাহ শ্রাদ্ধ বা রাজ্যাভিষেকে যোগদানে আহ্বান পেত। এই সম্মিলিত অসমীয়া সংস্কৃতির বিন্যাসই তাঁদের ভাষায় এবং সাহিত্যে প্রতি-ফলিত। আহোমদের নিজস্ব ভাষা তিব্বতীয়-ব্রহ্ম কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু অসমীয়া আর্যগোষ্ঠীর আহোম রাজারা প্রথমে আহোম ভাষাকেই রাজসভার ও সংস্কৃতির ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং বুরুঞ্জী বা রাজসভার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য দলিলপত্রাদি সেই ভাষাতেই লিখিত হত। কিন্তু এই বিধি পালনে নানা অসুবিধা ছিল কারণ বেশির ভাগ প্রজাদেরই

রাজকীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল না। এর ফলে সরকারী কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ যেমন ভূমিদানপত্র অসমীয়া ও আহোম দুই ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করবার প্রয়োজন হত। পরে এই দ্বিভাষিক প্রথা পরিত্যক্ত হয় এবং অসমীয়া ভাষাই সম্পূর্ণভাবে রাজকার্যের বাহন হয়। আহোমভাষী জনগণ অসমীয়াভাষীদের সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত হয়। তবু আহোম শব্দ ও কথ্যভাষার কিছুটা রীতি অসমীয়া ভাষায় সহজেই প্রবেশ করে এবং আহোম চিন্তা ও চেতনার ধারাও অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে, যার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন অসমীয়া বুরুঞ্জী ও তার লিখন প্রণালী ও ধরন ধারণ।

এই সময়কার আহোম ইতিহাসের একটি সুস্পষ্ট ঘটনা ক্রমাগত মুসলিম আক্রমণ। এর একটি সুফল—অসমীয়া জাতীয় জীবনে সংহতি। এর পূর্বে আসামে কোনোরকম সংহত জাতীয় চেতনা ছিল না। এই মুসলিম বিজয় ভীতি সবরকম বিভেদ বা দলাদলি ও জাতীয় জীবনের অন্য ছিদ্রগুলিকে দূর করে দিয়েছিল। কোচ, কাচারী, আহোম, অসমীয়া—সকলেই এক শক্তি-মান রাজার অধীনে সংযত ও সংহত হয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ, বিভিন্ন জাতীয়তা বোধ বিসর্জন দিয়ে একটি মৌল অসমীয়া চেতনায় জাগ্রত হবার চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে একটি ঘন সন্নিবিষ্ট অসমীয়া চেতনার জাগৃতি সম্ভবপর হয়। এই চেতনাই কালে অসমীয়া সংস্কৃতির জনকরূপে পুষ্টি লাভ করে। এক একটি মৌল অসমীয়া ভাব চেতনার দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা এখানে। দেশের জন্য মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে পুরুষ বা স্ত্রী যারা প্রাণ দিয়েছিল, তারা দেশের সম্মান রক্ষার জন্যই এই উৎসর্গ করেছে এবং এই ধরনের আক্রমণে যে সর্বসাধারণের বিপদ, এই বোধ জাগে। এদের বীরত্বের, বীর্যের শৌর্যের গাথা আজও অসমীয়া জনসাধারণের, স্ত্রী ও পুরুষের মনে প্রেরণা জোগায়। আহোম অনুপ্রবেশের সময় শুধু রাষ্ট্রিক অবস্থাই জলের ন্যায় তরল ছিল না, সামাজিক অবস্থাও সমানভাবে বিশৃঙ্খল ভঙ্গুর ছিল। সুসংযত চেষ্টা ও কর্মের চেয়ে লোকে জাদুবিদ্যায় ও অলৌকিক ক্ষমতা বা ঝাড়ফুঁক তুকতাকে বিশ্বাস করত। মুসলিম আক্রমণ পুনরায় জনসাধারণকে রণদামামায় আহ্বান করে শৌর্যবীর্যের পরীক্ষায় এবং আত্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে জাতীয় জীবনকে স্বাদেশিক পটভূমিতে সুগঠিত করবার চেষ্টা করল এবং অলস পরমুখাপেক্ষিতা, দৈবানুগ্রহ এবং অনর্থক আলোচনা থেকে মুক্তি দিল।

মুঘল অভিযানের আর একটি সুফল হল এই যে আসাম পুনরায় ভারতের অন্য প্রদেশের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পেল, যেটি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই ছিন্ন হয়ে যায়। এই সব মুসলিম অভিযানের ফলে আসামে চিত্রকলা ও সংগীতের উপরও বেশ কিছু প্রভাব পড়ে। সুফীবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আসামের জিকির ও জারি গানও বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে। পীর ও ফকিরেরা এ বিষয়ে পথিকৃৎ এবং এইভাবে বহু ফারসী ও আরবী শব্দ অসমীয়া সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করে।

আহোমরা তাঁদের রাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে যেমন আগ্রহী ছিলেন তেমনি অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিলতা থেকে মুক্ত রাখবার জন্যেও নানা ভাবে সুরক্ষিত করবার চেষ্টার ত্রুটি তাঁদের ছিল না। তাঁরা যোগাযোগের ও যাতায়াতের জন্যে প্রশস্ত পথ নির্মাণ করিয়ে দেন, গ্রামগুলির সংস্কার করেন ও সেখানকার কৃষক সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবনকে নূতনভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। যোগাযোগের উন্নত সুব্যবস্থা দেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধির এক প্রচণ্ড সহায়ক। এর ফলে দূরের মানুষ কাছে এসে যায়, জাতীয় চেতনার প্রসার ঘটে, প্রভাব বাড়ে এবং অসমীয়া ভাষার মাধ্যমে এক ঐক্যের সূত্র গঠিত হয়। এর দ্বারা সামাজিক ও বাণিজ্যিক মিলন আরও প্রসারিত হয়ে অসমীয়া সংস্কৃতির একটি মহামিলনের সেতু রচনা করে। এছাড়াও বহু ছোটো ও বড়ো নগর স্থাপনেও অসমীয়াদের কৃতিত্ব একটি নাগরিক সভ্যতার সূচনা করে—নরগাঁও, রংপুর, জোরহাট, গৌহাটি এবং অন্যত্র যে সব জনপদ সৃষ্ট হয়, সেখানে একটি নাগরিক পরিশীলনের উদ্ভব হয়—ভাবভঙ্গিতে, আচারে আচরণে, পরিচ্ছদে বেশে এবং জীবনযাপনের প্রণালীতে। এই নব নগর-সভ্যতার আমেজ তাদের গ্রামীণ সমাজের পুরাতনী পরিবেশ থেকে বিচ্যুত করে, কর্মবিমুখতা ও রক্ষণশীলতা থেকে উদ্ধার করে নূতনতর ও ভিন্নতর জীবন-যাত্রার আস্বাদ দেয়। এই নাগরিক সমাজের অসমীয়া সম্ভ্রান্তদল, যারা অল্প আয়াসেই বহু ধনের অধিকারী হয়েছিল তারা যদিও আয়তনে খুব ক্ষুদ্র ছিল তবু প্রাচীন গ্রামীণ সমাজকে এমনভাবে জড়িয়ে দিয়েছিল যে তারা তাদের বৈষয়িক ব্যাপারেও নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং ক্ষুদ্র সমাজ ও সম্প্রদায় গোষ্ঠীর বাইরে বৃহত্তর যোগ স্থাপন করতে উৎসুক হয়ে ওঠে —বিশেষ করে, শিল্পকলা, সাহিত্য, সংগীত এইসব বিষয়ে এবং ধর্ম নিরপেক্ষ

সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। রাজারা, মন্ত্রীরা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কবি ও কলাকুশলীদের জমি দান করতেন। কবিরা ও অন্য শিল্পীরাও তাঁদের পৃষ্ঠপোষক প্রভুদের গুণকীর্তন করতেন। একথা সত্য যে এই ধরনের কবিতায় বা প্রশস্তিতে একটু অত্যুক্তি বা অসংগতি থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু অতিরিক্তভাবে নিজ নিজ পৃষ্ঠপোষক প্রভুদের জয়গান বা প্রশংসা বাচন অতিরিক্ত হলেই কটু ও বেসুরো হয়ে পড়ে, যেমন রামমিত্রের, কবিরাজ চক্রবর্তীর, রুচিনাথ কন্দলীর, বিদ্যাচন্দ্র কবিশেখরের যাঁরা সকলেই আহোম নৃপতিদের আশ্রিত কবিকুল ছিলেন। এইসব প্রশস্তিবাচক বাণীগুলি নানা ভঙ্গিতে বিরচিত এবং নিজ নিজ পৃষ্ঠপোষক প্রভুদের গুণকীর্তনে এমনি অত্যুক্তিপরায়ণ যে পড়লেই মনে হয় এগুলি স্বতঃপ্রণোদিত রচনা নয়।

তাছাড়া আহোম রাজসভা জাঁকজমকপূর্ণ ছিল এবং এই পরিবেশে কবি সাহিত্যিকরা নিজেদের ভারসাম্য হারিয়ে প্রগল্ভ হয়ে সহজভাবে নিজেদের ভাবপ্রকাশে সমর্থ হতেন না—কৃত্রিমতার আভাস পাওয়া যেত। বৈষ্ণবযুগের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসংযম ভেসে গিয়ে অবদমিত কামনার ও বিত্তৈষণাকে জাগিয়ে তুলেছিল। স্বভাবতই সাহিত্যে তার প্রতিফলন হয়েছে। আহোম সভাকবিরা নানারকম কামোদ্দীপক চিত্র এঁকে রাজা, রানী ও সম্ভ্রান্তদের মনোরঞ্জন করতেন। তাঁরা পূর্বযুগের দমিত আশা আকাঙ্ক্ষার কামনা ভাবনার কবি সাহিত্যিক। রাজসভা ছিল প্রেমের কথা ও কাহিনীর মুখ্য বিনোদন নাট্যশালা। রাজা ও রাণীরাও ভক্তিরসের অপেক্ষা প্রেমরসেরই পিয়াসী এবং সেই ধরনের গল্প শুনতেই ভালোবাসতেন। সেইজন্য সভাকবিরাও তাঁদের প্রভু ও প্রভুপত্নীদের মনোরঞ্জনের জন্য সেই মতো পুরাণ থেকে প্রেমের কাহিনী অসমীয়া ভাষায় অবতারণা করতেন। কারণ পুরাণ হল প্রেম-আখ্যানের খনিস্বরূপ। বৈষ্ণবযুগ ও আহোমযুগের মধ্যে সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গির মুখ্য বিভেদ ছিল যে বৈষ্ণব কবিরা দেবদেবীদের নিয়েই কাহিনী রচনা করতেন, আহোম কবিরা মানুষের প্রেম, স্বপ্ন, মান অভিমানকে পশরা করে কাব্যজগতে উদিত হন। সাহিত্য এখানে স্বর্গীয় আদর্শের সুরে ঝংকৃত বা অনুরণিত নয়, এটি তাপদগ্ধ সংসারের কামনা বাসনার প্রতিলিপি বা প্রতিচ্ছবি। আদর্শবাদ থেকে সাহিত্যের দ্রুত অপসারণ একটি নব পদক্ষেপ। এইযুগের প্রেমকাব্যে সাধারণ মানব মানবীর প্রসঙ্গই কবিদের অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আহোমদের পৃষ্ঠপোষকতায় অসমীয়া সাহিত্য

এই সময়ে পুরাণগুলির অনুবাদ ও পুরাণ বর্ণিত কাহিনীগুলির অবলম্বনে নানা কাব্য লেখার একটা জোয়ার আসে। এই পুরাণ অনুবাদের ফলে শুধু যে রাজা ও প্রজাদের মধ্যে প্রাচীন পুরাণ বা এক মহৎ পবিত্র কাহিনীর প্রচার অথবা বহু প্রেমোপন্যাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটল তাই নয়, একটি ন্যায় বা নীতির সংহিতা যা আহোম রাজাদের ছিল না অথচ শাসনকার্য চালাবার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল তাও পাওয়া গেল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাগবত মিশ্র (বা রঘুনাথ মিশ্র নামেও পরিচিত) বিষ্ণু-পুরাণ অনুবাদ করেন। তিনি পদ্যাকারে সংবত তন্ত্রও অনুবাদ করেন। পরশুরাম দ্বিজ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৮৩৬) বিষ্ণুপুরাণের আর একটি পূর্ণ মূলানুগ অনুবাদ করেন। যদিও রচয়িতা বৈষ্ণব কবিদের ভাষা ও বলবার ভঙ্গিকে অনুসরণ করেছিলেন, তবুও মোটের উপর তাঁর রচনায় কোনো সাহিত্যিক শিল্পবোধ বা রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। আহোম নৃপতি রাজেশ্বর সিংহের (১৭৫১-১৭৬৯) রাজত্বকালে কবিশেখর বিদ্যাচন্দ্র ভট্টাচার্য 'হরিবংশে'র 'বিষ্ণুপর্ব' অসমীয়ায় অনুবাদ করেন। এই কাব্যে কৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলা, গোপদের সঙ্গে গোকুলে ও বৃন্দাবনে বাস ও অন্যান্য সব কীর্তি-কাহিনীর কথা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষ বিষয় হচ্ছে যে এই গ্রন্থে রাধাকে কৃষ্ণের উপপত্নীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। মূল সংস্কৃত সংস্করণে, অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণের বিংশ অধ্যায়ে বৃন্দাবনে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের রাসলীলার উল্লেখ থাকলেও রাধার নামোল্লেখ নেই। অসমীয়া কবি রাসলীলার বর্ণনার অধ্যায়ে রাধাকৃষ্ণের প্রথম দর্শনেই প্রেমের কথা এবং বিরহব্যথার বর্ণনা দিয়েছেন। রাধাকে কৃষ্ণের অনুগতা প্রেয়সী বলেই সাহিত্যে প্রতিফলনের রীতি বোধহয় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেই প্রথম। এই গ্রন্থটি সমসাময়িক আহোম রাজসভায় বেশ জনপ্রিয় ছিল।

রাজা শিবসিংহ (১৭১৪-১৭৪৪) ও রাণী প্রথমেশ্বরীর যুক্ত উদ্যোগে ব্রহ্ম-

বৈবর্তপুরাণ সভাকবি কবিরাজ চক্রবর্তী কর্তৃক অনূদিত হয়। কিন্তু কবিরাজ চক্রবর্তীর অনুবাদও পূর্ণ অনুবাদ নয়, কবি শুধু কৃষ্ণের বাল্যলীলা নিয়েই তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর রাসলীলার বর্ণনা যদিও কামোদ্দীপকভাবে রচিত তবু পড়তে আনন্দ হয়।

কবিরাজ চক্রবর্তী বা রামনারায়ণ চক্রবর্তী এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি পরপর কয়েকজন আহোম নৃপতির সভাকবি ছিলেন। তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক অবদান—শঙ্খাসুর বধ, গীতগোবিন্দ এবং শকুন্তলা কাব্য। শঙ্খাসুর বধের উপাখ্যান ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ড থেকে গৃহীত। শঙ্খাসুর বধ কাব্য তুলসীর জন্মকথা দিয়েই আরম্ভ ও তারপর দৈত্যরাজ শঙ্খাসুরেরর সঙ্গে তার বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা ও নানা কাহিনী মণ্ডিত। কৃষ্ণ কর্তৃক তুলসীর উপর অবৈধ সম্ভোগ, শঙ্খাসুরের সঙ্গে মহাদেবের যুদ্ধ এবং তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ও পরে শঙ্খে পরিণতি চিত্তাকর্ষক ভাবেই বর্ণিত। কবিরাজ চক্রবর্তীর গীতগোবিন্দ জয়দেবের অনুকরণে প্রচলিত ষটপদী ছন্দেই লিখিত এবং মূলের গীত ও উক্তির অনুকরণে লিপিবদ্ধ। সেইজন্য এর কাব্যশ্রীতে মূলের চরিত্র-গুলির ভাবাবেগ গতিবেগ বা দ্যোতনা নেই।

'ক্রিয়া-যোগ-সার' (পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ড-এর পরিশিষ্ট)-এর অন্তর্গত মাধব-সুলোচনার উপাখ্যানও কবিরাজ চক্রবর্তীর অনুবাদকর্ম বলে মনে করা হয়। গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নানের সুফল কী—তা এই কাহিনীতে বর্ণিত।

একটি কথা স্মরণ করা কর্তব্য যে দারং জেলার কোচ রাজা কুমার হয়নারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সম্পূর্ণ অনুবাদ হয়েছিল। ১৭১৭ শকাব্দে এই বৃহৎ কাজটির ভার গ্রহণ করেন চারজন কবি—রতিকান্ত দ্বিজ, নন্দেশ্বর দ্বিজ, নরোত্তম দ্বিজ ও খড়্গেশ্বর দ্বিজ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে চণ্ডী উপাখ্যানের সর্বপ্রথম অনুবাদক রুচিনাথ কন্দলী। এই পুস্তকটির রচনা রাজা রাজ্যেশ্বর সিংহের রাজত্বকাল (১৭৪৯—?) এবং তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় কিন্তু রুচিনাথ কালিকাপুরাণ, বামনপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে কিছু কিছু আখ্যায়িকা সংগ্রহ করে মূল মার্কণ্ডেয় পুরাণের কথিকার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। আর একটি পুরাণ—'কল্কিপুরাণ'ও—রুচিনাথ কন্দলীর রচিত বলে প্রচলিত।

রাজা শিবসিংহ ও তাঁর সহধর্মিণী অম্বিকাদেবী কবিচন্দ্র দ্বিজকে ধর্মপুরাণ অনুবাদ করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেন। ধর্মপুরাণ একটি বৃহদাকার গ্রন্থ

এবং সেখানে মানবজাতির অবশ্য কর্তব্য ধর্ম ও নীতিবাচক কর্মগুলির তালিকা ও ব্যাখ্যা আছে এবং কিভাবে সেগুলি সম্পাদিত করা সম্ভব তার নির্দেশও নিরূপিত আছে। এর সঙ্গে সঙ্গে কবি একটি একটি কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন পরিপূরক ভাবে, যার দরুন সাহিত্যিক উজ্জীবনও ঘটেছে। এইসব পৌরাণিক কথা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে অসমীয়া জনসাধারণের চিত্ত হরণ করেছেন তিনি, যেমন গঙ্গার উদ্ভব, অন্ধকাসুর ও শিবের যুদ্ধ, রুদ্র-বিনতার কলহ, গরুড় কর্তৃক অমৃত অপহরণ ইত্যাদি।

এইসব অসমীয়া পুরাণ কাহিনীগুলি মূল সংস্কৃত কাহিনীগুলির অনুপ্রেরণায় লিখিত হলেও এবং বেশির ভাগ আখ্যানই মূলের ছায়ায় রচিত হলেও অসমীয়া সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে লিখিত ও সেইজন্য দেশজ কাহিনীও তার মধ্যে ফুটে উঠেছে—দেশের মাটির রং সেখানে প্রতিফলিত। এগুলি নিছক অনুবাদ বা অনুকরণ নয়। ফলে দার্শনিক তথ্য-তত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক বিচার-বিশ্লেষণাদি বাদ দিলেও এইগুলি ভক্তিমূলক রসাত্মক বাক্যের কাব্য হিসাবেই গৃহীত যেখানে গানের ধারা ধাবমানা, জনগণমনও মুগ্ধ ও তৃপ্ত। পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি এইভাবে হাস্যরস, ভক্তিরস ও বীররসে সিঞ্চিত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। এইসব সাহিত্য কর্মে খুব উচ্চমানের সাহিত্যিক কৃতিত্বের লক্ষণ না থাকলেও গ্রামে গ্রামান্তরে এই সব কাব্যের জনপ্রিয়তা প্রচুর ছিল এবং ভক্ত শ্রোতা ও শ্রোত্রীদের কণ্ঠে কণ্ঠে এর অংশবিশেষ আজও শোনা যায়—তাঁরা এগুলি মুখস্থ ও আবৃত্তি করেন। রচয়িতারা সাহিত্যের ভাবমূর্তির কারুশিল্পটির যত না নিবিড় সাধক ছিলেন তার চেয়েও জনপ্রিয় পদাবলী রচনা করেই খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

এই যুগে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানবস্তু নিয়ে খুব কম গ্রন্থই লিখিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে একজন কবি রামায়ণী কথা লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন—তিনি রঘুনাথ মহান্ত। রঘুনাথ গদ্যে রামায়ণের সারাংশ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর গদ্য লেখা পাঠেই দেখা যায় যে তাঁর রচনায় বুরুঞ্জীর বেশ প্রভাব পড়েছে এবং তার চেয়েও বেশি বৈষ্ণবদের চরিত পুঁথিগুলির। কবি হিসাবে রঘুনাথের দুটি দীর্ঘ বর্ণনাত্মক কাব্য হচ্ছে অবধূত রামায়ণ এবং শত্রুঞ্জয়। দুটিই মুখে মুখে শোনা রামায়ণের কাহিনীর ভিত্তিতে লেখা।

কবির নিজের কথায় অবধূত রামায়ণ মার্কণ্ডেয় পুরাণের ভিত্তিতে লিখিত। সীতার পাতাল প্রবেশের আখ্যায়িকা এবং রামের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদই এই কাব্যের উপাদান। রামকর্তৃক নির্বাসিতা সীতা পাতালে বিদ্যাবিলাসিনীপুরে গমন করেন কিন্তু তাঁর মনে একেবারেই শান্তি ছিল না। তিনি পতিপরিত্যাজ্যা এবং তুই সন্তান লবকুশের জননী হয়েও কেউই তাঁর কাছে নেই। এই বিচ্ছেদ বেদনা তাঁর মনকে রাতদিন কশাঘাত করত। অযোধ্যাতেও রাম তাঁর প্রিয়তমার জন্যে অত্যন্ত মানসিক পীড়া অনুভব করতেন। তাঁর কষ্ট আরও গভীর। কারণ তাঁরই দোষারোপে সীতা, মাতা ধরিত্রীর আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং তিনিই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে তাঁকে তাঁর বক্ষে তুলে নিয়েছিলেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন, আশ্বস্ত করেছিলেন। সীতা সর্পরাজ বাসুকিকে লব ও কুশকে অযোধ্যা থেকে সরিয়ে আনতে অনুরোধ করেছিলেন। বাসুকিও সে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তা সফল হয়নি, কারণ হনুমান, নীল, নল, বিভীষণাদি অজেয় বীরদের ব্যূহ ভেদ করে পুত্রদের নিয়ে আসা সম্ভব নয়। সীতার সেই কথা বোধগম্য হয়েছিল এবং বাসুকির জাদুবিদ্যা প্রয়োগে সেটা সম্ভব কি না বাসুকিকে সে চেষ্টাও করতে অনুরোধ করেন। বাসুকি ব্রাহ্মণের বেশে রামের কাছে আসেন এবং লবকুশকে রণবিদ্যা শেখাবেন এই অছিলায় পাতালে নিয়ে এসে তাদের পরে বুঝিয়ে বলেন যে বিদ্যাবিলাসিনীপুরে তাঁদের মায়ের কাছে নিয়ে যাবেন। এইভাবে বাসুকি তাঁদের নিয়ে পাতালে ফিরে আসেন এবং মাতাপুত্রদের চরম আনন্দোৎসবের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দেন।

বাসুকির এই বিশ্বাসঘাতকতা রামকে অত্যন্ত কোপান্বিত করে তোলে এবং তিনি তাঁর সভাসদদের আদেশ দেন যে যেখান থেকেই হোক, লবকুশকে ফিরিয়ে আনা চাই। সকলেই অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা ফলবতী হয় না। শেষ পর্যন্ত এই কাজের ভার ন্যস্ত হয় হনুমানের উপর। তিনি জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং নানা সূক্ষ্ম উপায়ও জানতেন। তিনি পাতালরাজ্য আক্রমণ করেন এবং এই সর্পরাজ্যের বহু ভীষণদর্শন অমিত-বিক্রমশালী বীরের সঙ্গে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেন ও সর্পরাজকে বিধ্বস্ত করেন। পরে সীতা ও পুত্রদ্বয়কে রামের কাছে ফিরিয়ে আনেন। স্বভাবতই এই পুনর্মিলনে রামের আনন্দের সীমা ছিল না। সীতা রামকে প্রণাম করলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে একত্রে বাস তাঁর ভাগ্যে নেই—সেই জন্য তাঁকে পুনর্গ্রহণের

জন্যে অনুরোধ করাতে বিরত রইলেন, তবে তিনি কথা দিলেন যে প্রত্যহ তিনি রাম, লবকুশ ও হনুমানকে দর্শন দেবেন। তারপর তিনি পুনরায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'শত্রুঞ্জয়' কাব্যটি রামকাহিনীর আর একটি ছোটো আখ্যায়িকার পূরক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। রচয়িতার ইচ্ছা ছিল যে সর্বজনপরিচিত রামচরিত্রকে কেন্দ্র করে রামের গল্পের চেয়ে বেশি বালী ও হনুমানের যুদ্ধের বীরত্বের বর্ণনার আখ্যান প্রাধান্য লাভ করুক। গ্রন্থের প্রথমাংশেই এইসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পগুলি কৌতুকবহ এবং কবির নিজের কল্পনার উপরই প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমান অসংগত নয়। আমরা তার সারাংশ নিবেদন করছি।

কবি প্রথমেই বিষ্ণুস্মরণে ও চরণে স্তুতি নিবেদন করেছেন। এই ধরায় যখই অমঙ্গলের ছায়া ঘনীভূত হয় তখনই তাঁর আবির্ভাবের প্রয়োজন হয় ধর্ম সংস্থাপনার জন্য। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য ভগবান যুগে যুগে নানারূপে অবতীর্ণ হন এবং অন্যায়, পাপ, অবিচার ধ্বংস করে ন্যায়, সত্য ও ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। কাব্যের আখ্যায়িকা অগস্ত্য পুরাণের অনুকরণে এবং বাল্মীকি ও ভরদ্বাজের কথোপকথনের মধ্যে আমরা পাই কেন দেবতারা বানররূপ ধারণ করেছিলেন।

মেরু পর্বতের মণিবতীপুরে দেবসভায় পিতামহ ব্রহ্মা একদিন সভাপতিত্ব করছিলেন; সেই সভায় স্বকন্যা মেরুরাজ সুমেরু উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সুন্দরী বিদ্যাধরীদের নৃত্যগীতাদি উপভোগ করছিলেন। সুমেরু-কন্যা সুলোচনা ছিলেন পরমা রূপসী এবং তাঁর নৃত্যই সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য হয়েছিল। সকলেই তাঁকে বিবাহ করতে আগ্রহী হন, কিন্তু দেবমণ্ডলীর অন্যতম প্রধান দেবতা বায়ুদেব তাঁর পিতাকে স্ব ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং সেই সঙ্গে দূত মারফত সুলোচনাকেও একটি পত্র পাঠান। সুমেরু পত্রপাঠ প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন। দূত হতভম্ব হয়ে বায়ুদেবতাকে স্মরণ করলেন এবং তাঁকে কিছু মৃদুমন্দ অনিল প্রেরণ করতে বললেন। সেই বাত্যাদূতই সুলোচনার কাছে বায়ুদেবতার প্রণয়পত্র নিয়ে গেল। সুলোচনাও এই হাস্যকর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। এতে বায়ুদেবতা কুপিত হয়ে সুমেরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। দেববৃন্দ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ভীত হয়ে ব্রহ্মার শরণ নিলেন এবং তাঁকে অনুরোধ জানালেন যে তিনি যেন কোনোরকমে এই বিরোধটি মিটিয়ে দেন। ব্রহ্মা নারদকে দূত

হিসেবে সুমেরুর কাছে প্রেরণ করলে তিনি একটা মীমাংসার ব্যবস্থা করলেন। সুমেরুর বিহঙ্গ শৃঙ্গটি বায়ুকে প্রদান করলেন, যেটি বায়ুর প্রতাপে উত্তোলিত হয়ে ক্ষীরসাগরের ত্রিকূট পর্বতে পতিত হয়েছিল। যখন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা এটি দেখতে পেলেন, তখন তিনি সেখানে একটি সুন্দর শহর খোদিত করলেন— নাম স্বর্ণলঙ্কা। এইখানে মালি, সুমালি ও মাল্যবান নামে তিন রাক্ষসভ্রাতা বাস করতেন। বিষ্ণু চক্র দিয়ে মালির শিরচ্ছেদ করেন এবং সুমালি ও মাল্যবান প্রাণভয়ে পলায়ন করে।

তারপর লঙ্কাধিপরূপে কুবেরের আবির্ভাব দেখি মঞ্চে। একদিন সুমালি দেখলেন কুবের সিংহাসনে আসীন। রাক্ষসদের দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং লঙ্কা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা হল। তিনি তাঁর কন্যা নৈকেশীর সঙ্গে কুবেরের পিতা বিশ্রভার বিবাহ দিয়েছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল বিশ্রভা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করবেন। নৈকেশী কিন্তু তাঁর অশুদ্ধা অর্থাৎ রজস্বলা অবস্থায় গর্ভবতী হন এবং লোকমতানুসারে বিশ্বাস করতেন যে তাঁর সন্তান ক্রুর ও কুচক্রী হবে। গর্ভাবস্থার সময় নানা অশুভলক্ষণও পরিলক্ষিত হয়। স্বর্গে ও মর্ত্যে সকলেই ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই কারণে নৈকেশী একশো বছর ধরে ঐ গর্ভ ধারণ করেন। কিন্তু তাতেও জনগণের ভীতির উপশম হয় না। দেবতারা পিতামহ ব্রহ্মার কাছে তাঁদের এই বিপদের কথা নিবেদন করেন এবং ব্রহ্মা স্বীকার করেন যে বিপদ সত্য ও শীঘ্রই সংঘটিত হবে। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন যে বিষ্ণুর দুই দ্বারপাল জয় ও বিজয় দিতির গর্ভে জন্ম নিয়েও লক্ষ্মীর অভিসম্পাতে নৈকেশীর গর্ভে ভ্রূণদ্বয় সঞ্চারিত হয়েছে। ব্রহ্মা একথাও বললেন যে তারা ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর দুঃখ ও কষ্টের সীমা থাকবে না এবং একমাত্র ভগবান বিষ্ণুই এর প্রতিকার করতে পারেন। ব্রহ্মা তখন গভীর ধ্যান মগ্ন হলেন এবং তাঁর (বিষ্ণুর) অশরীরী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। বিষ্ণুর নির্দেশ এল শব্দতরঙ্গে যে শীঘ্রই তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন এই অশুভ বিনাশের জন্যে। দেবগণের প্রতিও আদেশ হল যে তাঁরা যেন বানর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাকে বলা হল যে তাঁকে ভল্লুক দেহ ধারণ করতে হবে, বায়ু হবেন কেশরী বানর, ইন্দু কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালী এবং অন্য সব দেবগণ বানর রূপে অবতীর্ণ হবেন। কতকগুলি দেবতার উপর আদেশ হল যে তাঁদের দুর্বৃত্তরূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে, তারা দস্যুবৃত্তি করবে,

লুঠতরাজ করবে এবং রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে কৈলাসপ্রান্তে পৌছবেন যেখানে মহাদেবের শিষ্য নন্দী তাঁদের কিষ্কিন্ধ্যা আক্রমণ করতে প্ররোচিত করবে, কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালী তাদের জয় করবেন।

ভগবানের নির্দেশ ব্রহ্মা যা শুনলেন, দেবগণের কাছে তা প্রকাশ করলেন এবং তাঁরা সকলে ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে পৃথ্বীধামে জন্ম নিলেন। বালী ধরিত্রী জয়ে বেরিয়েছেন। তাঁর অভিযান পথে তিনি একজায়গায় দেখলেন যে একটি তরুণ বানর একটি দীর্ঘ আমগাছের ফল সংগ্রহের জন্য লোষ্ট্র নিক্ষেপ করছে। বালী কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখলেন যে এই কিশোর বানর শুধু বয়সোপযোগী সামর্থ্যবান নয়, বেশ শক্তিশালী ও বলবান ও তাকে উপেক্ষা করা যায় না। তিনি তাঁর এক মন্ত্রীর সাহায্যে তাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করবার প্রস্তাব দিলেন। বালী এমনভাব দেখালেন—যেন তাঁর নিজের ঔরসজাত পুত্র নেই। ঐ কিশোর সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বালীর পালকপুত্র রূপে গৃহীত হল। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে সে কার সন্তান, সে বলল —কেশরীর সন্তান সে, তার মাতার নাম অঞ্জনা ও নিজের নাম হনুমন্ত। তার জন্মের অব্যবহিত পরেই লোকালোক পর্বত আরোহণ করে এবং সেখানে একটি বৃহদাকার হস্তী দেখতে পায়। সে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করবার লোভ সংবরণ করতে পারেনি, কিন্তু ঐ অতিকায় হস্তীও তার ভারে পীড়িত হয়ে যন্ত্রণায় প্রায় অচৈতন্য হবার উপক্রম করলে এবং ঐ হাতির দেহের লোমশ আর কর্কশ ঘর্ষণে কিশোর বানর ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়লে সে হস্তী পৃষ্ঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে আঙুল উত্তোলন করে করীবরকে যুদ্ধে আহ্বান করে। হস্তীটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তার নিজের জীবনের ভয়ে পলায়ন করে এবং এইভাবে হনুমন্ত আটটি হস্তীকে পরাজিত করে। কিন্তু হনুমন্তের এই কাজ তার পিতার মনোনীত হয় না; কারণ তাঁর মতে হনুমন্ত যে আটটি হাতিকে মর্দন করেন তারা সবাই ভগবানের অবতার এবং তাদের পৃষ্ঠে এই বসুন্ধরা স্থাপিতা। হনুমন্ত বিনীত ভাবে উত্তর দেন যে সারা ধরিত্রীকেই ভগবান পৃষ্ঠে ধারণ করে আছেন। এবং সেইজন্য হনুমন্তকে তার কৃতকর্মের জন্য দোষারোপ সংগত নয়। তা ছাড়া এই সারা বিশ্বই ঈশাবাস্য ও তিনি সর্বত্রই বিরাজিত—প্রতিটি প্রাণীর আত্মাই সেই পরমাত্মার অংশ। অতএব তিনি বা যে কেহ যা করেন তা সবই ভগবানের নির্দেশ। তাঁর পিতা যে কাজ তাঁকে করতে বলবেন তিনি তাই সন্তুষ্ট চিত্তে

করবেন। কেশরী হনুমন্তের বাক্য শুনে বিচলিত হলেন। তাঁর পুত্রের বক্তব্য অনুসারে তাঁকে অতিথি সেবার ভার দিলেন এবং বিশেষ করে তদ্‌গত চিত্ত হয়ে রামানুচর হবার জন্য ও তাঁর পরিচর্যা করবার ভার প্রাপ্ত হলেন।

বালী হনুমন্তের কাহিনী শুনে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেছিলেন এবং তাঁকে তাঁর পরাক্রান্ত সৈন্যদলের সেনাপতি পদে বরণ করেন। এখানেই আসল গল্পের সূত্রপাত। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে আমরা হনুমন্তের নানা বীরত্বের কাহিনী শুনি, নানা ঘটনা বৈচিত্র্যের মাধ্যমে বালীর বানর রাজ্যের সীমানা হনুমন্তের শৌর্য বীর্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও বালীর সার্বভৌম আধিপত্যে সাহায্য করে।

ধরণীর পুত্র রাক্ষস রাজা ভৌমিকে তিনি আক্রমণ করেন। ভৌম পাতালের রাজা ধনঞ্জয়ের সাহায্য পান এবং বহু নাগ সৈন তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করেন। কঙ্কন নামে তাঁর একজন বিশিষ্ট যুদ্ধ বিশারদ সেনাপতি ছিলেন। এই বানর-নাগ মিতালি একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। কারণ ত্রিদিব থেকে একটি বিদেহী সংবাদ এসেছিল যে যতদিন ধনঞ্জয় নাগের 'সারঙ্গধনু' ও 'নারায়ণী অস্ত্র' হাতে থাকবে ততদিন তিনি অজেয়। হনুমন্ত তখন ভগবান শ্রীরামের শরণাপন্ন হন ও তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করেন। স্বর্গ থেকে তখন একটি সুবর্ণরথ কতকগুলি অপরাজেয় অস্ত্রসম্ভার সহ মর্ত্যধামে আসে এবং হনুমন্তকে তুলে নেয় এবং একটি দুর্ধর্ষ ও ভীষণ যুদ্ধের পর হনুমন্ত জয়ী হন। এইভাবে হনুমন্ত ভৌমের সাহায্য-কারী সকল কুখ্যাত নাগরাজদের পরাজিত করেন। এই সংবাদ ভৌম রাজার কাছে পৌছানো মাত্র তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন এবং মঙ্গল গ্রহাধিপতিকে অনুরোধ জানান যে তিনি তাঁর পক্ষ নিয়ে হনুমন্তের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। মঙ্গল সহাস্যে তাঁকে এই বলে বিদায় দিলেন যে সামান্য একজন বানরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া তাঁর কাজ নয়। এই সময় হনুমন্ত কর্তৃক পরাজিত একজন নাগ বংশীয় রাজা সেখানে উপস্থিত হন এবং বলেন যে হনুমন্তের বীরবিক্রম অতুলনীয় এবং যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর মতো পারদর্শী কেউ নেই। তিনি তাঁকে যুদ্ধ থেকে বিরত হবারই পরামর্শ দিলেন।

ইতিমধ্যে গজকেতু হনুমন্তকে শাকদ্বীপে যে যাত্রায় যাবার জন্য উৎসাহিত করেন হনুমন্ত তাঁর সৈন্যদের যোগপথে সেখানে যাবার আদেশ দেন। তারা ঈশান পর্বতে নামে এবং সেখানে অতিসুন্দর বানর দলের সাক্ষাৎ পায়। তারা

জানতে পারে যে নল রাজা তাদের অধিপতি এবং তারা গন্ধর্ব চিত্ররথের সাক্ষাৎ বংশধর। হনুমন্ত তখন শতবলী ও দ্বিবিধসহ নল রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের জয়যাত্রার বিবরণ দেন। নল বলেন তিনি রামের অত্যন্ত অনুগত ভক্ত। এতে হনুমন্তের আনন্দের সীমা থাকে না এবং তাঁরা সত্যকার সখ্য স্থাপন করেন। হনুমন্ত তখন প্রশ্ন করেন শাকদ্বীপের কোন কোন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে হবে। নল তাঁর জ্ঞাতব্য সব সংবাদই হনুমন্তকে জানান। নলের মতো বিজয়ী বীরের সহযোগিতায় ও সাহচর্যে হনুমন্ত তখন শাকদ্বীপের সব নৃপতিকে পরাজিত করেন ও তাঁদের সার্বভৌমত্ব লুপ্ত করেন। বেশিরভাগ রাজন্যবর্গই রামভক্ত ছিলেন এবং সেই জন্য এই বিজয়যাত্রা শুধু আনন্দদায়ক নয়, সহজও হয়।

তারপরে হনুমন্ত বৈমানিক নামক এক দ্বীপে গমন করলেন। ঐ দেশের লোকেরা বিমানে যাতায়াত করত এবং রুদ্রবাহু নামে এক রাজা তথায় রাজত্ব করতেন। বৈমানিক পার হয়ে হনুমন্ত শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্মভূমি পুষ্কলিনী নগরীতে পৌঁছিয়ে তাঁর পিতামাতাকে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ লাভ করেন এবং তাঁরা তাঁর বিজয় অভিযানের কাহিনীর ও কথার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জিজ্ঞাসা করলেন এবং হনুমন্ত তাঁদের সমস্ত বিষয় অবগত করালেন। এখন তিনি সমস্ত বিজিত রাজন্যদের বালীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু লোকালোক পর্বতের বানর রাজারা তখনও পর্যন্ত পরাজিত হন নি। তা ছাড়া বালীর ইচ্ছা যে হনুমন্তর পিতামাতার সঙ্গে আলাপ করবেন ও তাঁদের সাহচর্য লাভ করবেন। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যেই দেবর্ষি নারদের আবির্ভাব হল এবং তিনি হনুমন্তকে তাঁর বিজয় অভিযানের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বললেন যে তিনি যেন লোকালোক পর্বতের বানরদের আক্রমণ না করেন, কারণ বিশ্ববিধান হচ্ছে যে রাম শীঘ্রই অবতীর্ণ হবেন এবং তাদের জয় করবেন। তারপর নারদ হনুমন্তকে ও তাঁর পিতামাতাকে বালীর রাজসভায় যাবার পরামর্শ দিলেন। হনুমন্ত স্বীকৃতি দিলেন এবং তাঁর মাতা অঞ্জনাকে অনুরোধ করলেন যে তিনি যেন সুষেণের দুই কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, যাতে তারা যোগ্যতার সঙ্গে সুযোগ্য রাজরানী হয়ে উঠতে পারে। এই সব কাজ সেরে হনুমন্ত ও তাঁর পিতা বালীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং বলাই বাহুল্য যে বালী অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে তাঁদের গ্রহণ করলেন। হনুমন্ত প্রস্তাব করলেন যে

করেন। রাজ্ঞী, রাজকুমারী ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলাদের কামশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানাবার জন্য ঐ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের নিযুক্ত করা হত। কামশাস্ত্র যে জনগণের মনে বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বহু মন্ত্রপুঁথি রচনা এবং প্রণয় পরিণাম যে কতরূপ নিতে পারে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় সংকলিত গ্রন্থ রচনা। এই সব মন্ত্রপুঁথিতে নানাধরনের প্রেমের ব্যাখ্যা, তার গতি রতি ও পরিণাম, তার ধরন ধারণ, ইঙ্গিত প্রভৃতি ভঙ্গি অঙ্কিত হত এবং কিভাবে নরনারীর মধ্যে প্রেমবিবর্ধিত করা যায়, স্ত্রীলোককে কামাসক্তা করা যায়, তাদের সৌন্দর্য, অঙ্গসৌষ্ঠব ও রতিশক্তি বাড়তে পারে তারও যথাযথ আলোচনা আছে এবং উপায় ও বিবাহের নির্দেশ আছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই যুগে নতুনভাবে ঐতিহাসিক তথ্য-পরিবেশনের একটা বিশেষ প্রয়াস হয়েছিল।

জনপ্রিয় কবিরা পূর্ববর্তীযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতেন। 'বরফুকনের গীত' একটি ঐতিহাসিক কাব্যসংহিতা যেখানে গৌহাটিতে অবস্থিত আহোমরাজার প্রতিনিধি বদনচন্দ্র বরফুকন তলে তলে ব্রহ্মদেশীয়দের সঙ্গে চুক্তি করেন যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, পূর্ণানন্দ বরগোঁহাইকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে অপসারিত করতে হবে। এই পদ্যগাথাটি ঐতিহাসিক স্মৃতি ছাড়াও সাহিত্যরসে ঐশ্বর্য-বান। এর নাটকীয়ভঙ্গি, বর্ণনাত্মক গুণ চমৎকার, চরিত্রচিত্রণ এবং সচল ব্যঙ্গকৌতুক, রসাত্মক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বরফুকনের গীত' ছাড়া 'বখরবরর' এবং 'পদমকুমারী গীত' এই যুগের তুইটি অতি জনপ্রিয় পদাবলী।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই যুগের সাহিত্য বিকাশে আরও কয়েকটি জনপ্রিয় নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে অনেকগুলি পুরাণ, হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র থেকে গৃহীত। কবিরা অবশ্য লোককাব্য ও বিশেষ করে লোক সাহিত্যে, যাতে ভূতপ্রেত দৈত্যদানবপিশাচপিশাচীর গল্প থেকে অনুপ্রেরণা পেত এবং কল্পনাকে বল্গাহীন ভাবে চালিয়ে দিত। দ্বিজগোস্বামীর কাব্য শাস্ত্র একটি পদাবলীর পুঁথি, যেখানে হিতোপদেশ থেকে বহু গল্প নতুন ভাবে সংকলিত হয়েছে এবং তার নীতির সূত্রগুলি ছন্দে গ্রথিত হয়েছে। হিতোপদেশের আর একটি অসমীয়া ভাষ্যে দেখি রামমিশ্র নামে এক কবি আহোম সেনাপতি ভদ্র সেন গোঁহাই ফুকনের অনুরোধে সংকলন করেছেন।

১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে আর একজন গল্পলেখক কবিরাজ মিশ্রের

নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন একজন ভবঘুরে কবি, যিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পদব্রজে ঘুরে বেড়াতেন এবং গান গেয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর লিখিত 'শিয়াল গোঁসাই' নামক পদাবলী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

গল্পটির বিষয়বস্তু এই যে শিয়াল গোঁসাই নামে কথিত পুরুষটি জন্মকাল থেকেই একটি শৃগাল-মা কর্তৃক তার শাবকদের সঙ্গে লালিতপালিত এবং তাদেরই বৃত্তি অবলম্বন করে—অর্থাৎ রাত্রে চিৎকার করে এবং মানুষ দেখামাত্র পালিয়ে যায়। বিমাতা কুন্দলতার চক্রান্তে, গর্ভধারিণী মাতা চন্দ্রতারার চোখ বেঁধে তার প্রসবকালে তাকে এক কেতকী গাছের নিচে ফেলে রাখা হয়। পিতা ধর্মদেব যিনি দ্বাদশ ভূঁইয়াদের বংশজাত, তখন তীর্থযাত্রায় গমন করেছিলেন। তিনি তীর্থ ভ্রমণান্তে দেশে ফিরলে নবজাতকের কী হল তার অনুসন্ধান করেন। কুন্দলতা বলল যে চন্দ্রলতার কোনো সন্তান জন্মায়নি এবং অন্য সকলে যারা কুন্দলতার কাছে বহু উৎকোচ লাভ করেছিল, তারা সে কথা সমর্থন করে। ফলে তাঁর অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ রইল না। কিন্তু একদিন স্নান করতে যাবার সময় ঘাটের কাছে দেখলেন যে একটি শিশু, তাঁকে দেখামাত্রই ত্রস্তপদে গর্তে প্রবেশ করল। তখন তাঁর সন্দেহ হওয়ায় তিনি 'দাই' অর্থাৎ ধাত্রীদের অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন যে চন্দ্রতারা একটি পুত্রসন্তানই প্রসব করেছিলেন। তার পরদিন তিনি ঐ শৃগালের গর্ত খনন করিয়ে সেই মানবশিশু, শৃগাল-মা ও তার অন্য সন্তানদের গৃহে আনেন। পুত্রটি বড়ো হলে তার নাম দেওয়া হয় শিয়াল গোঁসাই।

সভাসদেরা প্রেমঘটিত গল্প ও রম্যরচনাই বেশি লিখতেন। পুরাণাদি ও লোককথাই তাদের লেখার উপকরণ জোগাত। কবিরাজ চক্রবর্তী যিনি রুদ্রসিংহ ও শিবসিংহ দুই নৃপতির রাজত্বকালেই সভাকবি ছিলেন, তিনি সুপরিচিত শকুন্তলা উপাখ্যানকে ভিত্তি করে শকুন্তলা কাব্য লেখেন, কিন্তু তার প্রেমবৈচিত্র্যকে আরও রসোত্তীর্ণ করার জন্য চন্দ্রকেতু ও কামকলার গল্পটিও যোগ করে দেন। এই কাহিনীতে রাজা চন্দ্রকেতু স্বপ্নে ভদ্রাবতীরাজের সুন্দরী রাজকন্যাকে দেখে মুগ্ধ হন ও তার প্রেমে পড়েন। রাজা একটি পারাবতকে দূত রূপে ঘটকালির জন্য প্রেরণ করেন এবং তার সাহায্যে কামকলার পাণি গ্রহণে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁদের বিবাহিত যৌথ জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয় নি।

একদিন রাজা ও রানী অরণ্যবিহারে শিকারে যান। রাজা একটি মৃগের পিছনে ধাবমান হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেন। কামকলা শোকে অভিভূত হয়ে তখনি অগ্নিতে প্রাণ দিতে উদ্যত হলে উর্ধ্বলোক থেকে একটি বাণী শোনা যায় যে এক বৎসরের মধ্যেই রাজা ও রানীর পুনর্মিলন হবে। এই একটি বৎসরের বর্ণনায় কবি 'বারমাস্যা'র মতো ঋতুপর্যায়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং সেগুলি বিরহবিধুরা কামকলার কণ্ঠনিঃসৃত। এক বৎসর পরে বসন্তসমাগমে প্রেমিক-যুগলের পুনর্মিলন হয়। কবিরাজ চক্রবর্তী ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে গৃহীত 'তুলসী চরিত' বা শঙ্খাসুর বধ কাব্যেও প্রেমকথা পরিবেশন করেছেন—যেমন শঙ্খাসুরের সঙ্গে তুলসীর বিবাহ এবং স্বয়ং নারায়ণ কর্তৃক তুলসী সংসর্গ। দীন দ্বিজবর 'পদ্মপুরাণে'র 'ক্রিয়া যোগসারে'র অধ্যায়ে বর্ণিত 'মাধব-সুলোচনা' নামক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক প্রেমঘটিত গল্পটি অসমীয়ায় অনুবাদ করেন। কিন্তু কামোদ্দীপক ভাষায়, বর্ণনার চাতুর্যে, রচয়িতা এই গাথাটিকে প্রেমকথার ভক্তিরসোদ্দীপক উচ্চস্থান থেকে সাধারণ মানব-মানবীর কাম পিপাসা লাভালাভের মধ্যে টেনে এনেছেন।

কোনো কোনো কবি নতুনভাবে প্রেমদৃশ্যের অবতারণা করেছেন, যেমন রামদ্বিজের মৃগাবতী চরিত। এটি সুফীরীতি অনুসারে লিখিত এবং কুতবান নামে এক কবির ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে লেখার ছায়ায় অনুপ্রাণিত। এ ছাড়া দেখা যায় যে কবি জৈসীর 'পদমাবৎ' ও জৈন কবি মালাধারিন্ দেবপ্রভার 'মৃগাবতী চরিতে'র সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। এইসবগুলিই 'উদয়ন' গল্প গোষ্ঠীভুক্ত।

অসমীয়া মৃগাবৎ চরিত-এর গল্পাংশ এইরূপ—কুন্তিল নগরের রাজকুমার একদিন দেখতে পেলেন যে একটি হ্রদে চারজন অপ্সরা স্নানে রত এবং দেখা মাত্রই সবচেয়ে যে কনিষ্ঠা তার প্রেমে পড়ে গেলেন। অপ্সরীরা উড়ে চলে গেল কিন্তু রাজকুমারের বিরহব্যথার কোনো উপশম হয় না। সৌভাগ্যক্রমে যখন তারা পুনরায় স্নান করতে এল তখন রাজকুমার সর্বকনিষ্ঠাকে ধরে ফেললেন এবং তার সঙ্গে কিছুদিন মনের সুখে বাস করলেন। একদিন যখন রাজকুমার সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তখন ঐ অপ্সরী পালিয়ে যায়। সে কিন্তু তার গন্তব্যস্থলটির নাম পরিচারিকার কাছে বলে যায়। রাজকুমার প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন যে তাঁর প্রিয়া নেই এবং তৎক্ষণাৎ তার অনুসন্ধানে যাত্রা করলেন। তাঁর যাত্রাপথের বহু স্থানে তাঁকে নানা বিপদের মধ্যে পড়তে হয় এবং তিনি

জাদুবিদ্যার প্রভাবে সব বিপদ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত রুকেম নগরে উপস্থিত হন। ঐ নগরীর নাম ঐ অপ্সরীই বলেছিল যে তার সহচরীরা সেখানে বাস করে। তারা এখন নানা হাস্যকৌতুক, পরিহাসের মধ্যে তাদের সর্বকনিষ্ঠার সঙ্গে রাজকুমারের বিবাহবাসর সুসম্পন্ন করল। এইখানে কবি এই দম্পতিকে কেন্দ্র করে নরনারীর নানারূপ কামক্রীড়া ও মিলনের পন্থার দৃশ্য নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করবার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। মৃগাবতীর সমতুল্য 'মধুমতী' নামক আর একটি বৃহৎ কাব্য রচনা করেন স্থফী কবি মনঝন্। তার একটি অসমীয়া কাব্যরূপ পাওয়া যায়, কিন্তু লেখকের নাম জানা যায় না। একটি প্রসঙ্গ এখানে স্পষ্ট করে উল্লিখিত করা উচিত যে অসমীয়া কাব্যে প্রকৃত স্থফী আদর্শ রক্ষিত হয় নি। স্থফী কবিদের উদ্দেশ্য ছিল যে মানবিক প্রেম ঐশ্বরিক প্রেমেরই এক পর্যায়, তারই প্রতিচ্ছবি বা প্রতীক। কিন্তু অসমীয়া কবিরা তাঁদের কাব্যে পাত্রপাত্রীদের মানবিক ভালোবাসার জন্য দেহজ কাম কামনা বিরহ মিলনের মাধ্যমে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাকেই প্রবল করে তুলেছেন এবং নরনারীর প্রণয়লীলার ও কামকলার বহু গুপ্ত রহস্য ও সংকেতকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করেছেন।

সংস্কৃতে লিখিত বহু লোকায়ত শাস্ত্রও সাধারণ বিদ্যার প্রসারের জন্য অনূদিত হয়। সেগুলি সমাজজীবনের নানা কাহিনী ও ঘটনা দ্বারা বিস্তৃতভাবে বিবৃত। এই ধরনের বহু অনুবাদ হয় রাজানুগ্রহে। আয়ুর্বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, গণিত, নৃত্য, গৃহনির্মাণ শিল্প সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলিকে এই তালিকাভুক্ত করা যায়। এতে সমাজে সাধারণভাবে জ্ঞাতব্য বিষয়ক বিদ্যার প্রসার ঘটে। অভিজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইসব চারু ও কারুবিদ্যার প্রচলন করেন। সেইজন্য এটা স্বাভাবিক যে সংস্কৃত ভাষা অসমীয়া ভাষার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, কারণ তখনও পর্যন্ত কতকগুলি তদ্‌ভব শব্দ বা চলতি দেশীয় শব্দের শুধু উৎপত্তিই হয়নি তা নয়, তাদের উপযুক্ত ব্যবহারেরও কোনো সুনির্দিষ্ট বিধি প্রচলিত ছিল না। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানবিস্তারের জন্য সংস্কৃত ভাষাচর্চা একরকম অপরিহার্য ছিল এবং অসমীয়া ভাষায় গদ্য সম্পদ বৃদ্ধি করবার প্রয়োজনে সংস্কৃতের স্বীকৃতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করা উচিত যে অসমীয়ায় যদিও তৎসম বাক্যগুলির ঋণ অসীম, তবু লেখকরা গদ্যরীতিতে যেসব বাক্য-চয়ন বা গঠন বা ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁদের সহজ সরল ও বৈজ্ঞানিক

প্রকাশভঙ্গিই বিকশিত হয়েছে। এইসব কারণেই গ্রন্থগুলি সহজবোধ্য ও সহজ পাঠ্য হয়েছিল। তাদের সাহিত্যিক ও শৈল্পিক মূল্যায়ন এই যে তারা আহোম যুগের বৈজ্ঞানিকভাবে গদ্যরচনারীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এদের মধ্যে প্রধান হলেন স্থকুমার বরকাথের (বরকায়স্থ) 'হস্তীবিদ্যার্ণব'। ১৭৩৪ সালে রাজা শিবসিংহ ও তাঁর মহিষী রাণী অম্বিকাদেবীর আদেশে এই সচিত্র পুস্তকটি তিনি প্রণয়ন করেন। চিত্রগুলির শিল্পীদের নাম দিলবার ও দোগাই। এই পুস্তকটিতে নানা ধরনের হস্তীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে, এবং কিভাবে তাদের শিক্ষা দিতে হয়, তাদের রোগ ও ঔষধাদির বিবরণও প্রদত্ত হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে সমাজের স্তর অনুযায়ী কী ধরনের হস্তী কে ব্যবহার করবে। শম্ভুনাথের 'গজেন্দ্র চিন্তামণি' পুস্তক থেকে 'হস্তীবিদ্যার্ণবে'র সারভাগ সংকলিত একথাও বলা হয়েছে। পুস্তকটির ভাষারীতি ও রচনাশৈলী অন্য কথাকাহিনীর ভাষার মতোই, বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই, একই ধরনের ভাবাবিন্যাস ও বাক্যচয়ন। কথ্যভাষার শব্দানুয়ায়ী শ্লোকগুলি রচিত।

'ঘোড়া নিদান' নামে পুস্তকটি একই ধরনের। আসাম সরকার কর্তৃক এর একটা মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হলে (১৯৩২) এই মূল্যবান পুস্তকটির মর্যাদা বাড়ে। এর সম্পাদনা করেছেন তারিণীচরণ ভট্টাচার্য এবং ভূমিকা লিখেছেন ডঃ সূর্যকুমার ভুঁইঞা—তিনি বলেন, "এই দুটি বিশিষ্ট লোকায়ত পুস্তক (হস্তী-বিদ্যার্ণব ও ঘোড়া নিদান) অসমীয়া দেশজ ভেষজ বিদ্যার সংকলন এবং সাহিত্যের দিক থেকে নানা শব্দ সংগ্রহ করা হয়েছে যার ব্যবহার আজকাল প্রায় অপ্রচলিত"। সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের তালিকা বা আয়ুর্বেদোক্ত নানা পুস্তকের মধ্যে ফলিত জ্যোতিষের কথাও পাওয়া যায় এবং দৈবনির্দিষ্ট দেহ বৈকল্যের জন্য অনুষ্ঠানাদি ও মন্ত্রের ব্যবস্থা ছিল। রোগ উপশমের জন্য মন্ত্র ও কবচাদির ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত ছিল। সর্পদংশন, কুদৃষ্টি, কুস্বপ্নাদির প্রতিষেধক বা দুঃখদুর্দশা থেকে অব্যাহতির জন্য বা চাষবাস বা গৃহকর্মের উন্নতি ও অন্যান্য বহু অশুভ নিবারণের জন্য মন্ত্রপাঠ বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। অসমীয়া কাহিনীকাররা এমন কি মুসলমান ঐতিহাসিকেরা সাক্ষ্য দেন যে দেশে তখন নানা ধরনের জাদুমন্ত্র ও কবচাদি প্রচলিত ছিল—এমন কি মন্ত্রপাঠ-বিরোধী সৈন্যদলকে বিমূঢ় ও বিমোহিত করা যায় এই রকমের ধারণাও অপ্রচলিত ছিল না। এই বিশ্বাসও ছিল যে মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা অত্যাচারী রাজপুরুষদের প্রাণবিনাশ

সম্ভব। একটি আহোম বুরুঞ্জীতে বর্ণিত একটি রাষ্ট্রতন্ত্র ও রাজবিরোধী ষড়যন্ত্র মামলায় একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য উদ্‌ধৃত হয়েছে—"আমি শুনেছি যে একজন বাগের কাছে একটি পুরাতন পুঁথি আছে যাতে লিখিত মন্ত্রতন্ত্র বা আচার অনুষ্ঠানের সাহায্যে রাজা থেকে প্রজা পর্যন্ত সকলকেই বশীভূত করা যায়"। সেইজন্য মন্ত্রগুলি গদ্যে ও পদ্যে দুই ধরনেই রচিত। এইসব মন্ত্রপুঁথিগুলির মধ্যে সমধিক বিখ্যাত—সর্পধারিণী মন্ত্র, করতি মন্ত্র, সর্বডাক মন্ত্র, কামরত্ন মন্ত্র, ভূতমন্ত্র, ক্ষেত্রমন্ত্র— এই সব নামের তালিকা বিস্তৃত করা যায় এবং এই সব মন্ত্র সাহিত্যের প্রভাব ও প্রসারের অভিনবতা ও প্রচারের প্রাচুর্য বোধগম্য হয়। এ কথা সত্য যে এইসব মন্ত্রপুঁথির সাহিত্যিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর বা নেই বললেই চলে। কিন্তু জাতীয় জীবনে ও জনমানসে তাদের স্মৃতি ও শ্রুতি অবিস্মরণীয়। অন্য সব জ্ঞানপ্রদায়িনী পুস্তিকার মধ্যে শুভঙ্করের 'শ্রীহস্তমুক্তা-বলী'র নাম উল্লেখযোগ্য। আদি সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোকাবলীর মধ্যে জীবদেহে নানা কোষের গতি, প্রবাহ, সঙ্কোচন প্রভৃতি অতি নিপুণতার সঙ্গে পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে আলোচিত হয়েছে এবং যতদূর সম্ভব এই সব বিচারে অসমীয়া শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। কবিরাজ চক্রবর্তীর 'ভাস্বতী' একটি জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ। ইনিই যদি 'শঙ্খচূড় বধ' 'শকুন্তলা কাব্য' 'গীতগোবিন্দ' প্রভৃতির অনুবাদক হন তাহলে তিনি রাজা শিবসিংহের সমকালীন (১৭১৪-৪৪)। 'ভাস্বতী' সংস্কৃত সূর্যসিদ্ধান্তের সার সংকলন। পাটীগণিতের পুস্তকাদির মধ্যে কাশীনাথের 'গণিতের আর্য্যা' সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই পুস্তকে গণিত শাস্ত্রানুসারে জমি মাপ করবার প্রণালী বর্ণিত এবং পথ নির্মাণের প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে এবং গণিতশাস্ত্রের সংখ্যার বৈভাজক বিদ্যার চতুর্থমাত্রিক মূলরূপগুলিও বর্ণিত হয়েছে। অনেক স্থানে মূল সংস্কৃত শ্লোকও দেখা যায়। হর্ম্যশিল্প, পথনির্মাণ এবং অন্যান্য বিষয়েও নানা গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল।

এই সব গদ্যপুঁথিগুলির বিচার-বিশ্লেষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ভট্টদেবের যুগ থেকে 'হস্তীবিদ্যার্ণবে'র কাল পর্যন্ত অসমীয়া গদ্য সাহিত্য কতদিকে কতভাবে বিস্তৃত ছিল। অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত লিপিগুলিই এই প্রচার বিস্তারের প্রধান কারণ। তাছাড়া গুরুগম্ভীর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থও রচিত হয়েছে তবে সেগুলি সংস্কৃতাভিজ্ঞ পারদর্শী পণ্ডিতদেরই অনুবাদ। অসমীয়া ভাষায় তখনও পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে তদ্ভব এবং সচল দেশজ-শব্দ উৎপন্ন ও

তাদের ব্যবহারের কোনো সঠিক নিয়মানুবর্তিতা নির্দিষ্ট হয়নি। সংস্কৃত ব্যতীত আর কোনো ভাষা বা উপভাষার ব্যাকরণ বা লিখন প্রণালীর আদর্শ বা ছবি সম্মুখে ছিল না। সেইজন্য অসমীয়া গদ্যের পক্ষে সংস্কৃতকে অনুসরণ করা ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা ছিলনা। তবুও সদ্যোজাত অসমীয়া গদ্য সংস্কৃতের উপর নির্ভরশীল হলেও অসমীয়া গুরুগম্ভীর ধ্বন্যাত্মক বাক্যযোজন যুক্তশব্দের স্রোত, যতদূর সম্ভব পরিহার করেছিল ; এবং ভাষাকে সহজবোধ্য করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যে সাধারণ জনশ্রেণী যাতে সহজে ভাষার সংকেত ও বক্তব্য বুঝতে পারে। সেইজন্যই গুরুগম্ভীর বচনসম্ভার যথাসম্ভব বর্জন এবং সরল করা হয়। বক্তব্যগুলি এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে অতিরিক্ত তর্ক, বিচার বা বিশ্লেষণের গণ্ডি এড়িয়ে অতি সাধারণভাবে এইগুলির অর্থ বোঝা যায়। এই বক্তব্যগুলিতে সোজা পৌছানর দরুন বক্তব্যগুলিকে সংক্ষিপ্তও করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত না করলে মধ্যযুগের আসামের জ্ঞানান্বেষণ বা তার অধ্যয়নস্পৃহার সঠিক মূল্যায়ন অসম্ভব।

পূর্বেই কথিত হয়েছে যে আহোম রাজাদের রাজত্বকালে সাহিত্যে তাঁদের সবিশেষ অবদান হচ্ছে বুরুঞ্জী লেখনের ব্যবস্থা। এইগুলি রাজাদেশে বা রাজসভার পদস্থ সভাসদদের নির্দেশে লিখিত কারণ তাঁরাই রাজ্যশাসন সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ, চিঠি পত্রাদির বা অন্য ঐতিহাসিক সন্ধান জানতেন এবং লেখকদের সেই সব সংবাদ সরবরাহ করতে পারতেন। এইগুলি সাধারণত সামরিক কর্মচারীদের প্রেরিত বিবরণী, বিভিন্ন রাজন্যবর্গকে লিখিত পত্রাবলী, বিচারকার্যের বিবরণ, রাজস্ব আদায়ের হিসাবপত্র ইত্যাদি, রাজা ও মন্ত্রীদের আদেশপত্র, তাঁদের মন্তব্য ও সমকালীন জনগণের উক্তি ইত্যাদি (অসম বুরুঞ্জীর ভূমিকা)।

বুরুঞ্জীগুলি প্রথমে শাসকদের ভাষায় অর্থাৎ আহোম ভাষায় লিখিত হয়। পরে এইগুলিকে অসমীয়া ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়। এই বুরুঞ্জীগুলি অসমীয়া ভাষায় ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ও গৌরবময় যুগের সূচনা করে। এটা বলা খুব অত্যুক্তি হবে না যে বর্তমান অসমীয়া গদ্য এই বুরুঞ্জীরই সৃষ্টি। স্যার এ. গ্রীয়ারসন এই অনুপম ঐতিহাসিক সাহিত্য উপকরণ দেখে বলেন—"অসমীয়ারা তাদের জাতীয় সাহিত্যের জন্যে স্বভাবতই গর্ব অনুভব করতে পারে—আর এইটি এমন একটি বিভাগ যেখানে সমগ্র

ভারতবর্ষ সত্যই দীন। এই সব ঐতিহাসিক চিত্র বা বুরুঞ্জী সংখ্যায় বহু ও বিস্তৃত। একজন অসমীয়া ভদ্রলোকের পক্ষে বুরুঞ্জী জ্ঞান একটি অপরিহার্য গুণ।" (লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া)

বুরুঞ্জী সংকলন একটি পুণ্য কাজ এবং সেইজন্য দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে এর আরম্ভ বিধেয়। এই বিবৃতিগুলি যাঁরা সংকলন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং শাসনকার্যের উচ্চপদে নিযুক্ত। সেই জন্য এইসব বিবরণীর ভাষা মনোরম, রসবোধ সমৃদ্ধ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। যেহেতু এইগুলি সত্যঘটনাপঞ্জির ভিত্তিতে লিখিত, সেহেতু তাদের ভাষায় সাধারণত আবেগ, কল্পনা বা অলংকারের ঝংকার নেই। বুরুঞ্জীগুলি তাই সহজ, সরল, অকৃত্রিম এবং প্রশ্নাতীতভাবে মনোমুগ্ধকর।

এই অতি বিরাট ঐতিহাসিক উপাদানগুলির সম্যক সম্পাদনা ও গ্রন্থনা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ডঃ সূর্যকুমার ভুঁইঞা কতকগুলি বুরুঞ্জীর সম্পাদনা করেছেন এবং সেইগুলি আসাম সরকারের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। আজ পর্যন্ত ঐ বিভাগ কর্তৃক গদ্যবিবরণী-ভুক্ত বুরুঞ্জী যা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির নাম—

হরকান্ত বরুয়া সম্পাদিত 'অসম বুরুঞ্জী' (১৯৩০), 'দেওধানী-অসম-বুরুঞ্জী' (কতকগুলি বুরুঞ্জীর সংকলন ১৯৩২),

শ্রীনাথ দুয়ারা কর্তৃক 'টুঙ্গাঘুঙ্গিয়া বুরুঞ্জী' (১৯৩২), 'কাচারী বুরুঞ্জী' (১৯৩৬) এবং 'অসম বুরুঞ্জী' (১৯৪০)।

আর দুইটি বৃহৎ বিবরণী হচ্ছে—'পুরাণী অসম-বুরুঞ্জী' (১৯২২) এবং 'পাদশাহ বুরুঞ্জী' যেগুলি কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি প্রকাশ করেছেন এবং এর সম্পাদনা করেন পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী এবং ডঃ সূর্যকুমার ভুঁইঞা।

এইসব বুরুঞ্জী রচনার সঠিক সময় জানা যায়নি। অনেকদিন ধরে এই সব বুরুঞ্জীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। কালানুক্রমে মনে হয় পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত 'পুরাণী অসম-বুরুঞ্জী'ই এইসব আখ্যায়িকার আদিমতম বিবরণী এবং গোস্বামী মহাশয়ের ধারণা যে এইগুলির সংগ্রহ আরম্ভ হয় গদাধর সিংহের রাজত্বকালে (১৬৮১-১৬৯৫)। আর একটি আখ্যান—

'স্বর্ণনারায়ণ দেব মহারাজের আখ্যান' আসাম-বুরুঞ্জী নামে প্রকাশিত হয়েছে প্রায় একই সময়ে, ডঃ সূর্যকুমার ভুঁইঞার অভিমত এই।

পণ্ডিত গোস্বামীর মতে 'কথা-গীতা' ১৫৯৪ সালের পরে লিখিত হয়। সেই জন্য 'কথাগীতা' ও 'পুরানী-অসম-বুরুঞ্জী'র ব্যবধান প্রায় একটি শতাব্দীর। 'পুরানী-অসাম-বুরুঞ্জী' থেকে প্রমাণিত হয় যে একশত বৎসরে অসমীয়া গদ্য রীতি কিভাবে গঠিত হচ্ছিল। যদিও এ কথা সত্য যে ভট্টদেবই প্রথমে অলংকার আর সমাসবহুল সংস্কৃত লিখনরীতি থেকে অসমীয়া সাহিত্যকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করেছিলেন তবুও তিনি সম্পূর্ণভাবে ঐ চাকচিক্যময় রীতির অবসান ঘটাতে পারেননি। তবে ভট্টদেবের চেষ্টায় অসমীয়া শব্দচয়নে ও বাক্যসম্ভারে সংস্কৃতের প্রভাব ক্রমশই কমে আসতে থাকে, যদিও তিনি নিজেই একজন প্রাচীন পন্থী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর বাক্যবিন্যাস প্রণালীতে সাধু সংস্কৃতভাষার প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি এবং বহু তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। বুরুঞ্জীর ভাষা কিন্তু এই সাধুভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত এবং তাদের বিষয়-বস্তুর সার্বিক চেতনা ও ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ বিপরীত। সেগুলি ধর্মবিষয়ক বা আধ্যাত্মিক গ্রন্থ নয়; মুখ্যত রাজসভায় যে সব কাহিনী ঘটেছে তারই আখ্যান ও সম যুগোপযোগী বিবরণের লিপি—রাজার দিনপঞ্জি, সভাসদদের কর্মচর্চা ও দিনচর্যা এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর তালিকা। রাজসভার সুসংস্কৃত ভাষার ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ হওয়ায়, ভাষার ঐশ্বর্য ও স্পষ্টতা ঐতিহাসিক বর্ণনার উপযোগী। এই প্রসঙ্গে ডঃ সূর্যকুমার ভুঁইঞার মন্তব্য স্মর্তব্য; তিনি বলেন, "এটা বড়ই আশ্চর্যের কথা যে বৈষ্ণবকাব্যের আতিশয্যে ও অতিকথনে লালিত পালিত অসমীয়া সাহিত্যে ঐ ভাষা কিভাবে ঐতিহাসিক বিবরণী লিপিবদ্ধ করবার ভিত্তি ভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেখানে আবেগবর্জিত, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সাদামাটা নিষ্ঠুর কৃপণ সত্যভাষণই একমাত্র পন্থা। কল্পনাশ্রয়ী ও ঘটনাশ্রয়ী এই দুই ধারার মধ্যে সেতু রচনা করেছে বুরুঞ্জীগুলি, যা সত্যই আহোম ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক উপাখ্যান এবং কি উপায়ে এই মিলন সংঘটিত হ'ল সেইটাই ভাববার বিষয়। আহোম বুরুঞ্জীর লেখকরা ভাব ও কল্পনাজড়িত বিবরণ লিখতেন না—বরং সেদিকে তাঁরা মুক্তপুরুষই ছিলেন—তাঁরা ঘটনা-পঞ্জির সততা, দৃঢ়তা ও সত্যভাষণের উপরই বেশি জোর দিতেন, কারণ তাঁদের লেখনী উদ্ভূত বিবরণীগুলি রাজ্যের সমাচারদর্পণ মাত্র এবং

রাষ্ট্রশাসনে অঙ্গীভূত তথ্যলিপি, যার জন্যে তাঁরা রাজসভার ও মন্ত্রীসংসদের কাছে দায়ী ছিলেন।"

যদিও এইসব বুরুঞ্জীগুলিতে সাহিত্যিক পরিবেশ বা কারুকার্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবুও বুরুঞ্জীর মধ্যে তার অভাবও ছিল না। এই প্রসঙ্গে ডঃ ভুঁইঞার পাদশাহ বুরুঞ্জীর সম্বন্ধে একটা মন্তব্যের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করতে বলছি, কারণ ঐ কথাগুলি সব বুরুঞ্জী সম্বন্ধেই অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। তিনি বলেন—ঐতিহাসিক বিবরণীগুলি শুধু শুকনো কঙ্কাল নয়—এর মধ্যে চিন্তা ও ভাবের তরঙ্গও আছে; এবং সেই সূত্রেই এরা সাহিত্যের পর্যায়ে স্থান পায়। প্রাক ব্রিটিশযুগে, একথা বলা বোধহয় অত্যুক্তি হয় না যে ভারতের কোনো ভাষার সাহিত্যসৃষ্টিতে এই ধরনের ইতিহাস সাহিত্যের সংযোগ ঘটেছে। তা না হলে যা শুধু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর শুষ্কবিবরণপঙ্ক্তি হ'ত, এখন তা পাঠকদের সাহিত্য পাঠের সরস সামগ্রীও হয়েছে, অনুরাগে অনুপ্রাসে, অনুকরণে, উপকরণে, উপমায় ও নূতন নূতন ভাববিন্যাসের নূতনতর পরিবেশ সৃষ্টিতে। সমগ্র বুরুঞ্জী সাহিত্যের যেখানে সেখানে বহুদর্শী জ্ঞানের কথা ও নব নব ভাব ভাবনার উদাহরণ মেলে। বুরুঞ্জীর সাহিত্যিক সফলতার নিগূঢ় কারণ হচ্ছে সেইখানে, যেখানে ছড়িয়ে আছে পার্থিব জ্ঞান কথ্যভাষার স্থানীয় পরিবেশ এবং স্বল্পকথায় ও বাক্যগঠনে লেখকের স্বাদু ও গৃহস্থজনোচিত মনোভাব ও লেখনীর তদুপযুক্ত ব্যবহারিক সৌকর্য।

বুরুঞ্জীর মাধ্যমেই অসমীয়া ভাষার শব্দসম্ভার, প্রয়োগরীতিনীতির উৎকর্ষ সাধিত হয় বিবিধ দিকে। আহোম সভায় ব্যবহৃত বহু শাসন সংক্রান্ত আইনানুগ বাক্যরাশি গৃহীত হয়েছে। অসমীয়া ভাষায় আহোম শব্দও বিরল নয়। এই সব রচনাবলী আহোম জীবনধারা ও সংস্কৃতি বাচক ও তাদের সঙ্গে ওতো-প্রোত ভাবে জড়িত। আরবী ও ফারসী ভাষায় ব্যবহৃত কিছু শব্দও অসমীয়ায় পাওয়া যায়, বিশেষভাবে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে রাষ্ট্রদূতের কাজ করতে হত বলে, ঐ সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজে। এই সব বুরুঞ্জী বেশির ভাগই অসমীয়া ভাষার পূর্বাঞ্চলের উপভাষায় লেখা (উজানিয়া ভাষা) যা এই সময় থেকে স্বীকৃত সাধারণ সাহিত্যিক ভাষা বলে পরিগণিত হতে লাগল। অবশ্য পূর্ব আসামেই আহোম রাজাদের রাজধানী ও রাজ্যশাসনের কেন্দ্র এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় এই পরিণতি স্বাভাবিকভাবেই ঘটে যায়। এই

ভাষার রীতি অনুসরণেই পরে উনবিংশ শতাব্দীতে সহজ সরল গদ্যে 'অরুণোদয়' নামে প্রথম অসমীয়া ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় (১৮৪৬)।

গদ্যে ও পদ্যে আর এক ধরনের ঐতিহাসিক রচনাও এই সময়ে পাওয়া যায় যার নাম বংশাবলী। এইসব বংশাবলীতে কতকগুলি বিশিষ্ট পরিবারের প্রতিপত্তিশালী পুরুষ ও রমণীদের জীবনী ও কার্যকলাপ বিবৃত করা হয়েছে— সেই প্রসঙ্গে তৎকালীন সামাজিক চিত্র ও সমসাময়িক আচারবিচারের ছবিও কিছুটা ফুটেছে। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত বংশের ইতিহাস সংকলন করা হ'ত রাজানুগ্রহ ও চাকরি পাওয়ার জন্যে। এই বংশাবলীতেই বুরুঞ্জীতে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তার চেয়ে কিছু বেশি চিত্র বা অতিরিক্ত তথ্য মিলত। এইরকম একটি বংশাবলী—"দারাং রাজ বংশাবলী'। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোচ নৃপতি সমুদ্রনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় সূর্যখরী দৈবজ্ঞ নামে একজন কবি পদ্যে 'দারাং রাজবংশাবলী' লেখেন। এঁর স্বহস্তলিখিত মূল পাণ্ডুলিপিটি সুন্দরভাবে নানা রঙে চিত্রবিচিত্রিত। অধ্যাপক ভুঁইঞার মতে 'দারাং রাজবংশাবলী প্রথমদিককার কোচরাজাদের ইতিহাস প্রণয়ণের একটি অমূল্য আকর।'

আসামের ছয়শতবৎসরের আহোম রাজত্ব সব দিকেই একটি বর্ণাঢ্য ইতিহাসের সূচনা। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে এই যুগের প্রধান বৈচিত্র্যগুলি হল দেশের ভৌগোলিক ও জাতীয় একীকরণ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সবল সংগঠন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানগুলির সুচারু নিয়ন্ত্রণ এবং একটি সম্পূর্ণ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। এই দেশাত্মবোধের উন্নতির জন্য আরও আশু কারণ ছিল, যেমন মুঘলদের আক্রমণ, ইসলামের আগমন, রাজন্যবর্গের রাজ্যবিস্তারের স্পৃহা এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রদেশে একটা নবজাগরণের চিত্র। বিচারবিশ্লেষণগ্রাহ্য এই জাতীয়তাবোধ শুধু শিল্প ও সাহিত্যের উপরই প্রভাব বিস্তার করে নি, জনগণের জীবনের অন্যান্য দিকেও প্রভূত প্রভাবান্বিত করেছে। জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলার মুখপাত্র হিসেবে হস্তলিখিত পুঁথির বিরাট সংগ্রহই এই যুগবিবর্তনের সঙ্গে জাতীয় জীবনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রকাশ করে। এই হস্তলিখিত পুঁথিগুলির প্রয়োজন ছিল শুধু লিখবার ভঙ্গি বা লিপিকুশলতার জন্য নয় বা চিত্রাঙ্কন বিদ্যার জ্ঞান ও কৌশলের জন্য নয়। এইগুলি অসমীয়া সাহিত্যের একটি গৌরবময় যুগের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। অবশ্য এই ধরনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য জ্ঞান, অবসর ও অর্থের প্রয়োজন ছিল বেশি।

সেইজন্য রাজা, রাজপুরুষ বা অভিজাত বদান্য ধনী সমাজের সাহায্য ব্যতীত এই সব পুঁথি লেখা কঠিন ছিল। বেশির ভাগ ঐতিহাসিক দিনপঞ্জিগুলি রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় লেখা হয় এবং এর পাণ্ডুলিপি দেখলে আজও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এগুলি শিল্পের দিক থেকে অমূল্য সম্পদ এবং যে সব পাত্রের উপর এগুলি খোদিত বা লিখিত সেগুলিও শিল্পের রাজ্যে এক বিচিত্র নিদর্শন বহন করছে। গীতগোবিন্দ, শঙ্খাসুর বধ, ভাগবত, দারাং রাজবংশাবলী, হস্তীবিদ্যার্ণব প্রভৃতি হাতে লেখা সুদৃশ্যাঙ্কিত পাণ্ডুলিপি আজও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। এই সব গ্রন্থে শুধু ধর্মবিষয়ক চিত্রই স্থান পায় নি—রাজা, রাজসভা ও সভাসদদেরও চমৎকার চিত্র রয়েছে।

সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে এইগুলির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—অসমীয়া গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং সেখানে সামাজিক জীবনের নানা চিত্রের রূপোদ্ঘাটন ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে। শুধু রাজা মন্ত্রী বা সাধুসন্ত ব্যক্তিবিশেষকে যেখানে তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে দেখি একটা বৈজ্ঞানিক কৌতুহলের ছায়া। এই যুগের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে গদ্যসাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার ও নানারকম সমস্যার সমাধান এবং একটা বিচার ও বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গির দিকে সাহিত্যিকদের লক্ষ্য। এই যুগের অসমীয়া গদ্য সাহিত্যের বিকাশ, এবং সেখানে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নানা চিত্রের উদ্ঘাটন, ব্যক্তিবিশেষকে উন্নীত করবার চেষ্টায় প্রশস্তি মুখরতা বা রাজা ও সাধুসন্তদের চরিত্রচিত্রণ ছাড়াও একটা বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের উন্মেষ ছিল এবং এর সঙ্গে সাধারণ জনজীবনের একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ ছিল ও তাদের নানারূপ সমস্যার কথাও স্থায়ী সাহিত্যের স্থান লাভ করেছিল। গণিতশাস্ত্র ও স্থাপত্যবিদ্যার অনুশীলনই প্রথম পদক্ষেপ। ফলিত জ্যোতিষ চর্চা এবং 'গর্দভ ও অ্যাপেলোর ঘোটক' চর্চা প্রচলিত ছিল এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনায় তখনকার শাস্ত্রবিদরা তাঁদের সীমিত জ্ঞান অনুযায়ী এই সব নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন। আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে পুস্তকগুলিতে নানাধরনের ঔষধ, ভেষজ নির্বাচন ও প্রাণিতত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক বর্ণনা আছে।

যখন আমরা মূল সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন প্রেরণাদায়ক কোনো অনুভূতি পাই না। একটা তুলনা মনে আসে যে এই সময়ে বহু গাছে ফুল ফুটেছে, কিন্তু প্রশ্ন জাগে ঐসব বৃক্ষলতা সযতনে লালনপালন বা রক্ষণা-

বেক্ষণ করা হয়েছিল কি? এমন কিছু ভালো ফুল ফোটেনি যাতে সুগন্ধি ছড়ায় ও বর্ণচ্ছটা পাওয়া যায়। এই যুগে বহু লেখা হয়েছে এবং সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই, কিন্তু বেশিরভাগ লেখা, কী ধর্মসম্বন্ধীয়, কী জীবনের বিদ্যাচর্চার অন্যবিভাগীয়, সবই বাকসর্বস্ব, অনুকরণপ্রিয় ও কষ্টকল্পিত। প্রাচীন ধারার ঊর্ধ্বে কোনো চিন্তার বা চেতনার বিকাশ নেই, কোনো নতুনত্ব নেই, যদিও তাঁরা নব নব বিষয়ের অবতারণা করেছেন। পূর্বসূরীদের অনুসরণ ছাড়া তাঁদের মধ্যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা বা নব্যরীতি দেখা যায় নি। তাঁদের লেখায় সুদৃঢ় বদ্ধভাব ও ভাবনার কোনো বিশেষ রূপ পাই না, যাঁরা সে চেষ্টা করেছেন—কেউ কেউ যে করেন নি তা নয়—তাঁদের মধ্যেও চেতনা ক্ষীণ এবং তাঁদের সাহিত্যের ধমনীতে রক্তবেগ যেন ক্ষীণ, অর্থাৎ সতেজ নয় বা রক্তহীনতার লক্ষণ। এইযুগে বহু কবি ও অন্য লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল, কিন্তু শংকরদেবের মতো সন্ত কবির দর্শন মেলে না, মেলে না মাধবদেবের মতো একজন বিরাট দার্শনিক ভক্তের সাক্ষাৎ বা রামসরস্বতীর মতো একজন সর্বশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতের।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আধুনিক যুগের আরম্ভ

আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন

আহোমরা আসামে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর (১৮২৬) প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। আহোম প্রতিপত্তির শেষ কয়েক বৎসর আসামের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়াল অবস্থার ছিল। সারাদেশ তখন অন্তর্বিপ্লবে ছিন্নভিন্ন। সমগ্রদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই হিন্দু মতবাদীদের বিবাদ বিরোধ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই চলছিল এবং শাক্তরা রাজানুগ্রহ পাওয়ায় শাক্তধর্মই সরকারিভাবে রাজ্যের ধর্ম রূপে গৃহীত হয়েছিল। এতে কিছু ইতরবিশেষ ঘটত না কারণ রাজারা ধর্মবিষয়ে নিরপেক্ষতাই অবলম্বন করতেন। কিন্তু রাজা রাজেশ্বর সিংহের রাজত্বের শেষদিকে (১৭১৪-১৭৪৪) রানী, যিনি রাজকার্য পরিচালনায় প্রভূত ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন, একশ্রেণীর বৈষ্ণবদের উপর অত্যাচার করেন। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সেই বিপ্লবের স্রোত শাসনযন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিকে নাড়া দেয়। পরবর্তী রাজা লক্ষ্মীসিংহ এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। দেশের শাসনযন্ত্র কোনোদিনই বিশেষ শক্তিশালী ছিল না এবং এই আঘাতে অবলুপ্তির ও ভাঙনের চিহ্ন প্রকাশ পেতে লাগল।

এই বৈষ্ণবীয় বিদ্রোহ ও নানা রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক কারণে চন্দ্রকান্ত সিংহের রাজত্বকালে ১৮১৭ সালে, শাসনযন্ত্র আরও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং আহোম রাজপ্রতিনিধি বদন বরফুকনের আমন্ত্রণে ব্রহ্মদেশীয়রা আসাম আক্রমণ এবং লুটপাট করে। রাজ্যের ঐশ্বর্য তাদের পুনরায় পরবৎসর আসাম আক্রমণে লুব্ধ করে এবং তারা আসাম জয় করে ১৮২০ সালে তাদের রাজত্ব স্থাপন করে। ১৮২৬ সালে ব্রহ্মদেশীয়রা ব্রিটিশদের সঙ্গে কাচারে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পরাজিত হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে আসাম হস্তান্তর করতে বাধ্য হয় ইয়ানাদবু সন্ধিপত্রের ধারা অনুসারে (১৮৩৯)।

ব্রিটিশরা ঐ দেশে নব আগন্তুক ছিল এবং তাদের দেশজ ভাষারও জ্ঞান

ছিল না। সেইজন্য ভারতের অন্য প্রদেশের অধিবাসীরা আসামে আসতে আরম্ভ করলেন এবং ব্রিটিশ শাসকবর্গকে আহোম ভাষার অনুলেখক ও কেরানীরূপে সাহায্য করবার জন্য তাদের অধীনে চাকরি ও অন্যান্য বৃত্তিগ্রহণ করে বসবাস আরম্ভ করলেন। এইসব ব্রিটিশ অনুগামীদের বেশিরভাগই বাঙালী ছিলেন এবং তার প্রভাবে বাংলাভাষাই আদালত অফিসের দ্বিতীয় ভাষারূপে গণ্য হল এবং বিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হতে লাগল। ১৮৩৬ সালে অসমীয়া ভাষা আদালত ও স্কুল থেকে পরিত্যক্ত হয় এবং বাংলা ভাষা তার স্থান অধিকার করে। ঐ বৎসরেই যখন অসমীয়া ভাষা হৃতগৌরব তখন ব্যাপটিস্ট মিশনের দুজন বিশিষ্ট মিশনারী রেভঃ এন্. ব্রাউন এবং ও. টি. কোটর আসামে তাঁদের পরিবারবর্গসহ আগমন করেন। তাঁদের ব্যবহার্য সামগ্রীর মধ্যে একটি ছাপাখানার যন্ত্রও ছিল—তাঁদের কাজ ছিল খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম প্রচার করা এবং সেই ধর্মের অনুশীলনে স্থানীয় লোকেদের উৎসাহিত করা। তাঁদের আগমনের তিন মাসের মধ্যেই তাঁরা অসমীয়া ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়ে একটি বর্ণপরিচয় প্রকাশ করেন এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তার পঠন পাঠন আরম্ভ করালেন। তাঁদের আসবার পূর্বেই ১৮১৩ সালে শ্রীরামপুরে দুইজন ইংরাজ মিশনারী কেরী ও মার্শম্যান সাহেব নওগাঁ জেলায় বালিয়াবরের অসমীয়া পণ্ডিত আত্মারাম শর্মার সহায়তায় সমগ্র বাইবেল অসমীয়ায় অনুবাদ করান। এই প্রথম ছাপাযন্ত্রে মুদ্রিত অসমীয়া পুস্তক। কিন্তু মিশনারীরা সাহিত্যিক নন; তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রতীচ্যের শিক্ষাদীক্ষার প্রসার। সেইজন্য তাঁদের প্রতিপাদ্য বিষয় ও লেখার বিষয়বস্তু ছিল খ্রীষ্টান ধর্মবিষয়ক সাহিত্য ও ইতিহাস থেকে গল্প আখ্যায়িকা, কাহিনী চয়ন করে জনসাধারণকে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগী করার চেষ্টা। এইসব পুস্তকে সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় ছাড়াও ইতিহাস থেকে সংকলিত নানা গল্প, ভূগোল এবং বিজ্ঞানের কথা থাকত, আর থাকত খ্রীষ্টান সাধুমহাত্মাদের জীবনী। ১৮৩৯ সালে শ্রীযুক্ত রবিন্‌সন্ শ্রীরামপুর থেকে 'অসমীয়া ভাষার ব্যাকরণ' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন; এটি প্রথম অসমীয়া ব্যাকরণ। ১৮৪৮ সালে রেভারেণ্ড ব্রাউন শিবসাগর থেকে তাঁর 'গ্র্যামাটিকাল নোটিস অফ্ দি আসামীজ ল্যাঙ্গুয়েজ' নামে পুস্তকটি প্রকাশ করেন। এখান থেকেই মিসেস কোটারের 'ভোকাবুলারি' প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ সালে মিঃ জি. এফ.

নিকল তাঁর 'ম্যান্নুয়েল অফ্ দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর সঙ্গে একটি অসমীয়া ব্যাকরণ পদ্ধতিও প্রকাশ করেন। অসমীয়া ভাষার এই সমস্ত ব্যাকরণগুলিই ইংরেজিতে লেখা এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্যই রচিত, যাঁরা অসমীয়া ভাষা বুঝতে চান। স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই তাঁরা ইংরেজি ব্যাকরণের রীতিনীতিপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত তবু অসমীয়া ভাষার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাকরণ সংযোজনের প্রথম প্রচেষ্টা এইখানে।

১৮৬৭ সালে শিবসাগর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে মিঃ ব্রন্‌সনের 'ডিকশনারি ইন আসামীজ অ্যাণ্ড ইংলিশ' নামে অভিধান প্রকাশিত হয়। এই প্রথম প্রকাশিত অভিধান, যদিও শ্রীযুক্ত যদুরাম বরুয়া একটি অভিধান এরও পূর্বে সংকলন করেছিলেন কিন্তু সেটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় নি। ব্রনসনের বর্ণলিপি কথ্যভাষা থেকেই সংগৃহীত কিন্তু কথ্যভাষা ও সাহিত্যের ভাষার মধ্যে প্রভেদ থাকা স্বাভাবিক। সেইজন্য ঐ অভিধানের এখন আর ব্যবহারযোগ্যতা নেই। মিশনারীদের অন্য অবদান সম্বন্ধে তাঁদেরই একজন শ্রীযুক্ত পি. এইচ. মূরের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। ১৯০৭ সালে এই ভাষাবিদ্ পাদ্রী লেখেন—"অসমীয়া আধুনিক সাহিত্য, সেটি খ্রীষ্টান ভাব প্রণোদিত হোক বা না হোক, ঊনবিংশ শতাব্দীর গত ষাট বৎসরের ফসল। ব্রাউন, ব্রনসন ও নিধিলেভি এই তিনজন অসমীয়া খ্রীষ্টান সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়।"[১]

সাহিত্যের প্রচারক খ্রীষ্টান যাজকদের মধ্যে ব্রাউনকেই অসমীয়া রচনার প্রধান পুরোধা ও সুহৃদ হিসাবে গণ্য করা যায়। শ্রীযুক্ত ও. কাটারের সঙ্গে তিনি সর্বপ্রথম আসামে একটি ছাপাখানা স্থাপিত করেন। এইখান থেকেই প্রথম সংবাদপত্র 'অরুণোদয়' প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'গ্রামার অফ্ আসামীজ ল্যাঙ্গুয়েজ' পুস্তকটির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

ব্রাউনের আর একটি দান হচ্ছে 'নিউ টেস্টামেণ্ট'-এর অসমীয়া অনুবাদ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা উচিত যে বাইবেল যদিও একটি মহান ও পবিত্র গ্রন্থ, এর অসমীয়া সংস্করণ অসমীয়া ভাষা বা সাহিত্যের উপর কোনো বিশিষ্ট ছাপা ফেলতে পারে নি। এর কারণ, যাঁরা অসমীয়ায় এই অনুবাদ করেছিলেন, তাঁদের নিজেদের অসমীয়া সাহিত্যের সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল না এবং ভাষা সম্বন্ধেও তাঁরা সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন না।

১ ভি. এইচ. সোর্ড—'ব্যাপটিষ্ট ইন আসাম'—কনফারেন্স প্রেস, চিকাগো, ইলিনয়, ১৯৩৩

তা ছাড়া তাঁরা যে সব মহাপুরুষ ও তাঁদের ধর্মবাণী বা উপদেশ, সম্বন্ধে চর্চা করতেন বা লিখতেন তাঁদের সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান ও বিশ্বাস সীমিত ছিল এবং সেগুলি এদেশের অমর মহাকাব্য রামায়ণ বা মহাভারতের আখ্যায়িকার মতো আকৃষ্ট করত না। খ্রীষ্টান কথা, কাহিনী ও স্তোত্রাদি ব্যতীতও তিনি কতকগুলি প্রাচীন অসমীয়া হস্তলিখিত পুঁথিও প্রকাশ করেন। তাঁর স্ত্রীও অসমীয়া ভাষায় কতকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লেখেন এবং কিছু গল্প ও কাহিনীও রচনা করেন। স্থানীয় জনগণের মধ্যে যাঁরা পাদ্রীসাহেবদের সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিধিলেভি ফারওয়েলের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য। তিনি 'অরুণোদয়'-এ লিখতেন এবং তাঁর রচনার মাধ্যমে তিনি অসমীয়া ভাষার লিপিশুদ্ধতা (বানান) ও ব্যাকরণকে একটা নিজস্ব বিশিষ্ট রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি ১৮৫৫ সালে 'ন্যাচারল সায়েন্স ইন ফেমিলিয়ার ডায়ালগস্' বা চলতি কথার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সহজবোধ্য নামগুলির বিষয় বর্ণনা করে বাংলা থেকে অসমীয়ায় অনুবাদ করে পুস্তক প্রকাশ করেন। চৌদ্দটি বিভিন্ন কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গ্রন্থকার প্রকৃতির নানা রহস্যকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, যেমন—আকাশে গ্রহসংস্থান ও তাদের গতি, মানুষের উদ্ভব কি প্রকারে সম্ভবপর হল, তার পরিবেশ, উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি, জীবজন্তু, উদ্ভিদলতা ও ধাতুর উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি ইত্যাদি। এই পুস্তকটি আধুনিক অসমীয়া গদ্যে কথোপকথনের রীতি প্রচলন করে, যা পরে গদ্যনাট্যকের ভাষায় পরিবর্তিত হয় এবং আরও উন্নতিলাভ করে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-গুলিকে অসমীয়ায় রূপ দেবার জন্য ফারওয়েল যে গদ্যরীতি উদ্ভাবন করেছিলেন, সেগুলি বলতে গেলে স্বয়ং সম্ভূত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'যাত্রীকার যাত্রা'র নাম, যা, ইংরাজি 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস'-এর অসমীয়া রূপ। এর সঙ্গে 'কামিনীকান্ত' এবং 'ফুলমণি আরু করুণা' নামক দুটি উপন্যাসেরও নাম করা যায় যা মিশনারীরা প্রকাশ করেছিলেন। যদিও ধর্মসংস্কারের সুরে লেখা জি. এস. গুণে বিরচিত (১৮৭৭) 'কামিনীকান্ত'ই প্রথম অসমীয়া উপন্যাস। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারীরা আরও কয়েকটি পুস্তক (সবই গদ্যে) লিখেছিলেন, কিন্তু এইগুলি প্রায়ই ইংরাজির অনুবাদ এবং তাতে নতুনত্বের কোনো আভাস ছিল না। নতুন গদ্যলিখন রীতি প্রণয়নের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও একটা লিখন রীতির বিবর্তনের ধারা প্রকাশ পায়।

মিশনারীগণ, তাঁদের লেখায় জনগণের কথ্য ভাষাই ব্যবহার করেছেন। তাঁদের ভাষাজ্ঞান ছিল সীমিত ও বিশেষ কোনো গুণসম্পন্নও নয়। ফলে তাঁদের লেখাগুলিকে বড়ো কৃত্রিম মনে হত এবং অনেক সময় শব্দের উদ্ভট প্রয়োগ হাস্যকরও হত। মোটের উপর জনসাধারণকে তা আকৃষ্ট করতে পারে নি। কিন্তু মিশনারীরা একটা সুনির্দিষ্ট ফললাভ করেছিলেন। এতদিন পর্যন্ত অসমীয়া সাহিত্য ছিল গ্রামীণ এবং আহোম রাজসভার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। এই সময় থেকে এইগুলি নগরেও বেশ প্রসার লাভ করে। গৌহাটি, শিবসাগর, নওগাঁও এবং অন্যান্য শাসন কেন্দ্রেও এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হতে লাগল। এইসব সাহিত্যে শুধু ধর্মবিষয়ক কথা বা অমর দেবদেবীর কাহিনীই স্থান পায় নি বা পূজা আচারবিচার তপস্যা নিয়েই আলোচনার ব্যবস্থা থাকত না, এখানে প্রকাশ পেয়েছে মানুষের কথা, যে মানুষ বাঁচে, মরে, খায়দায়, কলহ করে। ইংরাজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্যের মানব-কেন্দ্রিক ভাব চিন্তাও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রত্যেক শহরেই একটি করে সাহিত্যসমিতি গড়ে ওঠে। পুরাতন দিনের কথা ও কাহিনী, ভাব ও ভাষা, চিন্তা ও চেতনার ধারা ক্রমশঃই রূপান্তরিত হতে থাকে। পশ্চিমী ভাব ও ভাবনার স্রোত অসমীয়া সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে আলোড়িত করতে থাকে এবং এই সৃজনশীল মিশ্র যুগের মধ্যেই অসমীয়া সাহিত্য নবকলেবর ধারণ করতে থাকে। অসমীয়া সাহিত্য-অঙ্গনে নব নব ভাবের প্রবেশ ও রূপায়ণ এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির উৎস সন্ধানে সবচেয়ে বড়ো দান শিবসাগরের ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রতিনিধিদের, তাদের প্রেসের ও অরুণোদয় পত্রিকার। মধ্য উনবিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ অসমীয়া পুস্তকই এই প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মুদ্রিত পুস্তক ও সংবাদপত্র সাহিত্যকে জনসাধারণের নিকটবর্তী করেছিল এবং তাদের বোধগম্য সীমার মধ্যে নিয়ে এসেছিল। এতে সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের একটি পন্থা আবিষ্কৃত হয় এবং সর্বসাধারণের উপযুক্ত একটি ভাষা গড়ে তোলার সুবিধা হয়।

এই প্রসঙ্গে এই যুগের কয়েকজন অসমীয়া সাহিত্যসেবীর নামোল্লেখ করা কর্তব্য যাঁরা এই মিশনারীদের ভাষাশিক্ষণের ব্যবস্থাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—আনন্দরাম ঢেকিয়ল ফুকন, তিনি অসমীয়া ভাষাকে স্কুলপাঠ্য ও আদালতগ্রাহ্য করবার জন্য বিশেষ

আন্দোলন করেন এবং এই বিষয়ে 'অরুণোদয়' পত্রিকায় কয়েকটি যুক্তিগ্রাহ্য বলিষ্ঠ প্রবন্ধের অবতারণা করেন। ফুকনের একটি প্রবন্ধের নাম 'এ ফিউ রিমার্কস্ অন্ দি অ্যাসামীজ ল্যাঙ্গুয়েজ' বা অসমীয়া ভাষার উপর কিছু মন্তব্য ; তিনি খুব তীব্র ভাষায় তাঁর মতকে উপস্থাপিত করে অসমীয়া ভাষার স্বপক্ষে লেখেন এবং দেশের অসমীয়া ভাষাকে শাসন কার্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। ১৮৪৯ সালে শিবসাগরের ব্যাপটিস্ট মিশন এটিকে প্রকাশ করেন। ফুকনের অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে 'অসমীয়া লোরার মিত্র' (অসমীয়া বালক সহচর, ১৮৪৯) উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। যদিও ঐ রচনাগুলি সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না, তবুও তার ঐতিহাসিক মূল্য এই যে অসমীয়া সাহিত্যের বিবর্তনে ও বিকাশের পথে এগুলি এক একটি সোপান বিশেষ। জীবনের মধ্যগগনে তাঁর অকাল মৃত্যু একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিভার অবসান ঘটাল।

এর পরের অসমীয়া সাহিত্যিক যিনি সাহিত্যকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যান তাঁর নাম—গুণভিরাম বরুয়া (১৮৩৭-৯৫)। আনন্দরামের মতো গুণাভিরামও কলকাতায় শিক্ষালাভ করেন। তাঁর দুখানি সুপরিচিত পুস্তক হচ্ছে—'আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনর জীবনী' (১৮৮০) এবং 'অসম বুরুঞ্জী' (১৮৮৪); এই দুটি পুস্তকেই সুপরিকল্পিত ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করায় সেগুলি উত্তরসূরীদের কাছে আদর্শ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি যে জীবনী ও ইতিহাস লেখায় সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ এই দুটি পুস্তকের ছত্রে ছত্রে। গুণাভিরামের কৃতিত্ব এই যে তিনি যে যুগ বা মানুষের কথা লিখতেন, তার বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে বার করতেন, তার পরিবেশকে চেনবার চেষ্টা করতেন। তিনি বৈষ্ণবযুগের ধর্মপরায়ণ মহাত্মাদের জীবনী লেখার প্রথাটিকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তাঁর ইতিহাস রচনার মধ্যেও আধুনিক কালের ঐতিহ্য প্রবেশ করেছিল ; ইতিহাস শুধু রাজা, রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক বিষয় বর্ণনাই নয়, সেখানে ধর্মভাবনা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনারও বিভিন্ন প্রকাশের যথোচিত বর্ণনা ও বিচার থাকা চাই। তাঁর নিজের বর্ণনাগুলি চমৎকার, তাঁর ভাষা অতিরঞ্জিত বা বাগাড়ম্বর ভূষিত নয়, অথচ বর্ণাঢ্য ও সহজ এবং চিত্তরুচিকর। গুণাভিরাম 'অসমবন্ধু' (১৮৮৫) নামে একটি মাসিকপত্রেরও সম্পাদনা করতেন কলকাতা থেকে। এই মাসিকপত্রে তিনি আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। গুণাভিরামের

রচনার মাধ্যমে অসমীয়া গদ্যসাহিত্য সম্পূর্ণতা লাভ করে। অবশ্য তাঁর পূর্বে অন্য লেখকরা ও খ্রীষ্টান মিশনারীরা ধর্ম ও আধ্যাত্মিক আলোচনার বিষয় ছাড়াও অসমীয়া ভাষাকে অন্য ধরনের চেতনা প্রকাশের বাহন ও প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু গুণাভিরামের সময়েই এই মহৎ প্রেরণা স্থায়ী স্থান লাভ করে ও অসমীয়া সাহিত্য ও ভাষার এমন উৎকর্ষ সাধন হয় যে শুধু সাধারণ জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার বাহনই নয় তার শৈল্পিক চেতনাও প্রতীক হয়ে ওঠে। এতদিন পর্যন্ত যে ভাষার প্রধান কৃতিত্ব ছিল ধর্ম প্রচারের বাহন হিসেবে, তাই এখন শক্তি ও সৌন্দর্যের অস্ত্র হয়ে দাঁড়াল। তিনি তাঁর বন্ধুদের মধ্যে সাহিত্য চর্চার প্রবর্তন করেন, তাঁদের লিখবার জন্য উৎসাহ দিতেন এবং এই ভাবেই তিনি এক ফলপ্রসূ নব সাহিত্য জাগরণের মধ্যমণি-রূপে গৃহীত হন। তাঁর উচ্চমানের সাহিত্যিক প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব তাঁর সমসাময়িকদের কাছে তাঁকে যুগ সাহিত্যের অধিনায়ক পদেই বৃত করেছিল। তাঁর আবির্ভাব ইংরাজি সাহিত্যে জনসনের উপস্থিতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একজন দীপ্তিমান সাহিত্যধুরন্ধর ছিলেন হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩৫-৯৬), যাঁকে আধুনিক অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের জনক বলেই অভিহিত করা হয়। তিনি তাঁর আরব্ধ কাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শুধু পালনই করেননি, তাঁর মধ্যে ছিল সহযোগ শক্তি, কাজ করবার ক্ষমতা এবং অপরিসীম নিষ্ঠা। তাঁর 'গ্রামার অফ্ দি আসামীজ ল্যাংগুয়েজ' (১৮৫৬) এবং 'হেমকোষ' (অভিধান) প্রথম আধুনিককালের অসমীয়া ভাষা বিজ্ঞানের জন্মভিত্তি স্থাপন করে ও তার উত্তরোত্তর উন্নতির সূচনা করে, যাতে আমরা পাই শুধু একটি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যাকরণ প্রণালী নয়, শব্দবিন্যাস ও বচন গঠনের ও প্রয়োগের নির্দিষ্ট নিয়মাবলীও, যাতে ভাষার ও রচনার সৌকর্যে কোনো রকম ধোঁয়াটে বা অস্পষ্ট আভাস না আসে। 'হেমকোষ' অভিধান হিসেবে তাই আজও উচ্চস্থান অধিকার করে আছে। এর আরও বিশেষত্ব এই যে, এই অভিধানে শুধু বাক্যবিন্যাসের পন্থা বা রূপই দেখানো হয়নি, তার ইংরাজি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেও বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে যে শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ কি এবং কোথায়। তাঁর প্রণীত ব্যাকরণ ও অভিধান আজও ঐ জাতীয় প্রচলিত পুস্তকগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে।

হেমচন্দ্র বরুয়া শিবসাগরের একটি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তিনি ইংরাজি শিক্ষা করেন মিশনারীদের সাহায্যে ঘরে বসে গুপ্তভাবে। তিনি 'অরুণোদয়' পত্রিকার একজন বিশিষ্ট ও স্বনামধন্য লেখক। তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করেন স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করে যার মধ্যে 'আদিপাঠ' ও 'পাঠমালা' আজও সাবলীল অসমীয়া গদ্যরীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয়। তাঁর অন্য পুস্তকের মধ্যে 'বাহিরে রং চং ভিতরে কোডা ভাতুরি' (অর্থাৎ চকচক করলেই হয় না সোনা) এই ছোট্ট উপন্যাসে, সাহিত্যে ব্যঙ্গ এবং সমালোচনার একটা পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে। যদিও নিজে তিনি একজন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ছিলেন তবুও গোঁড়া হিন্দুয়ানির মুখোশ খুলে ফেলতে তাঁর দেরি হয়নি, এবং নানা ধরনের সামাজিক লোকাচার বা অনাচার অত্যাচারের উপর তীব্র কশাঘাত করতে তাঁর কোনো ত্রুটি ছিল না। তাঁর ঐ ছোট্ট উপন্যাসটিতে গোবর্ধন সত্রাধিকার নামে একজন হিন্দু মঠাধীশের চরিত্রচিত্রণ আছে, যিনি নামেই ধর্মগুরু কিন্তু যিনি নানা কু-অভ্যাস, নৈতিক কদাচার, পদস্খলন এবং ব্যভিচার অনাচারে জড়িত, এমন কি তিনি তাঁর এক হীন জাতীয় শিষ্যের যুবতী স্ত্রীর প্রতিও কামার্ত।

১৮৬১ সালে প্রকাশিত হল—কানিয়ার কীর্তন বা একটি সামাজিক কৌতুকচিত্র যাতে অহিফেন সেবনের কুফলগুলি দেখানো হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে এই ব্যঙ্গ কৌতুকচিত্রে তিনি ধর্মধ্বজ গোঁসাই ও মোহান্তদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছেন যারা তথাকথিত ধর্মের নামে এবং সেই অধিকারে নানা ধরনের নৈতিক কুকর্ম করতেন এবং কিভাবে তখনকার দিনের ব্রিটিশদের পিয়নরা পর্যন্ত তাদের প্রভুগর্বে মত্ত হয়ে অসমীয়ার বদলে হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করত এবং সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের প্রভুত্ব দেখাতে চেষ্টা করত। এই কৌতুকচিত্রটি পরিপূর্ণভাবেই বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের কশাঘাত। যদিও এর মধ্যে নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত ও বীর্যের কিছুটা অভাব আছে। এর শোষণমূলক কুসংস্কারগুলির প্রতি শ্লেষ ও আঘাত এবং সংগঠনমূলক বাক্যালাপ 'কানিয়ার কীর্তন'কে একটি উঁচু দরের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হিসেবে পরিচিত করেছে। এই পুস্তকটি সরকারের নিকট থেকে একটি পারিতোষিকও লাভ করে। অসমীয়া গদ্যসাহিত্যরীতির বিবর্তনে হেমচন্দ্র বরুয়া একটি বিশেষভাবে স্মরণীয় ও উন্নতমানের প্রভাব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কাব্য

প্রতীচীর শিক্ষা পদ্ধতির ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে জনগণের মানসিক পরিবর্তনের ফলে অসমীয়া পদ্য সাহিত্যও তার আকৃতি ও প্রকৃতিতে নবকলেবর ধারণ করতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েকটি দশকে এই নব উন্মেষের সূচনা লক্ষিত হয়। অসমীয়া সাহিত্য ইংলণ্ডের তথাকথিত রোমান্টিক পুনর্জাগরণের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এর ফলে অসমীয়া সাহিত্যে অভূতপূর্ব তরঙ্গস্রোত আসে, তা যেমন সমৃদ্ধ তেমনি ব্যঞ্জনাময়, তেজস্বী ও সজীব। পূর্বযুগের পুরাতনী সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তে ক্রমশঃই উদারদৃষ্টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং প্রথাবদ্ধতার পরিবর্তে নূতন ধারা-বৈচিত্র্য দেখা দেয়। ভাব, ভাষা, ছন্দ, বাক্যযোজনার রীতিনীতি, কল্পনার প্রসার সবই নতুনভাবে কাব্যজগতে নব নব সুর ও স্বর উন্মোচিত করে এবং পশ্চিমের প্রতিক্রিয়ায় এক নবজাগ্রত জগতের স্বপ্নে ভরপুর হয়ে অসমীয়া সাহিত্য নব নব রূপায়ণে বিভোর হয়ে ওঠে, যেখানে আশার শেষ নেই এবং আদর্শের আছে আকাশচুম্বী অবলম্বন। এই নব কাব্যের যুগের কবিরা শুধু রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতার জয়গানই গাইলেন না, সবরকম সামাজিক ও ধর্মগত বাধানিষেধেরও অবসান চাইলেন, বিশেষ করে মানুষের জয়গান, ব্যক্তির মহিমাগীত ও সমস্ত জাতির একতার সুর ধ্বনিত হতে লাগল তাঁদের কাব্যে।

অন্যসব ভারতীয় ভাষাতেও যেমন, অসমীয়াতে তেমনি কাব্যের মাধ্যমই ছিল ভাবপ্রকাশের প্রথম সূত্র। এইজন্য এটা কিছুই আশ্চর্যের কথা নয় যে রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর প্রথম অভিব্যক্তি এই পদ্যসাহিত্যেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করবে। একজন আধুনিক কবির মন্তব্য এইরূপ—'আমাদের জীবন যাত্রা ক্রমশঃই জটিল হচ্ছে তার চাপে আমরা ভারাক্রান্ত, আমরা বহির্জগতে যা আপাতদৃশ্য তা নিয়েই ব্যস্ত আছি ও নিজেদের গঞ্জনা দিই; উদ্বেগ ও ভয়ে জর জর হই, বিক্ষিপ্ত চিন্তায় ও চেতনায় অভিভূত হয়ে পড়ি এবং কাব্যের

দানকে যথার্থ মূল্য দিই না কিন্তু এরই প্রভাবে আবার আমাদের ক্লান্ত শ্রান্ত মন তার সরলতা ও গাম্ভীর্য ফিরে পায়, দুঃখের জড়তা চূর্ণ হয়, যেমন বৃষ্টিপাতের পর বৃক্ষরাজির প্রস্ফুটিত পুষ্পদলের নবীন শোভা ও মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়, তেমনি আমরাও দৃশ্যজগতের পিছনে অদৃশ্যশক্তির গরিমা উপলব্ধি করি।' এই বক্তব্য আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ ইংলণ্ডের রোমান্টিক পুনর্জাগরণ ও তার প্রভাব অসমীয়া সাহিত্যের উন্নয়নে বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। নিরাবিল সৌন্দর্যবোধ বা প্রেম এই যুগের অসমীয়া কবিদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ও ভাববিলাসকে যথাযথভাবে বর্ণনায় সাহায্য করেছিল। এ ছাড়া প্রাচীন পুরাতত্ত্বের প্রতি মমতা অসমীয়া কবিদের স্মরণ করিয়ে দিত তাদের জাতীয় সম্পদ ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে।

এই ভাবপ্রবণতার একজন বিদগ্ধ কবি ছিলেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৮৫৮-১৯৩৬)। কমলাকান্তের কাব্যে আমরা ত্রিমূর্তির দর্শন পাই, স্বাদেশিক দার্শনিক এবং সমাজ সংস্কারক কবি-মনীষীকে। অসমীয়া সাহিত্যের উদার প্রাঙ্গণে তিনিই প্রথম স্বদেশ আত্মার যজ্ঞহোতা এবং স্বদেশপ্রীতির ও গীতার ভাববন্যার উদ্গাতা। তাঁর উদাত্ত আহ্বান শুধু দেশের প্রাচীন শৌর্যবীর্য কাহিনীর পরিবেশনই নয়, বরং তার থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে বর্তমানের সমস্যা-সঙ্কুল দিনেও প্রতীচ্য জাতিদের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করে। উজ্জীবনের প্রয়াস তিনি গ্যারিবল্ডি ও ম্যাজিনি দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন।

শত শত ম্যাজিনি লইবে জন্ম
এই সব পরিত্যক্ত প্রস্তর ভূমি হতে
গ্যারিবল্ডি শত শত দিবে যোগ যে তাদের সাথে
ভারতে মৃত্তিকায় জ্বলিবে আবার নব দীপালিকা
জ্যোতির মালিকা।

কমলাকান্তের কবিতাবলীর দুটি সংগ্রহ, একটি 'চিন্তানল' (১৯০৯) আর একটি 'চিন্তাতরঙ্গিনী'। স্বাধীনতাহীনতার অশুভ প্রত্যয় এবং তার অভাবে দেশের মধ্যে নানা দুর্দম প্রতিক্রিয়া তাঁকে শুধু বিচলিতই করে নি, ভাষায় সজোরে ও উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করতেও অনুপ্রাণিত করেছিল। কবি বারবার তাঁর স্বদেশ-বাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তারাই দেশের পরাধীনতার দুর্গতির

জন্য দায়ী—দেশ ত পূর্বের মতো তেমনি সুন্দর, সুজলা, সুফলা আছে। চিন্তানলের কতকগুলি কবিতা যেমন উদ্গানি (একটি আশ্বাসের বাণী), 'পূর্ণিমার রাতি নেই', (পূর্ণিমার শুভ্র রজনী দেখে), 'এই নো আসাম নহয়নে শ্মশান' (এই আসাম কি শ্মশান হয়ে যায়নি) এবং 'জাতীয় গৌরব' প্রভৃতি গাথাগুলি দুই ধরনের চিত্র তুলে ধরতে ব্যস্ত—একটি গৌরবময় অতীতের স্বর্ণযুগ আর একটি তাঁর কবিতাগুলি যেন সুগন্ধি পুষ্পদলের সৌরভ ছড়ায় এবং যুগপৎ স্বাধীনতার ও জাতীয়তার আদর্শবাদ, জীবনের নব মুল্যায়ণ এবং উপনিষদের আত্মিক সন্দেশ বহন করে নিয়ে আসে। তিনি নিজেকে ভারতীয় আখ্যা দিতে গর্ব অনুভব করতেন এবং এই গর্বের রসমাধুর্যই তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ-মাতানো গীতগুলির উৎস এবং শক্তি। তিনি আসামের পূর্ব গরিমায় একজন সচেতন কবি ছিলেন।

তাঁর 'পহরিণী' (ভোলা মন) কবিতায় কবি আসামের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যের নানা দিকের বর্ণনা করে বলেন যে এখন তা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে গেছে এবং সেগুলিকে কি ভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যায় এবং কি ভাবে দেশে নতুন ভাবাদর্শ এনে তাকে জাতিসংঘের মধ্যে, গৌরবের সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। কমলাকান্তের এই সব স্বদেশানুরাগের কবিতাগুচ্ছ ভবিষ্যৎ বংশীয় তরুণদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল এবং তারা সেই উজ্জ্বল অতীত কাহিনীর অর্ণবে ডুব দিয়ে বা সমৃদ্ধ খনি খুঁড়ে রত্নমাণিক্য সংগ্রহে উদবুদ্ধ হয়েছিল।

'হিমালয়ের প্রতি সম্বোধন' (১৯১৯) নামক কবিতাতে কবি ঐ মহান গিরিবরকে সম্বোধন করে ভারতের প্রাচীনকালের অতি গৌরবময় দিনগুলির কথা স্মরণে আনেন। এই কবিতায় তাঁর বলবার ভঙ্গি নিবিড়ভাবে কল্পনাশ্রয়ী ও মনোরঞ্জনকারী। এটি কথোপকথনের ভঙ্গিতে প্রাচীন যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের তুলনা করে আজকের বিফলতার চিত্র বর্ণনা। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণরা সত্যিকার বিদ্যাবত্তার ও আলোকের সন্ধানী ছিলেন, ক্ষত্রিয়রা শাসনকার্যে নিযুক্ত থেকে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতেন, দেশকে রক্ষা করতেন, বৈশ্যদের কাজ ছিল ব্যবসায় ও শিল্পোন্নতির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধির কাজে ব্রতী হওয়া; কিন্তু আজকাল সকলেই সেই মহান আদর্শ থেকে, কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন—ফলে দেশে শুধু অজ্ঞান তিমিরান্ধতাই আসেনি, দেশ ঘোর অনাচারে ও অসন্তোষে মগ্ন, এবং দুঃখের ও কষ্টের সীমা

নেই—দিশাহারা জীবনে সকলেই যেন পথভ্রান্ত পথিকের দল। কবি কিন্তু বিশ্বাস করেন যে আবার শুভদিন ফিরে আসবে, অনাগত দিনগুলি হবে সমুজ্জ্বল এবং কবি সেই স্বরেই তাঁর গান শেষ করেন—

ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছে যে নবীন পৃথিবী, তার হবে জয়
হিংসাদ্বেষ, প্রেমের প্রণতির কাছে নিশ্চয়ই পাবে লয়
শান্তির বাণী আসবে ধরিত্রীতে, নাই নাই সংশয়

কমলাকান্ত ছিলেন ভাবপ্রবণ অগ্নিবর্ষী কবি এবং তাঁর কবিতাগুলি অসমীয়া জনসাধারণকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করেছিল, তাদের সীমিত জীবনপটের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে সমর্থ হয়েছিল এবং উন্নতির একটি অগ্রসর চেতনার দ্বার খুলে দিয়েছিল। কমলাকান্ত যদিও একজন সতেজ ভাবুক কবি ছিলেন, তবু তাঁর ছন্দ স্বর, স্বচ্ছন্দ, চাকচিক্যময় বা নিয়মানুগ ছিল না। কবি হিসাবে তাঁকে খুব সুমার্জিত কবি বলা চলে না। ভাবে ভাষায় শৈথিল্য ও পরিপূর্ণতার অভাবও লক্ষ্য করা যায়।

ভোলানাথ দাস (১৮৫৮-১৯২৯) আর একজন আধুনিক যুগের প্রথম দিকের কবি যাঁর 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (ভাবের ঢেউ) কাব্যে বেশ কয়েকটি আগ্রহশীল ও উচ্চমানের কবিতা পাওয়া যায়। তিনিই সর্বপ্রথমে রামায়ণের উপর অমিত্রাক্ষর ছন্দে অসমীয়া মহাকাব্য রচনা করেন—নাম 'সীতাহরণ কাব্য' (১৮৮৮)। এর উপর মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। তাঁর কাব্যরচনার রীতি ও প্রকরণ শুধু সংস্কৃতমুখাপেক্ষী নয়, বরং সংস্কৃত শব্দ, বচনবিন্যাস ও ব্যঞ্জনার সঙ্গে মধ্যযুগীয় অসমীয়া ভাব ও ভাষার সংমিশ্রণও বটে। ফলে তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টা সুনিষ্ঠ ও সহজ হয়ে উঠতে পারে নি। অবশ্য মাঝে মাঝে কবি গুরুগম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় বাক্যালাপে মুখর হয়ে ওঠেন এবং সেই পদ্ধতিতে লেখনীর দোষত্রুটি অনেকটা চাপা পড়ে। তাছাড়া তাঁর লেখায় যথেষ্ট সারবত্তা থাকায় সেগুলি স্মরণীয় হয়েছে। সূর্পনখার চরিত্রচিত্রণ ও কৃতকর্মাদির বিবরণ দিতে গিয়ে কবি স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য করেছেন যেগুলি সুখপাঠ্য।

এই বিপুলা পৃথ্বীতে কে আছে যে বলতে পারে
যে স্ত্রীজাতির মনকে সে জেনেছে

তাদের চিত্তের বিত্ত এতই শক্ত যে সেখানে
ভ্রমররাও মধু পায় না
পদ্মমুখী সুন্দরীরা জ্যোতি বিকিরণ করে
তাদের তমসাচ্ছন্ন মনকে গোপন রাখতে।
যেমন আগুন জ্বলে, আলোকও দেয়, অথচ
তার ভিতর আছে এক অন্ধকারের কারাবরণ।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৮৬৮-১৯৩৮) অবিসংবাদিতভাবে এই যুগের অসমীয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি শুধু একজন কৃতী কবিই নন, গুণী প্রবন্ধ লেখক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক। তাঁর হাতে অসমীয়া কাব্যধারা তথা-কথিত ঐতিহ্যের সব বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে জয়যাত্রায় বের হয়েছে। তিনি নব নব দ্যোতনায় অসমীয়া কাব্যসাহিত্যকে রমণীয় বরণীয় করেন এবং নূতনভাবে ভাবনায় চেতনায় ও উপকরণে প্রকরণে অসমীয়া সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করেন। তিনি চমৎকার প্রেমকাব্য, নিসর্গগাথা এবং কথা ও কাহিনীর রচয়িতা। তিনি কবিচেতনার দিক থেকে অসমীয়া সাহিত্যকে দুই মেরুতেই স্পর্শ করেছেন। গভীর দুঃখ কষ্ট বেদনার মধ্যে যে সুখের বিনাশ নেই এবং রূপ ও রস, রং ও শব্দের যুগল ব্যঞ্জনায় বিশ্বের দরবারে সুন্দরের যে প্রেরণা আসে তার আভাস মেলে তাঁর লেখায়। তাঁর স্বাদেশিক প্রীতিব্যঞ্জক গান ও কবিতাগুলি, যেমন 'আমার জন্মভূমি' 'মোর দেশ', 'অসম সংগীত' এবং 'বীণ-বরাগী'তে পাই অসমীয়া সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর সুগভীর প্রীতি, যা তিনি কবিজনোচিত গভীর প্রতীতিতে ব্যক্ত করেছেন কাব্যসুষমায় মণ্ডিত করে এবং তাতেই প্রকাশ পেয়েছে সুগভীর বেদনাবোধের সঙ্গে মহৎ ইচ্ছা যে দেশ আবার জাগ্রত হোক এবং ভারত আবার ফিরে পাক তার লুপ্ত ও সুপ্ত মহত্ত্ব ও জাতীয় উত্তরাধিকার। প্রাচীনকে নিয়ে এই ভাবাতিশয্য ও সেইদিকে তাঁর তন্ময়চিত্তই তাঁকে জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করে। একথা সত্য যে লক্ষ্মীনাথের স্বাদেশিক কবিতা-গুলি স্বদেশীযুগে অসমীয়াদের মনে সাহস, বিশ্বাস, নিজেদের কৃতকর্মের প্রতি অটুট আস্থা ও শক্তির প্রেরণা দিয়েছিল, জাতীয় আন্দোলনকে সুষমামণ্ডিত করেছিল এবং অত্যাচারিত নিপীড়িত জনসাধারণকে তাদের শেষ স্বাধীনতা যুদ্ধে আহ্বান করেছিল। তাঁর গান 'ও মোর আপন দেশ, ও মোর সুন্দর দেশ' সত্যিই আসামের জাতীয় সংগীতের মর্যাদার অধিকারী।

আসাম বহুজাতি ও উপজাতির মিলন ভূমি, বহু সংস্কৃতির মিশ্রণ ক্ষেত্র এবং তাদের সম্মিলিত ঐতিহ্যের নানা রূপরেখা ও পদচিহ্ন এর পথে পথে—তার দৃষ্টান্ত লোকসাহিত্যে ছত্রে ছত্রে। বহুতারের ঝংকারের একটি বিশেষ ভাণ্ডার বলেই সাহিত্যপ্রয়াসী মানুষরা এই বহুর পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে স্নান সেরে উৎসুক নেত্রে চেয়ে আছেন এক অতীন্দ্রিয় আবেশে। লক্ষ্মীনাথ শুধু প্রাচীন কালের পদ্য ছাড়া, গ্রাম্যগীতি বা কাহিনীই সংগ্রহ করেন নি, তিনি এইসব রসভাণ্ডার থেকে রূপরসঐশ্বর্য আহরণ করে তাঁর কাব্যভাণ্ডারকেও সুগঠিত ও সুসমঞ্জস করেছেন—তাঁর পূর্বসূরীদের চিন্তা, চেতনা, কল্পনা, স্বপ্ন, প্রেরণাকে আত্মসাৎ করে যুগোপযোগী করে পুনর্জীবিত করে সমাজে প্রচলিত করেন সুকৌশলে। তাঁর ছিল চিত্রশিল্পীর চক্ষু এবং সমঝদার গায়কের কর্ণ। তাঁর 'নিমাতি কন্যা' (বোবা বউ) একটি কথার ফুলঝুরি ও ছবি। 'ধানবর আরু রতনি' একটি গ্রাম্য তরুণ-তরুণীর প্রেমের অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি ও সরস আখ্যান। 'কিযানো আনিলি মানে ঐ বদন তাই' একটি গুরুগম্ভীর গ্রাম্য কবিতা যা বদন বরফুকনের দেশদ্রোহিতার কথা প্রচার করে, কারণ তিনিই আহোমরাজের মন্ত্রী থাকাকালীন ১৮১৬ সালে বর্মীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আসাম আক্রমণের ব্যবস্থাপনা করেন—দুঃখ, বেদনা, তিক্ততা, নৈরাশ্যের এক দুরপনের কলঙ্কের কাহিনী।

পদ্মনাথ গোহাঁইবরুয়াও কতকগুলি ভাবব্যঞ্জক কবিতা লেখেন এবং তাঁর 'ফুলের চানেকি' (ফুলের উদাহরণ) কতকগুলি প্রকৃতি বর্ণনা বিষয়ক কবিতার গুচ্ছ। প্রকৃতির নীরব গাম্ভীর্যে কবি মুগ্ধ। জেরাল্ড ম্যানলি হপকিন্স বলেছেন —এই বসুন্ধরা ভগবানের মহিমায় পূর্ণ এবং সব দিকেই বিস্তৃত ও দ্রষ্টব্য—মানুষ যখনই সেই বিশ্বরূপের দর্শন পায় তখনই "বিস্ময়ে তার জেগে ওঠে প্রাণ"। বিদ্যুতের তার থেকে যেন আলো বিচ্ছুরিত হয় সর্বত্র। গোহাঁইবরুয়াও সেই কথাই বলেন এবং তাঁর কাব্যে এই ভাবই ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত যে প্রকৃতির সব দানই বিশ্বপিতার দান। সবিতা, বৃক্ষতরুলতা সকলেই তাঁর জয়গান গায়। এই ভাবের অণুবীক্ষণে তাঁর কবিতা 'কর্তব্য' স্মরণীয়। 'উষা' নামক কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে উষার মিলনের ফলেই দিনের জন্ম ও নবজীবনের সূচনা, এই ভাবের দ্যোতনা মেলে। গোহাঁইবরুয়ার বাক্যচয়ন একেবারে দেশজ, মাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তিনি ঘোরতর ভাবে প্রাচীন অসমীয়ারূপকেই তার কাব্য-

লক্ষ্মীর আসন দান করেছেন। তাঁর 'লীলা' কাব্যটি একটি আত্মজীবনীমূলক অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত কবিতা যা তাঁর গার্হস্থ্য জীবনমূলক আনন্দের পরিবেশকেই কাব্যে প্রকাশ করে। কবিতাটিতে আসামের বহু নিসর্গদৃশ্যের ছবি ও চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়।

চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (১৮৬৭-১৯৩৮) আর এক ভক্ত পূজারী, যিনি সৌন্দর্যদেবীর বেদীতে অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। তাঁর কাব্য তাঁর তপ্ত সহানুভূতিশীল এবং করুণ অন্তঃকরণেরই প্রতীক হয়ে রূপ নিয়েছে কাব্যের অজস্র ধারায় যেখানে আমরা পাই বেঁচে থাকার আনন্দের স্বাদ, যার প্রত্যাশা সুখের, সুদিনের। তিনি গতানুগতিকভাবে কাব্য রচনা করেন নি এবং সেখানে কিছু নতুন রীতিনীতির প্রবর্তন করেন। সেকালের কবিরা সুখকে কল্পনা করতেন মৃত্যুর পরপারে অমৃত রাজ্যে, এখনকার কবিরা তাঁকে আবিষ্কার করলেন প্রকৃতির হৃদয় কন্দরে। চন্দ্রকুমার আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন এবং প্রমাণ করলেন যে মানুষের সুখ, স্নেহ প্রীতি ভালোবাসায় ও আত্মার আত্মীয়তাতেও আছে। তাঁর কাব্যে 'প্রতিমা' সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতিবর্ণনার কয়েকটি বিদগ্ধ ছবি—যেমন সন্ধ্যা, প্রকৃতি, নিয়ার (শিশির কণা) প্রভৃতি। এইসব কবিতায় কবি প্রকৃতিকে এক রহস্যময়ী ও ভীতি-উৎপাদিনী ভয়ংকরী শক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন এবং মানবমনের সেই ভীতিসংকুল চিন্তাজগতেই কিভাবে এইসব ভাবের প্রভাব বিস্তৃত হয় তাই দেখিয়েছেন। ভাবগ্রাহী রোমান্টিক ঐতিহ্যের অনুসরণে তিনি লোকগাথার দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। যার প্রভাবে তাঁর কাব্য প্রতিভা বাল্য ও যৌবনে বর্ধিত হয়েছিল। তাঁর বণকুন্তারী (যে অপ্সরী বনের বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী) 'জলকুন্তারী' (সমুদ্রের অপ্সরী), 'তেজী মলা' (লতা অপ্সরী) ও অন্য কবিতাগুলিতে আমরা অতি প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর এবং তার বর্ণনায় অপূর্ব লিপিকুশলতার ও সৌন্দর্যের আভাস পাই। তাঁর কাব্যরচনার এই একটি দিককে বলা যেতে পারে সৌন্দর্যে কুহকে ভরা 'কেলটিক্' স্পর্শ যার মনোহর প্রসাদগুণে কবিতাগুলিকে মনে হয় যেন কোন রহস্যে আবৃত। তাঁর কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি সবার উপরে মানুষ সত্য এই মন্ত্রটিকে যেন জপমালা করেছিলেন এবং মানুষে মানুষে প্রভেদ তিনি দেখতেন না। এই মানবমহত্ত্বের দর্শনের জন্য তিনি ফরাসী দার্শনিক অগস্ত কোঁতের কাছে ঋণী। তাঁর কবিতা 'বীণ-বরগী'তে (বীণা

বাদক) তিনি মানবতার গৌরবের জয়গান গাইছেন। তিনি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সব স্তরেই সৌন্দর্য ও সত্যের সত্তার অনুভব পাচ্ছেন। এই দুঃখকষ্টের সংসারে মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য সম্বন্ধই তাই প্রেমে ভালোবাসায়, স্নেহে প্রীতিতে। কবি চান এই দুঃখের পৃথিবীকে, আমাদের কষ্টময় সংসারকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করতে—এই ধরিত্রীর ধূলিমলিন জীবনের সব ক্লেদকে মুছে ফেলে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে।

আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা (১৮৭৪-১৯৪০) কতকগুলি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ করেন, যা পড়ে মনে হয় না যে সেগুলি ভাষান্তর মাত্র, অর্থাৎ সেগুলি স্বকীয় মৌলিকতায়ও উজ্জ্বল। তিনি লোকসাহিত্য থেকে সংগ্রহ করা কতকগুলি গল্প নিয়েও আখ্যানকাব্য রচনা করেছেন।

হিতেশ্বর বরবরুয়া (১৮৭৬-১৯৩৯) অমিত্রাক্ষর ছন্দে দীর্ঘ আখ্যান কবিতা এবং ইংরেজি রীতি অনুসারে কতকগুলি চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট লিখেছেন। তাঁর সর্ব প্রথম সংকলন 'ধোপাকলি' (মুকুল, ১৯০২)। এটি তাঁর প্রথম যৌবনে রচিত কবিতা সঞ্চয়ন। তাঁর সুদীর্ঘ কাব্য 'কামতাপুর ধ্বংস আরু বিরহিণী বিলাপ কাব্য' (কামতাপুরের পতন এবং বিরহজর্জর প্রেমিক-প্রেমিকার বিলাপ) ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়। ঐ আখ্যাটির মূল অংশ মধ্যযুগের অসমীয়া ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। এতে বর্ণিত হয়েছে যে প্রাচীন কামতাপুর (যা এখনকার কুচবিহারের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল) কিভাবে রাজা নীলাম্বরের সময়ে তাঁরই মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে গৌড়ের নবাব কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পনেরটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই কাব্যটি প্রায় নাটকীয়। তাঁর আর একটি ঐতিহাসিক কাব্য 'তিরোতার আত্মদান' (একটি মহিলার আত্মদান), যাতে বিখ্যাত আহোম রাজমহিষী জয়মতীর আত্মসমর্পণের কথা লিপিবদ্ধ আছে। জয়মতীকে লার-রাজা যুদ্ধের সময় বন্দী করেন ও তাঁর স্বামীর আশ্রয়স্থান কোথায় তার সংবাদ জানবার জন্য উৎপীড়ন করেন। কিন্তু রানী অচলা অটলা, নিজেকে লোপ করবেন কিন্তু স্বামীর সন্ধান শত্রুকে দেবেন না, এই পণে ধীরে ধীরে সরোবরে নিমজ্জিত হয়ে দেশের জন্য আত্মাহুতি দেন। কবি যদিও ঐসব চিত্রগুলির বিশেষ পরিবর্তন করেন নি, তবু তাঁর কল্পনা যেখানেই সুবিধা ও সুযোগ পেয়েছে সেখানেই মুখর ও উদ্দাম হয়ে উঠেছে। আর কবি মাঝে মাঝে মূল গল্পের স্রোতকে স্তিমিত করে কিন্তু ঘটনাবলীর

রূপান্তর না ঘটিয়ে অশ্রু, শিশিরবিন্দু, নিদ্রা প্রভৃতির উচ্ছ্বাসভরা উক্তি এমন-ভাবে যুক্ত করে দিয়েছিলেন যে সেইগুলি এক-একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ উপভোগ্য এবং প্রায় অদৃষ্টপূর্ব কাব্যে পরিণত হয়েছে।

'যুদ্ধ ক্ষেত্রেও আহোম রমণী বা মূলা গাভরু' (যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহোম বীর রমণী বা মূলা গাভরুর কাহিনী) বরবরুয়ার একটি দীর্ঘ আখ্যান কাব্য। ১৫৩২ এবং ১৫৩৩ সালে মুঘলদের ষষ্ঠ ও সপ্তম অভিযানকালে ঐ অসমীয়া বীর নারী 'মূলা' সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং মুঘলদের সঙ্গে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেন ও তাদের দুইজন সেনাপতিকে নিহত করে তাঁর স্বামীহত্যার প্রতিশোধ নেন।

মূলাও পরে রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন দেন। এই কাব্যে স্বদেশের জন্য আত্মনিবেদনের একটি গভীর আবেদন আছে যা অসমীয়া সাহিত্যে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে উঠেছে।

স্বদেশের জন্য রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ যুদ্ধে প্রাণ দেন যিনি
তিনি করেন অমরত্বলাভ মৃত্যু করে যোড়পাণি
তাঁর কাছে সেই মরণ-বরণ নয় সংগ্রাম অবিরাম
পরিপূর্ণ বিশ্রামের স্থান বিশ্বমাতার কোলে নয়নাভিরাম
তাঁর কাছে অগ্নি হারায়েছে তেজ ও দীপ্তি
যেন মদির চন্দ্রালোকে পৃথ্বীর সুষুপ্তি
মৃত্তিকার শয্যা যেন বিকশিত ফুলদলের আসন
শাণিত অস্ত্রগুলি যেন পর্জন্যধারার স্নেহসিক্ত শাসন

তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য পঠন-পাঠন করে ঐ সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং সেই সাহিত্য তাঁকে প্রভাবান্বিতও করেছিল। তাঁর 'অঞ্জলি' কাব্য গোল্ডস্মিথের 'ভাইকার অফ্ ওয়েকফিল্ড'-এর অনুসরণে লেখা। শেক্সপিয়রের 'ওথেলো' তাঁকে 'ডেসডেমোনা' কাব্য লিখতে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর রচনার মধ্যে আমরা মাঝে মাঝে বিখ্যাত ইউরোপীয় সাহিত্য রসিকদের দীর্ঘ উদ্ধৃতি পাই। তাঁর 'আভাস' (১৯১৪) একুশটি সুললিত কবিতার সঞ্চয়িতা যাতে পৃথিবীর নানা দেশের নানাভাবে প্রসিদ্ধা রমণীদের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে যেমন যশোদা, বোয়াডিসিয়া, জোয়ান অফ্ আর্ক প্রভৃতি।

তাঁর 'মালক' (১৯১৮) নামক কাব্যগ্রন্থটি ১২৮টি সনেটের সংকলন।

অসমীয়া সাহিত্যে সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার এই প্রথম প্রয়াস। এই ক্ষুদ্র সংকলনের অল্প পরিসরে বিষয় বস্তুর গুরুত্ব এবং বিরাটত্ব লক্ষণীয়। এতে ঈশ্বর, কল্পনা, ইহকাল, স্বপন প্রভৃতি মানবিক অনুভূতির উপর কবিতা তো আছেই, আবার শেক্সপিয়র, কালিদাস, শংকরদেব, শকুন্তলা, মিরাণ্ডা এবং অন্য বহু কল্পনা ও বাস্তব মিলিয়ে মানুষ ও বস্তুর প্রতি তাঁর উচ্ছ্বাসের নিদর্শনও আছে। বরবরুয়া জীবনে বহু মৃত্যু দেখেছেন এবং স্বভাবতই অশান্ত কবির মন চায় সেই পরম শান্তকে যাঁকে পেলে সব চাওয়া ও পাওয়াই সম্পূর্ণ ও সফল হয় এবং আত্মবোধের সুযোগ আসে।

কতকগুলি চতুর্দশপদী আশ্চর্য সুন্দর, যেমন যাতনা, ক্রন্দন, সান্ত্বনা এবং চকুলো (অশ্রুরাজি)।

চকুলো বা অশ্রুরাজি তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে লিখিত। এই কবিতাগুলি শোকতপ্ত পিতার অশ্রুরাজি। যদি সত্যিকারের কাব্যের উদ্দেশ্যই হয় যে পাঠক-পাঠিকা বা শ্রোতাদের তদ্ভাবে ভাবিত করা তাহলে এর চেয়ে সত্যিকার কাব্য আর নেই। ভাষায় এমন কিছু আছে যা সত্যিই চোখের জল টেনে আনে। 'চকুলো' এই উপাধিটিও সমন্বয়সূচক। এই প্রসঙ্গেই কবি এর সঙ্গে আরও কতকগুলি মরণস্মৃতি-জাতীয় কবিতা সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন যাতে শুধু পিতার সন্তান-বিয়োগ বিধুর ব্যথারই প্রকাশ মূর্ত হয়নি, জীবন-মৃত্যু, আত্মা, স্বর্গ প্রভৃতি প্রশ্নেরও বিচার এবং আলোচনা আছে। এই পর্যায়ের লেখাগুলিতে তিনি বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে চলে গিয়ে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হয়ে গিয়েছেন।

প্রাচীন আহোম রাজবংশের সন্তান হিতেশ্বর বরুয়া (১৮৭৬-১৯৩৯) আহোম ইতিহাসের প্রাণবন্ত অধ্যায়ের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন, এইগুলি তাঁর 'আহোমের দিন' কাব্যে সংগৃহীত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই রচনাগুলি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নি। তাঁর 'মালিতা' নামে উপন্যাসও সেই উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। এতে বহু কল্পনার রঙে রঙিন হয়ে আহোম সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কাহিনী লিপিবদ্ধ।

সনেট বা চতুর্দশী কবিতার লেখক হিসেবে দুর্গেশ্বর শর্মারও অসমীয়া সাহিত্যে প্রচুর খ্যাতি আছে। তাঁর সনেট ও অন্য কবিতাগুলি দুটি সংকলনে সংগৃহীত—অঞ্জলি ও নিবেদন। নীতি ও ধর্মে সবিশেষ অনুরাগী এবং উচ্চ ও

মহৎ চিন্তায় বিশ্বাসী দুর্গেশ্বর শর্মা ইহজীবনের ক্ষণিকতা ও ভাগবতী শক্তির সম্বন্ধে তাঁর পাঠকদের অভিভূত করেছেন।

আবার তাঁর অনেকগুলি কবিতাতে ইন্দ্রিয়জ কামনার এষণাও দেখি এবং নিভৃত অরণ্যবাসী তরুণ ও তরুণীদের প্রেমবিলাসের নানা চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন এবং বহিঃপ্রকৃতির বিভিন্ন রূপের চিত্র এঁকেছেন। তাঁর লেখাগুলি ছবির রেখার মতো ফুটে উঠেছে ; এবং স্বরে ও সুরে অপরূপ সংগীতের ঝংকার আনে। দুর্গেশ্বর শর্মার কবিতাগুলি ইংরেজি সাহিত্যের 'লেক কবি'দের স্মরণ করিয়ে দেয়।

চন্দ্রধর বড়ুয়া (১৮৭৪—১৯৬১) রোমান্টিক মানসিকতার প্রথম পুরোহিতদের একজন কিন্তু তাঁর সুনাম নির্ভর করে তাঁর কাব্যের চেয়ে নাটকের উপর বেশি। তাঁর 'রঞ্জন' নামে কবিতা সংগ্রহটি শুধু প্রেম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে লেখা কবিতা সংগ্রহই নয়, সেখানে অপেক্ষাকৃত লঘু সুরে লেখা হাস্যরসোদ্দীপক কাব্যগাথাও আছে। তাঁর 'স্মৃতি' কাব্যটি একটি উল্লেখযোগ্য রচনা, যেখানে কবির ভাবনা-চেতনার পিছনে আছে স্বয়ং প্রকৃতির পটভূমিকা, সেখানে প্রেম ও অন্যভাবরাজি সুষ্ঠুভাবে পরিস্ফুট। এখানে কবি এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে প্রকৃতির অমৃত স্পর্শের মধ্যে তাঁর মৃত প্রেমিকার পরশ পাওয়া যায়। তাঁর ধারণা যে এই চঞ্চল ও স্বল্পস্থায়ী জীবনে স্মৃতিই একমাত্র সম্বল এবং তার পূর্ণরূপ পাওয়া যায় প্রকৃতির ছায়ায় ও প্রশ্রয়ে।

রঘুনাথ চৌধুরীকে (১৮৭৯—১৯৬৮) বলা হয় অসমীয়া সাহিত্যের পক্ষী কবি। তাঁর সর্বপ্রথম কাব্য সংগ্রহ 'সাদরি'তে (প্রিয়তম) তাঁর অসাধারণ পক্ষীপ্রীতি আর উদ্যান তরুলতা-ফুলের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়। এর পরে তিনি দুটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন, তবে একসঙ্গে প্রকাশ করেন নি—নাম 'কেতকী' (ভারতীয় নাইটিঙ্গেল) ও 'দহি-কতরা' (শেষ পুচ্ছ)। এই দুটি কাব্যেই কবির মনের পক্ষীতত্ত্ব প্রশংসনীয় কৃতিত্বের সঙ্গে লেখা ও ভবিষ্যৎদৃষ্টি সম্পন্ন। 'সাদরি' কাব্যে 'বহাগীর বিয়া' (বিহঙ্গীর বিবাহ), 'গোভান হে এবার মোর প্রিয় বিহঙ্গিনী' (হে মোর প্রিয়া বিহঙ্গিনী, গাও না একবার) এবং 'কেতকী চড়াই' প্রভৃতি লেখাগুলি অতি মনোমুগ্ধকরভাবে পক্ষীজীবনের ও উদ্ভিদ তরুলতার নানা চিত্র উদ্‌ঘাটিত করে। তিনি সামান্য প্রস্তর খণ্ডের মধ্যেও উপদেশাবলীর পাঠোদ্ধার করতেন এবং স্রোতস্বতী নদীর কলকল শব্দের মধ্যে

পুস্তকের বাণী লক্ষ্য করতেন। তাঁর প্রকৃতিবিষয়ক কাব্যগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রথমত যেখানে প্রকৃতির নিজস্ব রূপের মধ্যেই তার অপরূপ স্বরূপ প্রকাশ আর দ্বিতীয়ত যেখানে প্রকৃতিকে সম্মুখে রেখে মানবচেতনাকেই বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমটিতে প্রকৃতির প্রাচুর্যের রসসম্ভারে কবিমন নিমগ্ন ও বিভোর, দ্বিতীয়টিতে দেখি প্রকৃতি কিভাবে মানুষের মধ্যে কর্মস্পৃহা ও উদ্যম জাগিয়ে তোলে, তারই চিত্র। তাঁর 'বহাগীর বিয়া' প্রকৃতির নিজ উৎসবকে পুনরায় সৃষ্টি করে। বসন্তের কন্যা বহাগীর বিবাহ হবে, এই শুভকাজে তৃণগুল্মলতারা, তরুরাজি নব ফুলে ফলে সুসজ্জিত এবং পাখি ও কীটরা তাদের স্বরে স্বর মিলিয়ে অপরিসীম আনন্দে ও নৃত্যে মত্ত। কবি এইভাবে প্রকৃতির যা তাঁর ভালো লাগে তারই গুণকীর্তন করেছেন। 'কেতকী' কাব্যের মৌল সূত্রই হচ্ছে যে এই ধরিত্রীতে কেতকীর পুনরাগমনের সঙ্গে প্রকৃতিরও নব উন্মোচন হল। কেতকীর গান একটি অশরীরী আনন্দের ভাষ্য ও একটি পূর্ণতার সুর যা মানুষের অনধিগম্য। কবিতার আরম্ভ এইভাবে—একটা রহস্য ও অবাক লাগার ভঙ্গিতে এবং সেই প্রতীক পুস্তকের পাঁচটি অধ্যায়েই বর্তমান। প্রথম অধ্যায়ের বিহ্বলতা যখন শেষ হল, তখন পাখির গানের গূঢ় তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করছেন কবি। তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝেছেন যে এই দুঃখ ক্লেশ তাপ ঝঞ্ঝার পৃথিবীতে যদি একটু সুখ বা আনন্দের আভাস পাওয়া যায় সেটা ঐ পাখির গানেরই প্রতিধ্বনি ও ফল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে দেখি কতকগুলি অতি সুন্দর প্রেমের ও আনন্দের চিত্র এবং সেগুলি ঐ পাখির গানেই উজ্জীবিত এবং সেই গানগুলি মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যেন পাখির গানেরই প্রতিধ্বনি। এইসব চিত্রগুলি অসমীয়া জীবন ও প্রকৃতির অনুরাগ এবং সকলের চিত্ত হরণ করে।

তোমার কুহুধ্বনি শুনে ঐ যে লজ্জাবতী নববধূ
সেও তার বয়ন কার্য থামিয়ে শোনে
এবং ভুলে যায় যে তাঁত চালাচ্ছে
তন্ময় হয়ে শোনে কার গান
একই স্বর, একই সুর, একই ধ্বনি
কুমারী কন্যাকে করে পাগলিনী
এক অপূর্ব উন্মাদনায় ও আনন্দে নিমগনা

তার চরকা হয়ে যায় স্তব্ধ—
এবং সুতার গুলি যন্ত্র হতে পড়ে হয় নিঃশব্দ।

তৃতীয় অধ্যায়ে দেখি কবি চলে গেছেন সুদূর অতীতে, পৌরাণিক জগতের ইতিবৃত্তে—কিভাবে পক্ষীকণ্ঠের স্বর মদালসা শকুন্তলাকে কণ্বমুনির আশ্রমে, বিদর্ভের রাজকুমারী দময়ন্তীকে, শোণিতপুরের উষা দেবীকে, অলকার নব-পরিণীত যক্ষকে, গোকুলের গোপিনীদের চিত্ত উন্মথিত করত এবং সেই মধুর কণ্ঠ তাদের প্রিয় বিরহবিধুর করে তুলত—সবাই পাখির কলকাকলিতে মুগ্ধ। চতুর্থ অধ্যায়ে কবির জল্পনা-কল্পনা আরও অগ্রসর হয়েছে। পাখির সুমধুর কণ্ঠ কাকলি শুধু পূর্বকালের মানব-মানবীকেই প্রীতি ও আনন্দের শিহরণ এনে দেয় নি, সে সুর, সে স্বর, কালাতীত অর্থাৎ সর্বকালের, সর্বযুগের, সকলকে নিয়ে যে জীবনস্রোত বয়ে চলেছে উপরে ও নীচে, সর্ব প্রাণের ও সর্বপ্রাণীর মধ্যে। পাখির গানই মেঘের গুরুগর্জনে, বিদ্যুতের চমকে, গোপিনীদের নৃত্যে, যমুনার কলকল্লোলে, স্রোতের তরঙ্গ বিভঙ্গে। পঞ্চম অধ্যায়ে কবির মানসসঞ্জাত কল্পনার সৌধ ভেঙে পড়ে, পাখি কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কবিকে আবার ফিরে আসতে হয় বাস্তবের অতি কঠোর রূপের ও কুটিলতার জটিলতায়। কবিতাটি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ চক্র ঘুরে যেন ফিরে আসে প্রকৃতির বুকে যেখান থেকে তার প্রথম যাত্রা শুরু। ক্যাম্পবেল ও অন্যেরা ঠিকই বলেন যে এই ধরনের আবর্তনশীল চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান কবিতাগুলি সম্বন্ধে যথার্থ মন্তব্য হচ্ছে যে এসব রচনার জন্য শুধু কবির কল্পনাশক্তির বা ভাষা প্রয়োগের রীতি-জ্ঞানেরই প্রয়োজন নয়; বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যা প্রয়োগের অধিকারী হওয়ারও প্রয়োজন। ১৯১০ সালে 'দহি-কতরা' নামে একটি প্রেমকাব্য রচিত হয় যেখানে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা বা কামরসের কোনো উল্লেখ নেই। কবি এই পাখিকেই তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা ও প্রিয়তমা হিসেবে কল্পনা করেছেন। একথা বিশেষ করে স্মরণে রাখা কর্তব্য যে এই কবি আজন্মব্রহ্মচারী এবং নারী সংসর্গ করেন নি। প্রকৃতি, বিশেষত যখন সে ফুলে ফলে পল্লবে সুসজ্জিত হয়ে রূপে রসে সৌন্দর্যে বিকশিত হয়, তখন তাকে প্রিয়তমারূপে কল্পনা করা একটা পুরাতনী কাব্যিক রীতি। এই কবি সেই পথেরই পথিক, প্রকৃতির বদলে পাখিকেই তার প্রিয়তমা ও বল্লভা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাছাড়া এই পাখিটি কবিকে তাঁর অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বসন্তের অবসানে

ফুলদলও যে শুষ্ক বিশীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে; প্রকৃতির রাজ্যে এতো জানা কথা। রঘুনাথ চৌধুরী সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যিকদের মতো প্রকৃতিকে আশ্রয় করে সেই ধরনের তুলনা, উপমা প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন এবং বহুস্থানে সংস্কৃত গল্প, আখ্যান, উপমা, রূপ কল্প চিত্র গ্রহণ করেছেন। সংস্কৃত কবিদের মধ্যে কালিদাস তাঁর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন।

অম্বিকা গিরি রায়চৌধুরী (১৮৮৫—১৯৪৭) আজীবন স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এবং সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য যুদ্ধ করেছেন। একজন উচ্চস্তরের স্বদেশ-প্রেমিক, প্রগতিশীল সমাজসেবী ও অদম্যকর্মী অম্বিকা চরণ একজন সুপরিচিত সংগীতজ্ঞ, প্রখ্যাত বক্তা ও ক্ষমতাবান লেখক। দেশের জন্য ভালোবাসা তাঁর কাব্যের প্রতিটি ছত্রে অন্তঃস্রোতের মতো ভেসে চলেছে—তিনি চাইতেন, দেশ উত্তিষ্ঠিত হোক, জাগ্রত হোক, সামাজিক উন্নতিতে সফলকাম হোক। তিনি প্রায়ই নিজেকে একজন বিদ্রোহী বিপ্লবী বলে ঘোষণা করতেন। জাতীয় আন্দোলনের জন্য ক্রিয়াকর্মে যোগদানের জন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। তিনি দেশকে শুধু বিদেশীশাসন থেকে মুক্ত করতেই চাইতেন না, চাইতেন জাতিভেদ প্রথার অবসান এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অসম ব্যবহার, হিংসাদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, লোলুপতা, উচ্চাভিমান, নীচতা, স্বার্থপরতারও অবসান ;—যে সব ক্ষতগুলি জাতীয় জীবনকে দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয় করে, অর্থাৎ তিনি চাইতেন, লোভক্ষতিটানাটানি কলহ সংশয় আর নয় ; সেই ব্রতই ছিল তাঁর জীবনগীতা। তাঁর কবিতা 'ময়ি বিপ্লবী ময়িতাণ্ডবী' অর্থাৎ আমি শুধু বিপ্লবী নই, আমি নবসৃষ্টির জন্য সব অশুভ অকল্যাণকে ভেঙে, পদদলিত করে শিবের মতো তাণ্ডবনৃত্য করি। এই বারতাই তাঁর বিপ্লবের, বিদ্রোহের বারতা। শূন্যগর্ভ বচনসর্বস্ব ও অসাধু ক্রিয়া কলাপকে তিনি দোষারোপ করেছেন। তাঁর কাব্যসংগ্রহ 'অনুভূতি'তে কতকগুলি কবিতা আছে যা তার দেশবাসীদের ডাক দিয়ে বলছে যে অলসতার অবসাদ থেকে জাগ্রত হও, গভীর নিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে দেশের জন্যে কাজ কর। তাঁর শেষের দিকের কবিতাগুলি কল্পনার ধ্বজা, প্রকৃত ঘটনার ভিত্তিতে লেখা, এবং দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় যে সব অশুভ নীতিবিরুদ্ধ, কুরুচি সম্পন্ন অসামাজিক ঘটনা ঘটেছিল তার বিরুদ্ধে তীব্র বিষাণ বাদ্য। ঐগুলির মধ্যে ছিল একটি সুস্থ সবল দেশ-প্রেমের আস্তরণ ও

অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক। তাঁর কাব্য 'জীবন কিছুক কাঁহি'তে (জীবনের অর্থ কি হওয়া উচিত) আমরা তাঁর জীবনদর্শনের একটা সুঠাম ছবি পাই। মধ্যযুগের কবিদের চিন্তার ধারা ছিল দুই সীমাহারা বিস্মৃতির মধ্যে ক্ষণিক জাগরণ এবং সেই কয়েকটি দিনকে সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগ করাই ইহকালের কাম্য। বড়জোর তাঁরা বলতেন যে অলস শিল্পচর্চাও মন্দ নয়, কিন্তু রায়চৌধুরীর জীবনবাদ ও বোধ ছিল কর্মোদ্যম ও ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে যাত্রা। জীবনের অর্থ হচ্ছে সকলের মঙ্গলের জন্য অবিরল ধারায় কর্মসাধনা। তাঁর মতে—

ক্ষমতা ও অর্থের জন্য তৃষ্ণা
মানবের মানবতাকে করেছে গলাধঃকরণ।
আত্মার ক্ষুধা হয়েছে পদদলিত
যৌন কামনাকে আমরা এমন বৃহৎ স্থান দিয়েছি
যে মানুষ তার পিছনে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে
কর্তব্যবোধ হয়েছে নিমজ্জিত,
নিজেদের স্বার্থোদ্ধত প্রাপ্যের স্বত্বাধিকারের হুংকারে
আমি সেথায় আসব বিদ্রোহের বাণী, কাষ্ঠ করে সম্বল
এই সব অশুভ দম্ভকে খণ্ড খণ্ড করে দিতে হবে
অতি সুনিয়ন্ত্রিত এবং সফল জীবনেও
থাকে ভয়ংকর ঘাতপ্রতিঘাতের খর ঘর্ষণ
ক্লেশ দুঃখ ও নির্যাতনের সঙ্গে,
এবং যাতে আগুন জ্বলে সর্বত্র,
সে অগ্নি সর্বজনীন বিরোধেরই শিখা
উন্মাদ, বহুবিস্তৃত এবং কালজয়ী
ভগ্নস্তূপে হয় পরিণত
সৃষ্টির মুক্ত ভাবরাজিগুলিকে
ভুলে ভ্রান্তিতে বিচার বিভ্রমে
সব কিছু গলিত পচনের মাঝে,
জন্ম দিচ্ছে এক নূতন স্বর্গকে, এক গরীয়সী পৃথিবীকে
অজেয় কর্মপ্রচেষ্টার নবছন্দে
আলস্যপরায়ণতা ও ধসে পড়া পচা পৃথিবীর ওপর।

কিন্তু তাঁর কারাবাসের আগের কবিতাগুলি রাজনীতি ঘেঁষা নয় এবং অনলাহুতিময়ও নয়। ১৯২০-২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ করেন তিনি। তাঁর 'তুমি' (১৯১৮) একটি অপূর্ব কবিতা, শুধু গভীর দার্শনিক চিন্তায় নয়, লিপিকুশলতায়ও। এই কবিতাটিকে তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তার শ্রেষ্ঠ অবদান বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই কবিতায় দেখি কবি সমগ্র বিশ্বের চিত্রকে একটি বিশ্বাতীত সূত্রে গ্রথিত করতে চাইছেন এর সাতটি পরিচ্ছেদে। প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে কবির অনুভূতি ঈশাবাস্যমিদং সর্বের সুরে পৌঁছেছে। একটি তরুণীর রূপেও তিনি যেমনি প্রকট, মায়ের স্নেহেও তিনি তেমনি প্রকাশমান; যেমন স্ত্রীর প্রেমে বা প্রকৃতির সৌন্দর্য। চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখি এই সর্বব্যাপী ভগবদসত্তার প্রকাশই সমস্ত ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক তত্ত্ব। অবশিষ্ট অধ্যায়গুলি ঈশ্বরের সঙ্গে কবির সম্পর্ক নির্ণয়-প্রাসঙ্গিক এবং সেখানে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধিজাত আশীর্বাদ ও গভীর প্রশান্তি বর্ণিত হয়েছে। 'তুমি' একটি উচ্চমানের অভিজাত কাব্য যেখানে ধ্বনিত ও বর্ণিত হচ্ছে সুরে স্বরে গীতে ভাবগৌরবে লেখকের ভগবদপ্রীতি। প্রতিটি পদের মধ্যে আছে অপরূপ ভাবতরঙ্গ, রসমাধুর্য এবং ভক্তমনে প্রণিপাত।

যতীন্দ্রনাথ দুয়রা (১৮৯২-১৯৬৪) একজন 'লিরিক' কবি। বাণীকান্ত কাকতির মতে অসমীয়া সাহিত্যে যে সব কবি আধুনিক যুগের নানা সূক্ষ্ম ভাব ও প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে দুয়রা সর্বশ্রেষ্ঠ। দুয়রা একজন আত্মসমাহিত কবি, তিনি অপরের চেয়ে নিজের আত্মার সম্বন্ধেই বেশি চিন্তিত এবং সময়ে অসময়ে নিজের ভাব ও পরিবেশ অনুসারে যে সব চিন্তা ও চেতনার ধারা তাঁর মানসে প্রতিভাত হয়েছিল তাদেরই কাব্যে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন তিনি। তিনি নিজেই নিজের যুগপৎ রসস্রষ্টা এবং শ্রোতা।

দুয়রা মূলতঃ প্রেমের কবি, সৌন্দর্যের উপাসনা তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান, তিনি প্রেমের স্বপ্নবৈচিত্র্যে মশগুল; এবং তাই তাঁর রচনার উপাদান। তাঁর কাছে প্রেম ও সৌন্দর্য একই ফুলের রং ও সুবাস। যেখানেই ভালোবাসা আছে সেখানেই স্বর্গের সৌন্দর্য। মনুষ্যকুলে তিনি বৃথাই তার সামীপ্য সাযুজ্য চান। অবিমিশ্র প্রেমের রূপায়ণ সত্যিই মানব সমাজে বিরল। ইহজগতে প্রেমে আছে কামনা, ক্লেশ, দুঃখ, বিরহ, অপ্রিয়ভাষণ, অত্যাচার ও নৈরাশ্য এবং এই সব প্রতীতিতে জাগতিক প্রেম যেন একটি রামধনুর রঙিন চিত্র।

এখানে তাঁর কাব্যে আমরা দেখি যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল, প্রত্যাখ্যানে দুঃখ ও বেদনা। যারা প্রেমের আশীর্বাদে বঞ্চিত তাদের মরমের ব্যথা ও দীর্ঘশ্বাস এবং শেষ পর্যন্ত বিরহব্যথাই তাঁর কাব্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মানবসমাজে এই অবিকৃত সৌন্দর্যবোধ ও অবিমিশ্র প্রেমের প্রতিদান অসম্ভব। তাই তাদের ক্ষুধার্তমন প্রকৃতির অপরূপ বিভাসের মধ্যেই এর প্রতিলিপি খুঁজতে চায় এবং তার কবিসত্তা গোপন রভসে মিলন কামনা করে। সারা বিশ্ব জুড়ে যে সৌন্দর্যের তরঙ্গ দুলছে, কবির চেতনায় ধ্যানে তা যেন মূর্ত ও স্ফূর্ত হয়ে ওঠে এবং তার মনে সেই প্রতিধ্বনির সঙ্গে তান তোলে। পাখির গানের সুমধুর কূজন, মধুমক্ষিকার গুঞ্জন, ফুলদলের রূপবিহ্বলতা, প্রভাতে অরুণোদয় ও সূর্যাস্তে আকাশের সুনীল বর্ণচ্ছটা, বিদ্যুল্লতায় চমক, স্রোতস্বতী-দের কলগুঞ্জন, চন্দ্রালোকে রজতদীপ্ত ব্রহ্মপুত্রনদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপমালা, নিদাঘ-কালীন নভে মেঘের রাজসমারোহে সঞ্চালন—এই সমস্তই কবির অতীন্দ্রিয় ভাবরাজিকে জাগ্রত করে। আমরা যদি কবির এই ভাবালুতার বিচিত্র রূপ-সম্ভারের ঐশ্বর্যকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখতে পাব যে দুটি সাধারণ গুণ তাঁর কবিতায় বিশেষ করে ছায়া ফেলেছে; সেই দুটি হচ্ছে—নতুন কিছু করার জন্য একটা ব্যগ্র আকূতি, আর একটি অপরিসীম সৌন্দর্য পিপাসা ও তাকে রূপ দেবার দুরন্ত প্রচেষ্টা, প্রকৃতির নিত্য পরিবর্তনশীল অঙ্গনে একটি আদর্শ পটভূমি খুঁজে তাকে কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করা। এই অন্তহীন যাত্রাপথে কবি চলেছেন সূর্যাস্তের পরও—"এই বাটে নাহি বা দুনাই" (এই পথে আর পদক্ষেপ করো না)। এই ধরনের চেতনাই দুয়রা কাব্যের দার্শনিক বৃত্ত। তিনটি প্রতীক: নদী, নৌকা ও মাঝি—এর দ্বারা তিনি জীবনের এক ধর্মীয় বিশ্লেষণ করেছেন, একে বৌদ্ধমতের জীবনের সব ক্ষেত্রে এক মহাবিশ্বব্যাপী গতিবাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝা, দুঃখ নৈরাশ্য, বিচার বেদনা দমন করা যায় না। অপ্রতিহত তাঁর কবিসত্তা তাঁর আদর্শের জন্য প্রেমকে উত্তীর্ণ করেছে পৃথিবীর শেষ দিগন্তে এবং কবি চলেছেন নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর স্বর্ণযুগের সন্ধানে। তাঁর কাব্য এই দুই মহতী জিজ্ঞাসার মর্মবাণী। দুয়রাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে ইংরেজি সাহিত্য—সুর, স্বর ও স্বতোৎসারিত ভাষা যেন বীণার ঝংকারে গানের সুরে-তানে-লয়ে ভেসে চলেছে। তাঁর ছন্দকুশলতাও অপরিসীম। কবিতা যেন তাঁর স্বাভাবিকী বলক্রিয়া ও ছন্দ তাঁর আয়ত্তাধীন। কার্যত তাঁর

কবিতা অসমীয়া কাব্যসাহিত্যের পঞ্চাশ বছর ধরে পথনির্দেশ দিয়েছে। তাঁর 'আপন সুর' (আমার নিজের গীতি) এবং 'বনফুল' প্রভৃতি কাব্যে এমন সব চয়ন আছে, যাতে তাঁর কবিতা শেলী, টেনিসন প্রভৃতি কবিদের বাক্‌শৈলীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দুয়রা ওমর খৈয়ামের রুবাইয়েরও একটি অনবদ্য অসমীয়া সংকলন প্রকাশ করেন। আর একটি অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ তাঁর শ্রান্তিহীন লেখনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে— তার নাম 'কথা কবিতা'। এগুলিকে গদ্য কাব্যও বলা যায়, কারণ গদ্যে লিখিত হলেও পদ্যের ঘনীভূত ভাবতরঙ্গে দোদুল্যমান। এই বইটির সঙ্গে টুর্গেনিভের গদ্যছন্দে কাব্যসংকলনের তুলনা করা যায়। এই সব রচনাগুলিতে কাব্যের ভাব, ভাষা, ঝংকার যেমন আছে, তেমন অসমীয়ায় নব নব লক্ষণীয় দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনার আভাস পাই। এখানেও কিছু কবিতাতে দুঃখবোধ ও বিষাদযোগ আছে এবং সেগুলিই তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য বিষয়।

চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার মতো রত্নকান্ত বরকাকতি (১৮৯৭-১৯৪৩) একজন সুপরিচিত বিশিষ্ট কবি কিন্তু তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য এই ধরণীর মানব-মানবীর প্রেম। তাঁর কাব্য 'শেফালি' এই জৈবিক অথচ মানসবিলাসী প্রণয়লীলার ভাষ্য। তাঁর কল্পনার প্রিয়া ধীরে ধীরে শ্লথ গতিতে বিশ্বজগতের সব সৌন্দর্যের ধারাকেই আত্মসাৎ করেছে এবং তিলোত্তমার মতোই তিলে তিলে তুলনাহীনা হয়েছে। 'শেফালি'র কবিতাগুলি শুধু প্রেমিকার দেহসৌন্দর্যের প্রতিটি খুঁটিনাটি বর্ণনাই দেয় নি, তাদের মধ্যে আছে সন্দেহ, সংশয়, ভীতি, বিরহ, দুঃখ, বিচ্ছেদ এবং নিরাশা যে সব এই জাগতিক প্রেমে নিত্যই ঘটে। কিন্তু এই সব ঘটনাগুলিকে কবি বিবৃত করেছেন এমন সব উক্তিতে যে সেগুলি শুধু সূক্ষ্ম ও জটিল নয়, একটা অতীন্দ্রিয় দ্যুতিতেও পূর্ণ, যেমন আমরা পাই একটি পুষ্পদলের বিকাশে বা রমণীর দেহলাবণ্যে। কতকগুলি কবিতা আবার কবির সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক নিয়ে লেখা। কবিরা সাধারণত একটু বেশি ভাবপ্রবণ মানুষ এবং তাঁরা যেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং ঘটনাগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যগুলিই তাঁদের চোখে ফুটে ওঠে (কারণ তাঁরা ঐ সব বিষয়েই আত্মনিমগ্ন এবং সেই মোহেই সার্থকভাবে স্বার্থপর) যা সাধারণ জনগণের থাকে না। তাঁদের ভাবালুতা তাঁদের গভীরভাবে অন্তর্দৃষ্টি দেয় এবং তাঁরা সাধারণের মধ্যেও অসাধারণকে দেখেন এমন কি একটি শূকরের ঘোঁৎঘোতানিতে বা গোময়স্তূপের

উপর ঝরে পড়া একটি ফুলের মধ্যেও। তাঁদের ভাবতাড়না এতই বেশি যে, তাঁরা ঐসব তুচ্ছদ্রব্যের মধ্যেও নিত্যসত্য শাশ্বতকে আবিষ্কার করেন এবং সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনেও তার প্রকাশ দেখতে পান ও সেইগুলিকে ভাষায় ছন্দে রূপ দেন। তাঁর কবিতা 'সকিয়নী' (নিবেদন) চলন্ত মুখর জনতাকে উদ্দেশ করে বলছেন—

আমার কাছে এই প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তেই জানাচ্ছে আবেদন
সে কি তোমার কাছে কোনো সংবাদ করে না প্রতিবেদন ?
ঐ যে গাছে ফুটেছে বকুল ফুল সে কি দেয় না সম্বিত
ঐ যে বনের ফুল, কোকিলের কুহুতান, সে কি করে না মোহিত ?

বরকাকতির কবিতাগুলি জীবনের জটিল তত্ত্ব, সৌষম্য, বিরোধ ও অভিজ্ঞতার দিক থেকেও আমাদের কাছে বরণীয়। তাঁর কবিতা 'কি জানি না হয় ভুল' (ভ্রান্তিই হয় রক্ষা কবচ)-এ কবি বিশ্বাস করেন ভুল ভ্রান্তিই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কবচ এবং তাঁর মুক্তির আশ্বাস। ইতর প্রাণীর জীবনে নিজের ইচ্ছামতো কোনো কাজ করবার স্বাধীনতা নেই। সে প্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে চলে কিন্তু মানুষ প্রকৃতির বন্ধনের উর্ধ্বে উঠতে পারে—

এই জন্যই মানুষ করে ভুল
এবং প্রতিপদক্ষেপে সে ক্ষণিক ভুলের দেয় মাশুল।

সমস্ত কবিতাটিই মানুষের সৃজনশীল শক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সেই-জন্যই কবি তাঁর ভুলভ্রান্তি স্খলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁর কাব্যের দার্শনিক পরিধি ছাড়াও বরকাকতি শিল্পীমনের স্পর্শের জন্যও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছেন। কোথায় কী যেন একটা হারানো সুর, একটা প্রতিধ্বনিময় ছন্দ এবং তাঁর বক্তব্যের স্বতঃউৎসারিত স্ফূর্তি তাঁকে অসমীয়া কবিকুলের মধ্যে সব থেকে ধ্বন্যাত্মক কবি বলে স্বীকৃতি দিতেই হয়। তাঁর রচনাশৈলীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচুর প্রভাব পড়েছে।

নলিনীবালাদেবী (১৮৯৯-১৯৪৩) আধুনিক কালের অসমীয়া মহিলা কবিদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট লেখিকা। তিনি অল্প বয়সে বিধবা হন, কিন্তু নিষ্ঠাবতী আলোকপ্রাপ্তা ভারতীয় নারীদের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তিনি তাঁর বৈধব্যের অশুভ পরিবেশকে সহনীয় করে তোলেন। মানসিক সান্ত্বনার জন্য তিনি আধ্যাত্মিক আলোকের সন্ধানে ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে গীতা,

উপনিষদ ও আসামের বৈষ্ণবীয় মহাপুরুষীয়া সন্তদের লেখা পাঠ করতে আরম্ভ করেন এবং এই সব পঠন-পাঠন তাঁর চিত্তকে শুধু স্থির থাকতেই সাহায্য করে না, এক ধ্যানী মনকেও তুলে ধরে যাতে ভগবৎ বিশ্বাসের বীজ ও আশা রোপিত হয়। এই মহিমা কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শনের দ্বারা বিশেষ ভাবে চিন্তায় ও ছন্দে প্রভাবিত হয়। নলিনীবালা এক রহস্য অনুসন্ধানী মহিলা কবি, কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে একটি না জানা অস্থির চিত্ততা, একটা কিছু জানবার চেষ্টা যা পরিমাপের মধ্যে পড়ে। ঐ একটি স্পৃহা তাঁর তিনটি কাব্য সংকলনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে—সন্ধ্যার সুর (দিনবসানের গান), সপোনর সুর (স্বপ্নের দেশের গীতাবলী), পরশমণি (দার্শনিকের প্রস্তর খণ্ড)। এই সব কবিতার মধ্য দিয়েই আমরা শুনি একটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক্ষত বিক্ষত জীবনের দুঃখের ইতিহাস এবং আত্মিক বিশুদ্ধি দিয়ে তাকে অতিক্রম করবার দুর্ধর্ষ প্রয়াস। এই দুঃখজয়ের ইতিবৃত্তে ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে বিশ্বতত্ত্ব ও বিশ্বাতীত পরমাত্মার মিলন ঘটবে, এই কবির প্রবল ইচ্ছা। সেই পরমকে কখনও প্রিয়তম রূপে কখনও অনন্ত অসীমে বা চিরসুন্দর রূপে, সেই চিররাসরসিক সত্যশিবসুন্দরের স্পর্শ তিনি পাচ্ছেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে যার খণ্ড খণ্ড রূপমাধুরীই সেই পরম অখণ্ড রূপময়কে প্রকাশ করছে। প্রত্যেকটি ঋতুরঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির রূপবিন্যাসের যে পরিবর্তন হয় সেই তো পরম এককের অখণ্ড চিন্ময়ের বিভিন্ন রূপ রস সজ্জা। প্রকৃতির বিভিন্ন বৈচিত্র্যই প্রকৃতির দেবতার সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটিয়ে দেয়, সেতু তারাই। ঐ যে আকাশে দামিনীর চমক, ঐ যে কেতকীর মনদ্রাবী গান, ঐ যে উষাকালীন মৃদু মলয় বাতাস, ঐ যে রাত্রির গভীর নিশীথে স্তব্ধতা, ঐ যে যূথীফুলের সৌরভ, সবই সেই চরম ও পরমের বিভিন্ন বারতা এবং এর দ্বারাই কবি শুধু পূজার অর্ঘ্যই নিবেদন করছেন না, নিজেকেও সেই পূজার মণিরত্নে রূপায়িত করেছেন। এইভাবেই এই কাব্যসাধিকা পরমসত্যকে বিশ্লেষণ এবং তদ্‌ভাবে ভাবিত হয়ে তাঁর কাব্যকে আরও উজ্জল ও সুন্দর করে তুললেন। তাঁর 'সপোনর সুর' সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বলেছেন যে তাঁর কবিতাগুলি দুঃখবাদীর ইতিকথা নয়, মানুষের ভবিষ্যতের গভীরতম বিশ্বাসের সুর যা মরণকে মৃত্যুহীন প্রাণ দান করে। নলিনীবালা দেবীর একটি দীর্ঘ কবিতা 'পরম তৃষ্ণা' যেখানে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা বা মতবাদের একটি

স্পষ্ট বিবরণী মেলে। তিনি বিশ্বাস করেন যে মানুষের আত্মায়, বিশেষ করে কবির মধ্যে একটা চিরপিয়াসীর ছন্দ আছে যা তাকে চঞ্চলতা থেকে বিরতি দেয় না, যদিও সে ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী হয় বা সৌন্দর্যের দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং জীবনের যাত্রাপথ নতুন কিছু নয়, শুধু 'চরৈবেতি' অর্থাৎ চির চলমান। ভগবানের মতো তাঁর সৃষ্টির ধারাও অনন্ত ও অসীম। প্রকৃতির সেই সর্বকালীন রূপবৈচিত্র্যই সৃষ্টির সঙ্গে সমকালীন। সেজন্যই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক চিরকালের। একই অগ্নিশিখার স্পন্দন দুটি স্ফুলিঙ্গে। এই কারণেই সুরভি ও পুষ্পকোরক, মলয়পবন ও স্রোতস্বিনী, মানুষের কাছে এত প্রিয় ও একই সূত্রে গাঁথা। প্রকৃতির নানা রূপেই এই সত্যের প্রকাশ ঋতের বন্ধনে এবং এই কবিতার রস সেই ধারাকেই আশ্রয় করে পরিস্ফুট।

নলিনীদেবীর পিতা নবীনচন্দ্র বরদলৈ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা ছিলেন। কন্যা পিতার একটি সুন্দর জীবনী লেখেন। দেশপ্রাণ পিতার দুহিতাও তেমনি স্বদেশকে ভালোবাসেন, তাঁর স্বদেশানুরাগকে শ্রদ্ধা করতেন এইটাই স্বাভাবিক। তিনি কতকগুলি স্বদেশ ভক্তি উদ্দীপক কবিতাও লেখেন যেখানে জন্মভূমি ও তার গৌরবময় অতীতকে বর্ণনা করা হয়েছে শুধু সশ্রদ্ধভাবে নয়, গভীর অন্তর্চেতনা ও স্থায়ী স্বদেশ প্রেরণার মন্ত্রের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে। সুন্দর ভারতের পাশাপাশিই স্থান পেয়েছে সুন্দর আসাম ভারতী, রবীন্দ্র তর্পণ, মহানন্দার আত্মকাহিনী (মহান ব্রহ্মপুত্র নদের আত্মজীবনী) প্রভৃতি কবিতাগুলি সবই স্বদেশপ্রেমসূচক। 'জন্মভূমি' কাব্যে সেই গভীর স্বদেশপ্রীতি ভাষায় অনবদ্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে এবং কবির অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে যে মৃত্যুর পরও তিনি যেন স্বদেশকে ভালোবাসতে পারেন এবং তার উন্নতির জন্য কাজ করতে থাকেন। তাঁর রচনাশৈলী সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। তাঁর কবিতা অতি মাত্রায় সংগীতধর্মী। তিনি সংস্কৃত রত্নভাণ্ডার থেকে তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তাঁর উপমা, উৎপ্রেক্ষা বা শব্দভাণ্ডার সবই সেই সাহিত্যের দ্বারা সমৃদ্ধ।

ধর্মেশ্বরীদেবী বরুয়ানী (১৮৯২-১৯৬০) অসমীয়া কাব্য সাহিত্যের একজন স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় লেখিকা। তিনি ছিলেন যাবজ্জীবন রোগশয্যাশায়িনী। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় মন্তব্য করেছেন—"দুরন্ত বাতরোগ আমাকে যৌবনের দিন থেকেই আক্রমণ করে। আমার প্রিয় স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়রা

যথাসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হয় না। রোগ উপশমের কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। আমাকে শয্যাশায়ী হতে হয় এবং সেই শয্যাতলই আমার সারাজীবনের আশ্রয়স্থল। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর আমার প্রিয়তম স্বামী আমাকে নানা আশার কথা শুনিয়ে আসছেন, তাঁর উপদেশ ছিল—বেশি ভাবনা করো না বরং তোমার চিন্তাগুলিকে পদ্যে রূপান্তরিত করে কবিতা লেখার অভ্যাস কর—আমি সেই মতোই লিখতে আরম্ভ করলাম—যতটা সম্ভব হয়…"

ধর্মেশ্বরীদেবী বরুয়ানীর দুটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল—'ফুলের সরাই' (ফুলের ডালা) এবং 'প্রাণর পরশ' (আত্মার স্পর্শ)। দুটি কাব্যেই দেখি, কবির অনুভূতি জাগ্রত হয়ে বিরাট বিশ্বের প্রাণ সত্তার স্পন্দন শুনছে এবং তাঁরই সঙ্গে ব্যক্তিগত আত্মার মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করছে। কবি বিশ্বাস করেন না যে ভগবান শুধু স্বর্গেই বাস করেন—সেই কল্পনা মানুষের মনের ভ্রম, বড়ো ও ছোটো সর্বত্রই, সর্বভূতে তিনি আছেন, তাঁকে আমরা দেখতে পাই সর্বদিকে, আমাদের আশেপাশে, আমাদের ঘিরে—

তুমি কি সেই সুন্দর নীল নভস্থল
চন্দ্র সূর্য তারার দল
না তুমি মেঘের অন্তরালে বিদ্যুৎ চমকিত দামিনী
মহাকালের মদালস কোলে ?
না তুমি মানুষের মনে বাস করে যে কুহকিনী আশা
তারি বাণীর জন্মদাতা ?
তুমি কি প্রিয়তমের মিলন আলিঙ্গনের শুভক্ষণে শুধু
আনন্দ ও সুখভোগের উজ্জ্বল দীপ্তি ?

এই মহিলা কবি ধরিত্রীর সর্বত্রই ও সব দ্রব্যেই ভাগবত সত্তা ও মহিমার সচল স্পর্শ অনুভব করেন এবং এই গভীর সত্যই তাঁর কাব্যগুলিকে অপরূপ সুন্দর ও মহান অর্থব্যঞ্জক করে তুলেছে। যদিও তিনি অসুস্থ ও অকর্মণ্য রোগী ছিলেন এবং জীবনের প্রথম দিকেই বিধবা, তবু ধর্মেশ্বরীদেবীর লেখাতে নলিনীবালা দেবীর দুঃখজনক ব্যথার আভাস বা বিষাদের ছায়া নেই। তাঁর গরীয়সী আশা যে তিনি একদিন সেই পরমকে পাবেন—সেই মিলনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর অন্তরের গভীর আবেগকে মূর্ত করেছে এবং মিলন

ব্যাকুল এই বিরহ ব্যথার চিত্র অঙ্কন করতে সাহায্য করেছে। সেখানে প্রশস্তি বা বাকবৈদগ্ধ বিতণ্ডার মেঘের কোনো স্থান নেই। যদিও তাঁর রচনার উপজীব্য বস্তু সাধারণ—যেমন ভগবান, প্রকৃতি, মানবহৃদয়, চমৎকার ভাবে সুন্দর কথায় সেই পুরাতনী চেতনাগুলিকে নব নব সৌন্দর্যে রূপায়িত করার শক্তি তাঁর ছিল। তাঁর সমস্ত কাব্য জুড়ে জীবনের জন্য এক অপরিসীম শ্রদ্ধা ও এই পৃথিবীর সাধারণ দ্রব্যগুলির জন্য গভীর প্রীতি ছিল, আর ছিল ইহ জীবনের প্রতি গভীর সমবেদনা।

স্বর্গত বাণীকান্ত কাকতি যথার্থ বলেছেন যে নীলমণি ফুকনই (১৮৮০-১৯৪৩) গভীর আধ্যাত্মিক আকৃতির একমাত্র আধুনিক অসমীয়া কবি। লক্ষ্য করবার বিষয় যে তাঁর ষাট-সত্তর বৎসর বয়সোত্তীর্ণ সময়ে তিনি 'জ্যোতিকণা,' 'মানসী,' 'সন্ধানী' 'যূথিমালি' (গীত যূথিকা) প্রভৃতি পুস্তকগুলি প্রকাশ করেন। যদি কাব্যকে জীবনে ভাবাবেগের অভিব্যক্তি বলা যায় তাহলে ফুকনের কবিতাগুলি অপূর্ব, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কাব্যে যখন ভাবের অতিপ্রয়োগ হয় তখন সেই গুণই দোষ হয় এবং বিসদৃশ হয়ে ওঠে। তাই সবক্ষেত্রে কাব্যের ভাববহ্নিশিখা জ্বলদর্চিতনু স্থিতধী না হয়ে কখনও দুর্বল বা কখনও প্রবল ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। 'মানসী'তে পাই কবির কাব্যতৃষ্ণার পরিচয়, 'সন্ধানী'ও সেই ধরনের সত্য ও সুন্দরের পিয়াসী। 'যূথিমালি'তে আমরা সাধারণ ও দরিদ্র লোকেদের জীবনচিত্র পাই যা মানবীয় ভালোবাসার এক নিসর্গ চিত্রে পূর্ণ। তিনি কায়মনোবাক্যে স্বীকার করতেন—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। কবি ১৯৪২ সালের আগস্ট বিদ্রোহে লিপ্ত থাকায় ধৃত হন ও তাঁর কারাবাস ঘটে। সেখানকার অভিজ্ঞতালব্ধ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে 'জিঞ্জিরী' (লৌহশৃঙ্খল) নামক পুস্তকে। তিনি লেখেন, ভগবানের অনুসন্ধানেই আমি এই স্বাধীনতার মন্দিরে প্রবেশ করেছি। আমি যা দেখেছি, যা বুঝেছি বা অনুভব করেছি তাই আমি স্বেচ্ছায় ভাষায় পরিবর্তিত করে লিখে রেখে দিচ্ছি। আমি তাতে শুধু আমার বুদ্ধি সঞ্জাত অন্তর্দৃষ্টি যোগ করেছি এবং ভবিষ্যতের চিন্তার সহায়তা করবে বলেই প্রকাশ করছি।' 'জিঞ্জিরী'র সব কবিতাই ভবিষ্যতের আশার সফলতার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এর মধ্যে আমরা পাই একটা ক্ষমতাবান ও স্বাস্থ্যবান মন যা প্রতিরোধ বা ঝড়ের দৃঢ় বিরোধিতায় চিন্তান্বিত নয়। কবিতাগুলি আভরণহীন সাধারণ ও ভাষার

চাকচিক্যময় আবরণশূন্য—মনে হবে যেন আকৃতিতে গদ্যময়, একটি দুগ্ধসরবরাহ যানের ঘর্ঘর শব্দ, অথচ যা বহন করে চলছে একটা গভীর দার্শনিক ছন্দ ও তত্ত্ব।

নীলমণি ফুকনের গদ্যও পদ্যের মতো আবেগাপ্লুত। কিন্তু এর মধ্যে বিশ্লেষণের তীব্রতা নেই বা বর্ণনাতেও সংযত কল্পনার সংহত প্রলেপ। তিনি ব্যবহার করেছেন আলংকারিক বর্ণাঢ্য ও গুরুগম্ভীর ধ্বনির গদ্যভাষা। তাঁর 'সাহিত্যকলা' নামক পুস্তকটি নানা সাহিত্যিক আলোচনার সংকলন।

শৈলধর রাজখোয়ার (১৮৯০-১৯৬৮) 'নির্ঝর' (স্রোতস্বিনী) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে রচিত তাঁর নানা কবিতার সংকলন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে নতুন কিছু অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কার করেন নি, কিংবা সেই সম্বন্ধে দার্শনিক গবেষণার জন্য তাঁর মন রাজী হয় নি। ঐতিহাসিক স্থানগুলির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ঐসব ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে কেন্দ্র করে কল্পনার আবরণে রসরচনার আখ্যায়িকা যুক্ত করে প্রাকৃতিক বর্ণনাগুলিকে প্রোজ্জল করে তুলেছেন।

তাঁর 'পাষাণ প্রতিমা' (পাথরের মূর্তি) এই ধরনের একটি স্মরণীয় কাব্য। এই কাব্য ব্রহ্মদেশীয়দের দ্বারা আসাম আক্রমণের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা। দুইজন অসমীয়া সেনাপতি দেশের জন্য অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করেন এবং তাঁদের শৌর্যে বীর্যে অভিভূত হয়ে দুজন অসমীয়া ললনা ফুল্লরা ও চটলার ভালোবাসা লাভ করেন। এই দুই মহিলা তাঁদের প্রিয়তমদের আকর্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদলের সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁদের ভালোবাসার ধন সেনাপতি যখন যুদ্ধে নিহত এবং তাঁদের উপর বিদেশী সৈন্যদল মারমুখী তখন তাঁরা নিছক ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে প্রস্তরীভূত হয়ে যান। শৈলধরের প্রেমগাথাগুলি সুন্দর, শোভন, স্পর্শকাতার এবং নরনারীর বিরহ বেদনা ও দুঃখের চিত্রে ভাস্বর।

লক্ষ্মীনাথ ফুকন (১৮৯৭-১৯৭৫) সাহিত্য জগতের একজন গতানুগতিকতার বিরোধী লেখক। তিনি কয়েকটি ইংরেজি পত্রপত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। গত দশ বছরের বেশি তিনি আসামের ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'আসাম ট্রিবিউন'-এর সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন এবং সেই সূত্রে সাংবাদিকতায় তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। তবে একজন দৈনিক পত্রিকা-সম্পাদকের কাব্যচর্চার সময়

সুবিস্তৃত নয়। তবু লক্ষ্মীনাথ সুবিধা ও সুযোগ পেলেই সাহিত্যচর্চাও করতেন। তাঁর বেশিরভাগ কবিতাই যৌবনে লেখা এবং স্বভাবতই প্রেমই তাঁর উপজীব্য বিষয়, কিন্তু এই প্রেমের বিচারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বস্তুর অভাব। তিনি শুধু সুন্দরের উপাসক এবং প্রকৃতি ও মানুষের সেই সৌন্দর্যই তাঁকে উদ্দীপনা জোগায়। তাঁর প্রিয়া এই মর্ত্যভূমির কেউ নয়—অশরীরী সত্তা। তাঁর সব কবিতাতেই এই সৌন্দর্যপিপাসা বিরামবিহীন হয়ে ফুটে উঠেছে। 'মরণ বেলিকা' (মৃত্যুর সময়) কবি বলছেন যে তাঁর সমুখে স্বয়ং মৃত্যুদেবতা দাঁড়িয়ে রয়েছেন কিন্তু সেই পরিবেশের সুন্দরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হচ্ছে। তাঁর মৃত্যুভয় বলে কিছু নেই এবং তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁকে কেউ যেন সেই সময় বিচলিত বা উৎপীড়িত না করে।

ডিম্বেশ্বর নেওগের (১৯০০-১৯৪৩) কবিতাগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—যৌবনের উচ্ছ্বাসময় উক্তি আর স্বাদেশিক কবিতা। সংকলনটির নাম—'ইন্দ্রধনু'। তাতে নানা প্রকারের ও নানাধরনের সেই চিরকালের প্রাথমিক উত্তেজনার ও উদ্দীপনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। অসমীয়া সাহিত্যের এই দিগন্তটি তাঁর কাব্যে সুনিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলন ভারতে আরম্ভ হয়েছিল, তারই প্রেরণায় বহু তরুণ কবি স্বদেশী কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করেন। নেওগ-ও আসামের প্রাচীন ও অধুনালুপ্ত গৌরবময় দিনগুলির মধ্যে নিমজ্জিত হলেন এবং তাঁর কবিতার বহু উপাদান সেই সূত্র থেকে আহরণ করলেন। 'বুরঞ্জী লেখক' (ইতিহাস রচয়িতা) নামক তাঁর কবিতাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি গভীর ভাবসমন্বয়ে লিখিত। 'শাপমুক্ত' নামে কবিতাটিতে প্রিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও স্বদেশপ্রেম একীভূত হয়ে গিয়েছে। তাঁর কাব্য সংকলন 'থাপনা' (ফুলের সাজি) শিশুদের জন্য লিখিত। তাঁর কবিতাগুলিতে ছন্দবৈচিত্র্যও লক্ষণীয়।

বিনন্দচন্দ্র বরুয়ার (১৯০১—) কবিতায় এক ধরনের গীতিময় বাকচাতুরীর ছন্দে স্বদেশী কবিতা পাওয়া যায় যা স্মরণ করিয়ে দেয় বাঙালী কবি নজরুল ইসলামের রীতিকে। তাঁর দুটি সংকলন 'শঙ্খধ্বনি' ও 'প্রতিধ্বনি' আসামের পুরাতনী ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতীতের গান ও তার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনাতেই কবির রসোদ্দীপ্ত কল্পনা মুখর ও প্রখর

হয়ে ওঠে। তিনি অতীতকে বন্দনা ও ব্যবহার করেছেন বর্তমান ও অনাগতকে জাগ্রত করবার জন্য—সেই ভগ্নস্তূপ থেকে অগ্নিকণা খুঁজে তিনি বীর্য শৌর্য আলোকের প্রেরণা চান। তাই তাঁর কাব্যে দেখি অতীতের মহানদের স্মরণ ও বরণ যাতে বর্তমানের পুরুষ ও নারীরা প্রেরণা লাভ করতে পারেন ও তাঁদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ—অর্থাৎ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে পারে, দুঃখ কষ্ট বিদূরিত করতে পারে এবং আসামকে আবার সাহিত্যে সংস্কৃতিতে শিল্পে বাণিজ্যে বৃহৎ করে তুলতে পারে। সব কিছুরই যে নব রূপায়ণ প্রয়োজন। তাঁর যুবজনোচিত গুরু গম্ভীর ডাক শোনা গেল—

জাগো জাগো আমার দেশের যুবদল
শক্তির মূর্তি ধরে স্ফুলিঙ্গ সকল
নিদ্রাভঙ্গ হোক তোমাদের বারবার
তপ্ত রক্তধারা শিরায় উপশিরায় বহুক আবার
চমকিত করো ধরিত্রীকে বিপুল বীর্যে
কর্মে আহুতি দাও শক্তিসাধন শৌর্যে
কেউ বৃহৎ নয়, কেউ নয় গো ক্ষুদ্র
সকলেই একত্র বীরত্বে সমান সমুদ্র
সব বন্ধন কর দূর
চূর্ণ কর যে সব বাধা প্রচুর
ঝড়ের মতো আসি দূর করি দাও, দাও নাড়া
পাবে সাড়া বজ্র গরজন বাড়া
ধরিত্রী হোক কম্পিত, সচকিত সূর্য আলোকে
এগিয়ে চল ভাই এগিয়ে পুলকে ঝলকে চমকে
হও অগ্রসর, হও আগুয়ান
ফিরবনা আমরা, মায়ের সন্তান।

বিনন্দ বরুয়া আসামের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে লিখেছেন ও আরও বিশেষ করে আহোম রাজাদের শাসনতন্ত্রের কথা। 'রঙ্গা মুয়া' (লাল মুখ), 'রংপুর', 'গরগাঁও', 'ব্রহ্মপুত্র', 'শ্মশান' প্রভৃতি কবিতায় তিনি একটি নাটকীয় পরি-প্রেক্ষিতে ও নাটকীয় ভাষায় ঐ সব স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত বীরপুরুষের তর্পণ করেছেন আবেগভরে, নবছন্দে ও অনুপ্রেরণায় সিঞ্চিত

হয়ে। তিনি কতকগুলি ইংরেজি গল্প ও কাহিনীও অসমীয়ায় রূপান্তরিত করেছিলেন, যেমন 'আগিয়াথুঠির বীর' যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ইংরেজি কবিতা 'দি ইনসিডেণ্ট অফ্ দি ফ্রেঞ্চ ক্যাম্প'। প্রেরণামূলক দেশাত্মবোধক, বাঙ্ময় ছন্দগাম্ভীর্য, দ্রুত বাক্যবিন্যাস এবং সহজ চিত্রায়ণ তাঁর কবিতাগুলিকে সুখপাঠ্য করে।

দেবকান্ত বরুয়া (১৯১৪—) হঠাৎ জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মতো আসামের সাহিত্য গগনে উদিত হন এবং তিনি যে নূতন ভঙ্গির প্রচলন করলেন, তাতে সাহিত্যসমাজ সরবে চমকিত হয়ে উঠল বিষয়বস্তুর নির্বাচনে, দৃষ্টিভঙ্গির নূতনত্বে, নবকাব্যরীতি ও চিন্তাধারার প্রচলনে তিনি তাঁর নিজের জন্য এক নতুন পথ সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর কবিতা 'আমি দুয়ার মুকলি করোঁ' (আমার দুয়ার খুলি) তারই প্রতীক। তিনি তাঁর লিখনভঙ্গির জন্য কোনো বিশিষ্ট পূর্বসূরীর কাছে ঋণী ছিলেন না। তাঁর যৌবনের সংকলন 'সাগর দেখিছা' (সমুদ্র দেখেছ?) নানা ধরনের জ্ঞানবিজ্ঞানের কাব্যময় ফল। তাঁর প্রেমবিষয়ক কাব্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনি গতানুগতিকভাবে কবিপ্রিয়ার দেহ সৌন্দর্যের কোনো বিস্তৃত বিবরণ, এমন কি প্রেমের ঘন নিবিড়তার আভাসও দেন নি। তাঁর কবিতাগুলি যেন মানসসুন্দরীর উদ্দেশে লেখা কবিকণ্ঠোৎসারিত প্রার্থনা এবং মনের ঘাত প্রতিঘাতের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার চিত্র। প্রত্যেকটি কবিতা এক একটি বিশিষ্ট মানসিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। অন্যের কাছে যা প্রেমের পরাজয়, কবির কাছে তা কিছুই নয়। অন্যে যেখানে অসাফল্য ও নিরাশা দেখে কবি সেখানে জয় ও সুখের বারতাই বহন করে নিয়ে যান। প্রেমের তথাকথিত বিফলতারও একটা ভাবতরঙ্গ ও জীবনছন্দ আছে। ব্যাধবাণবিদ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনের মৃত্যু যেমন বাল্মীকিকে শাশ্বত কবি করেছিল, তেমনি কোনো একটি তরুণীর প্রেমের স্পর্শ তরুণ কবিকে কাব্য লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর 'প্রেমের উত্তর' কবিতা-টিতে কবি লিখছেন—

> প্রিয়ে, তোমার অজস্র প্রেমের নীরব দান
> যা তোমার কোমল হৃদয় দিতে চায় আমায়
> তার প্রতিদানে আমি শুধু পারি দিতে
> আমার এই অর্থহীন কাব্যের কলকাকলি

তাঁর সুন্দরী প্রিয়তমা তাঁর ভাবরাজিকে জাগ্রত করল, তাদের ঘনীভূত করল, তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। এই নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান বা ত্যাগ কবিকে না করল রোষ-কষায়িত, না বলাল কোনো কঠিন নিন্দাসূচক প্রতিবাদমন্তব্য। কালো মেঘে তাঁর মনের রঙের বদল হল না। তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে যদিও তাঁর সম্পর্ক ছিল ক্ষণস্থায়ী, তবু তাঁর কাছে সেই ক্ষণিক প্রেমের শিখাও চির-স্থায়িত্বে রূপান্তরিত হয়ে গেল এবং তাঁকে চিরকালের মতো আনন্দ ও সুখস্মৃতির উপকরণে পরিণত করল। জীবননাট্য কি কেবলই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যবদলের ব্যাপার নয়? তার নিয়মই হচ্ছে ক্ষণস্থায়িত্ব। একটি পুষ্পের মনোহারিত্ব ও একটি মানুষের যৌবনের সূর্যসম দীপ্তি সবই ক্ষণস্থায়ী মহাকালের দ্বারা সীমিত। আশ্বিনের শুক্লপক্ষে ষষ্ঠীতে বোধন করে যে দেবীতুর্গাকে আমরা জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা করে থাকি, সেই প্রতিমাকেই কি আমরা বিজয়াদশমীর দিন চোখের জলে বিদায় দিই না? সেইজন্য কবির কাছে জয়মাল্যই সব নয়, পাওয়াটাই বা হস্তান্তরই শেষ কথা নয়। তাঁর আনন্দ হচ্ছে চেষ্টায়, এগিয়ে চলায়। একটি সুন্দরী তরুণী তাঁকে ত্যাগ করতে পারে কিন্তু আরও সহস্র সহস্র রমণী আছে যারা তাঁকে বরণ করতে উৎসুক হতে পারে। প্রেমে ব্যক্তি-গত প্রত্যাখ্যানই তাঁকে নিয়ে যায় বিশ্বজনীন প্রেমে। তাঁর কাব্য 'দেবদাসী'তে দেখি কবির নয়ন গোচর যিনি, তিনি শুধু একজন মন্দিরের নর্তকী নন, মানব ধর্মে অপমানিতা পরপদানতা লাঞ্ছিতা বঞ্চিতা। তিনি কায়মনোবাক্যে চাইছেন যে সে তার নিষ্ঠুর পাষাণ দেবতার দাসীত্ব থেকে মুক্তি পাক, যাতে তার প্রেম বর্ষিত হতে পারে সকল মানবের উপর। এই ধরনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অন্যান্য কবিতাতেও 'সাগর দেখিছা' (দেখেছ তুমি রুদ্র সমুদ্রকে,), 'রঙা এটি করবীর ফুল' (একটি রক্তকরবী) এবং 'কলং পারত' (কলং নদীর পারে)।

রবার্ট ব্রাউনিং-এর মতো কবি তাঁর কবিতাগুলিকে নাটকীয় স্বগতোক্তিতে পর্যবসিত করেছেন। অবশ্য সেগুলিকে কোনোক্রমে নাটক বলে অভিহিত করা যায় না। সেখানে চরিত্রচিত্রণে বা ভাব ও আদর্শের দিক থেকে নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত নেই, মানবের তেজোদীপ্ত ব্যঙ্গ বা কৌতুকের কাটাকাটি নেই বা নাটকোচিত বাক্যালাপের বা কথোপকথনের সুযোগ নেই, কেবল শুধু একজন অন্তঃপুরবাসী অদৃশ্য কল্পিতজনের সঙ্গে কথাবার্তা, নাটকের অদৃশ্য যিনি—

সেই ধরনের রচনা অনেকটা স্বগতোক্তি ও কাল্পনিক প্রশ্নোত্তর, সেটা ঠিক নাটকের পর্যায়ে পড়ে না। তাঁর কবিতা 'সাগর দেখিছা'র মূল সূত্রই হচ্ছে সেই অদৃশ্য কাল্পনিক কথোপকথন। সব কিছু প্রশ্ন, সমস্যা, বিবাদ, বক্তার সেই অন্তর পুরুষের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদেই প্রকাশ পেয়েছে, তাঁকেই পরিস্ফুট করেছে। এই গুণরাজির জন্যই অসমীয়া সাহিত্যের তিনি একজন বিশিষ্ট প্রতিবেদক। দেবকান্ত বরুয়ার কৃতিত্ব যে তিনিই প্রথম অসমীয়া সাহিত্যে শিল্পিত প্রকরণের প্রচলন করেছেন। যদি তাঁর কাব্যচিন্তা ডি, এইচ, লরেন্সের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, তবে কাব্যিক বক্তব্য ও ব্যঞ্জনার ধারায় কবি রসেটি ও সুইনবার্ণের দ্বারাও তিনি কম প্রভাবান্বিত হন নি।

প্রেম ও সৌন্দর্যের আর একজন বিখ্যাত কবি হচ্ছেন গণেশচন্দ্র গগৈ (১৯১০-৩৮)। জীবন তাঁর কবি দৃষ্টিতে প্রেম ও সৌন্দর্যের দ্বারাই সমৃদ্ধ। 'স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাতে তাঁর বক্তব্য যে প্রেমের পৃথিবীই হচ্ছে সৌন্দর্য সাধনার শেষ সৃষ্টি এবং চিরস্থায়ী। তিনি সেজন্য গভীর প্রেমে ও আগ্রহে সেই সৌন্দর্য দেবীর পাদপীঠেই আত্মোৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। 'পাপড়ি' গণেশ গগৈ-এর আত্মজীবনী মূলক প্রেমের কবিতা। তাঁর যৌবনে যে দিব্যাঙ্গনা তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন ও যাঁর সৌন্দর্য-সাগরে নিমজ্জিত হয়ে তাঁর প্রেমের নবোন্মেষ হয়েছিল, তিনিই তাঁকে হৃদয়হীনার মতো ত্যাগ করেন। জীবনের নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে প্রেমের নিষ্ঠুর গতি এবং তার বিরহ বেদনাই অনেক সময়ে কাব্যে ঝংকার দিয়ে বীণার তারে ছন্দিত হয়—কারণ এই অনুভূতি সাধারণ জীবনের চেয়েও বড়ো। তাঁর প্রিয়ার এই প্রত্যাখ্যানই তাঁকে কাব্যে সেই অন্তর্বেদনাকে মূর্তি দিয়েছে। গণেশ গগৈ তরুণ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেইজন্য তাঁর কাব্যসম্ভার অপেক্ষাকৃত স্বল্প, কিন্তু যেটুকু তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাতে বোঝা যায় যে অসমীয়া কাব্য সরস্বতীর কতটা ক্ষতি হয়েছে। তাঁর কবিতার মধ্যে যে আন্তরিকতা, ভাববৈদগ্ধ্য এবং কাব্য ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট তাতেই তাঁকে নবীন কবিদের কাছে স্মরণীয় করে রেখেছে।

দণ্ডিনাথ কলিতা (১৮৯০-১৯৫০)-কে একজন হাস্যরস রসিক কবি বলা যায়। তাঁর 'রগড়' 'হরঘরা' (ব্যঙ্গবাড়ি), 'বহুরূপী' প্রভৃতি কাব্যচয়নে আমরা সত্যই পাই চমক লাগানো কৌতুক, হাসির কলরোল এবং অন্তর্ভেদী ব্যঙ্গ। তাঁর বাক্য সংযোজনে বিশেষ পারদর্শিতা এবং সেগুলি সুসজ্জিত করে দেখবার

কৌশল উল্লেখযোগ্য—এতে তাঁর কাব্য উপভোগ্য হয়। কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে বা গোষ্ঠীর উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ না করেও বা কোনো ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে বিরত থেকে তিনি তখনকার দিনের সমসাময়িক কুসংস্কার ও রসজ্ঞান-হীনতার বিরূদ্ধে তীব্র বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেন। তাঁর কতকগুলি কবিতা যেন পুরাতন সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে শাণিত তরবারির আঘাত।

প্রসন্নলাল চৌধুরী (১৯০০—) আর একজন বিপ্লবী অসমীয়া কবি যাঁকে বাঙালী কবি নজরুল ইসলামের সমধর্মী বলা যায়—তিনি একজন ভাঙনের কবি কিন্তু সেই পতনের মধ্যেও অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখছেন—পুরাতনের ভগ্নস্তূপের উপর গড়ে উঠবে এক নতুন বীর্য ও শৌর্যবতী বসুন্ধরা। তিনি বিত্তহীন রিক্তদের রাজা, কিন্তু চিত্তহীন নব এবং অভিষেক উৎসবে তিনি তাঁর রিক্ততার পতাকা-তলে সমবেত হতে সেই বিত্তহারাদের অনুরোধ করেছেন। ঐ এক সূত্রে ঐক্যের বন্ধনে তিনি করবেন সংগ্রাম। আবেগচঞ্চল শক্তিমান কবির মধ্যে দেশপ্রেম শুধু নন্দিত, বন্দিত, ছন্দিত হয় নি, তিনি তাঁর স্বদেশবাসীদের বিপ্লব আহ্বান জানিয়েছেন যাতে দেশকে নতুন করে গঠন করে মানবতার জয়গান গাওয়া যায়। এই কাব্য সংকলনের নাম 'অগ্নিমন্ত্র'—নামেই প্রকাশ পায় কবির তেজোদ্দীপ্ত অভিপ্রায়, কী তিনি চান, তাঁর আদর্শ কী। এই প্রতীকী অগ্নি যুগ-যুগান্তরের সব অনাচার-অবিচারকে ধ্বংস করবে, দগ্ধ করবে। যা কিছু অসুন্দর, যা কিছু কুৎসিত ও নীচ, তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছেন এই বিদ্রোহী কবি। প্রসন্নলালের স্বাধিকার প্রাপ্তির ইচ্ছা শুধু ভারতের সীমানার মধ্যেই সীমিত নয়, তাঁর দৃষ্টি চলে গেছে দেশে দেশান্তরে যেখানে উপনিবেশ গড়েছে বিদেশীরা এবং শোষণ শাসন চালাচ্ছে। 'অগ্নিমিত্র'-এর অনেকগুলি কবিতায় খেটে খাওয়া শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশার কথা আছে। কবি তাদের একতাবদ্ধ করতে চান এবং নূতনভাবে তাদের মূল্যায়ণ করতে চান। তাঁর কবিতা 'লাঙ্গলর গীত' (লাঙলের গান)-এ দেখি তাঁর প্রবল সহানুভূতি রয়েছে তাদের জন্যে যারা অক্ষম, দুর্বল, রাস্তায় পড়ে থাকে এবং বিশেষ করে যারা জমি চাষ করে।

আনন্দ বরুয়ার (১৯০৮ —) কাব্যে মানবিক চেতনা বোধের আধিক্য দেখা যায়, বিশেষ করে 'পাপড়ি' ও 'রঞ্জন রশ্মি' নামক দুটি পুস্তকে। আনন্দ বরুয়া অনুভব করেন যে জীবন হচ্ছে সৌন্দর্য-অভিযানে যাত্রা। তিনি

হাফিজের কিছু কবিতার অনুবাদ করেছেন। তাঁর মানবতাবাদে সুফীতত্ত্বের সৌন্দর্য চেতনার কিছু প্রভাব আছে।

পত্ত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা কালে একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে অসমীয়া সাহিত্যে—কি আধুনিক, কি পুরাতনী—চলতি সংগীত লহরীর বিহুনাম বিয়ানাম প্রভৃতির প্রভাব ছিল অসামান্য। এইগুলি বসন্তকালে উৎসব উপলক্ষ্যে ছন্দে গাঁথা গীতমালা যা আজ পর্যন্ত দেশের সর্বত্র গীত হয় এবং এই দেশজ লোকগীতির স্বর ও সুর বর্তমানকালের লেখাকেও সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত করেছে। অসমীয়া নৃত্যগীতের আসরে এই 'বিহু' তান (অনেকটা সুর করে গাওয়া বাংলা কীর্তনের মতো) খুবই প্রচলিত। মধ্যযুগে বৈষ্ণব ও শাক্ত সমাজ সংস্কারকরা তাঁদের নিজ নিজ বিশ্বাস ও মতানুসারে প্রচারের জন্য যে সব গান ও পদাবলী রচনা করতেন, তাদের বলা হত 'বরগীত'। সেইগুলি আজও প্রচলিত, ভাষা ও ভঙ্গি বদল করে নেওয়া যায়। তাদের রচনাশৈলী ও শিক্ষাকৌশল অনবদ্য এবং নৈতিক সুরও উচ্চগ্রামে প্রতিষ্ঠিত। এই সব বরগীতের অনুসরণে ও অনুকরণে নানা গীতও লিখিত হয়েছে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে।

এই শতাব্দীতে লক্ষ্মীরাম বরুয়াই প্রথম গীত-রচয়িতা। তাঁর গানের সংকলন—'সংগীতকোষ' ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। যদিও এইগুলির মধ্যে সুর লক্ষ্য করা যায়, এই গানগুলির মধ্যে বরগীতের প্রভাবও স্পষ্ট বিশেষ করে বাক্য বিন্যাসে, সুরে এবং বিষয় নির্বাচনে। তাঁর গানে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র প্রভাবও কিছু আছে।

পদ্মধর চলিহা (.৮৯৫-.৯৬৯) আর একজন গীতরচয়িতা। তাঁর 'ফুলানি' (উদ্যান ১৯১৫), 'গীতলহরী' (১৯২১) এবং 'সরাই' (কাব্যের ফুলদানি ১৯২৮) এক সময়ে খুবই জনপ্রিয় ছিল। সেগুলি প্রধানত ভক্তিমূলক, স্বাদেশিক, প্রেমসূচক ও তত্ত্বঘটিত।

কমলানন্দ ভট্টাচার্য আর একজন কবি, সুগায়ক এবং অভিনেতা ছিলেন। 'বাউলি' (অসংবৃত বা ছড়ানো) বলে তাঁর যে কাব্য সংকলন আছে তাতে একজন কূট তার্কিককে দেখি, যার সঙ্গে মিশেছে একটি তেজস্বী বুদ্ধিভিত্তিক রসিক মধুমিশ্রিত মানসের লেগে থাকা সুর। তিনি আসামের অতীত গৌরবকে স্মরণ করেছেন অত্যন্ত মনোবেদনার সঙ্গে। তিনি অপরিমিত

সৌন্দর্যের পূজারী। কখনও কখনও তাঁর স্বর ভগবদ্ ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে প্রশস্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তিনি সব সময়ই অনুভব করেন যে তাঁর স্বর্গীয় প্রেমিকার বিরহ তিনি সহ্য করতে পারছেন না এবং জীবাত্মা চাইছে সেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলন মহোৎসব। তাঁর শেষ গানগুলি তাঁর কারাবরণের আত্মাহুতির প্রেরণায় ও অভিজ্ঞতায় প্রোজ্জ্বল। তিনি মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য স্বেচ্ছায় সেখানে গমন করেছিলেন। কমলানন্দের কাব্যের প্রথম ছত্রগুলি অপরূপ—

হ্রদের মাঝে কমলদলগুলি চকচক করছে চাকচিক্যময়
এবং পদ্মপত্রগুলির উপরে জলস্রোত কলকল ঝিকমিক চলেছে
... ...
ওগো মা, তোমায় আমি গভীরভাবে ভালোবাসি
... ...
বার বার করি প্রণাম হে আমার আসাম
আমার জননী জন্মভূমি
পুণ্য পুত বিশুদ্ধ আর কিছু নেই, তুমিই তুমি।

সুরের বৈচিত্র্যে, স্বরের শোভনতায়, শব্দ যোজনার ব্যঞ্জনায় এবং মন কেড়ে নেওয়া চিত্রাঙ্কনে, কমলানন্দের সমকক্ষ বিশেষ কেউ ছিলেন না। তাঁর কাব্য ভাববিন্যাস ও তার পরিমাপ ছিল সুষ্ঠু এবং এক একটি ঘটনার অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যার মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। স্বাধীনতা, শক্তি ও আনন্দের সঙ্গে বাক্যাবলী ও ছন্দ এগিয়ে চলে এবং তাদেরই সম্যক রসায়নে কবিতাগুলির মধ্যে ফুটে ওঠে একটি সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ের ধারা। এখানে আঙ্গিক আসে যেন তার সঙ্গীর হাত ধরে, কিছুই অকৃত্রিম বোধ হয় না স্বতোৎসারিত কাব্যচ্ছটায়।

উমেশচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন আর একজন কবি যিনি নানা বিষয়ে প্রায় তিনশত গান ও কবিতা লিখে রেখে গেছেন এবং এর মধ্যে বেশ কিছু সংকলিত আছে—'প্রতিধ্বনি', 'দৈবধ্বনি', এবং 'মন্দাকিনী' নামক পুস্তক তিনটিতে। বেশির ভাগ ধর্ম ও অধ্যাত্মবিষয়ক কবিতাতে একটা অপ্রমত্ততার, আত্মাহুতির ও আত্মত্যাগের চিত্র ও পরমের সন্ধানে যাত্রার ছবি। 'মন্দাকিনী' একটি সুশোভন প্রেমবিষয়ক কাব্য, কিন্তু ইহৈব অর্থাৎ এই জগতের। উমেশচন্দ্রকে কিন্তু লোকে বেশি জানে তাঁর স্বদেশী গানের জন্যে যার অনেকগুলির মধ্যে

চিন্তাধারার সরলতা ও পারিপাট্য, ভাষার চমৎকার ব্যবহার এবং স্বচ্ছ সাবলীল গতি এমন একটা সরল শক্তি নির্ঝরের সৃষ্টি করে যে তাঁর রূপকথাগুলি যেন অমরতার জন্য মার্জিত হয়ে রয়েছে—

আমার মাতৃভাষা, সে যে সর্বক্ষণের ভালোবাসা

... ...

হে মাতা আসাম, তুমি অতুলনীয়া, তোমায় প্রণাম

... ...

টানো দাঁড়, চালাও তরণী
তোমাদের তরে সহস্র সহস্রবার উঠুক অভ্যর্থনা ধ্বনি
ওগো সমাগত ভক্তের দল
তোমরাও শুধু অন্ধ অনুরাগ রঞ্জিত নও সকল
পেয়েছ আলোক হয়েছ চঞ্চল
মাতৃভূমির সেবায় ব্রতী চারণদল
চল, চল,

উমেশচন্দ্রের গানগুলিতে শুধু ভাষার কারুকার্য নয়, সত্যই যাদুস্পর্শ আছে। তাদের সুরধারা, কাব্যিক রূপকল্প এবং শুদ্ধ ভাব চেতনা অসমীয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশের অন্যতম বলে পরিগণিত হতে পারে। 'অমৃত-মন্থন' নামক সংকলনে তাঁর কবিতা 'মন্ত্র সাধনা'তে আমরা পাই কবির স্বদেশপ্রেমের একটি উজ্জীবিত আলেখ্য এবং সুনিষ্ঠ মানবতাবাদের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি। কবির সমাজসচেতন চিন্তায় এমন একটি ব্যবস্থাগঠনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে যে, যেখানে সবাই সমান এবং সবাই সুবিচার পাবে—

আমরা নব প্রজন্মের মানুষ
আমরা আনি নব উৎসাহ উদ্দীপনা
এবং কদম কদম এগিয়ে যাই সেই সূত্র প্রতিষ্ঠিত করতে
সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রী
উচ্চনীচ সবাইকে করি আমরা আলিঙ্গন অভ্যর্থনা।
যারা অনুন্নত দরিদ্র যারা পরদেশী তাদেরও
আমরাই অশুচি গ্রন্থিগুলি দিব খুলে
সব রাষ্ট্রনীতিক শিকড়গুলি পড়বে লুটে।

'ত্রিবেণী' নামক সংকলনে তাঁর কবিতা 'কবির কারেং' (কবির প্রাসাদ)-এ পড়ি যে কবি জনসমাজ থেকে দূরে অশ্রুসিক্ত শ্রমদীর্ণ জীবন থেকে পালিয়ে কল্পনার যে আবরণ সৃষ্টি করেছেন তা তাসের দেশের মতো খসে পড়ছে এবং এই সময়ে তিনি একটি ভিখারিনী কন্যার সাক্ষাৎ পান। এই ভিক্ষুক দরিদ্র রমণীই পদানত মানবতার প্রতীক। তিনি যে এতদিন সমাজ থেকে দূরে হস্তীদন্তের প্রাসাদের চূড়ায় বসে দেশকে ও তার অভাব অভিযোগকে উপলব্ধি করছিলেন, প্রকৃত সত্যের সংস্পর্শে এসে তার সে ভ্রান্তি দূর হল এবং নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রত হয়ে তিনি দেখছেন

কৃষকের শীর্ণ দীর্ণ শোষিত এবং ক্ষুৎপীড়িত চেহারা
শ্রমিকের অবলাঞ্ছিত লুণ্ঠিত ক্ষতবিক্ষত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
নিরক্ষর নিরন্ন লক্ষ লক্ষ নরনারীর মিছিল
শোষণের যন্ত্রমাহাত্ম্যে ওই যে বিকল সকল
তাদের কাতর ক্রন্দন শুনেছ কি—অন্নহীন অসুস্থ যারা
এবং যারা পায় না শিক্ষা, অজ্ঞান, অসুস্থ যারা
অবহেলিত পদদলিতের দল।

উমেশচন্দ্রের কবিতাগুলি এক এক সময় একটা সংহত দুর্বার শক্তির প্রতিবেদন রূপেই দেখা দেয় এবং সেখানে পাই আমরা একটা গুরুবেদনার ভারের প্রতীক চিত্র, কিন্তু তাদের বর্ণনায় সতেজ চাকচিক্যের অভাব আছে।

অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর গীতে ও কবিতায় কিন্তু এই হাহুতাশ কান্না দুঃখ মিশ্রিত অবসাদের চিহ্ন নেই, বরং সেইগুলিকে অতিক্রম করে কি ভাবে তেজ, বীর্য ও বলাধানকে আহ্বান করা যায়, তারই সক্রিয় সমাধানের ইঙ্গিত আছে—ওঠো, জাগো, নিজের ভাগ্য নিজে গঠন করে তোলো, হও বীর উন্নত শির, স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ো না, বা মিথ্যা ক্রন্দনে আপ্লুত হয়ো না। তোমাদের নিজেদেরই গড়ে তুলতে হবে সুন্দরতর সংসার, যেখানে থাকবে না মিথ্যা জুলুমজবরদস্তি, অবিচার, অসাম্য।

জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৯০৩-৫১) সেই যুগের কবিকুলের আর একজন সুধী যাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে তিনটি ভাবনা—স্বাধীনতা, স্বদেশপ্রেম এবং একটি ন্যায় ও সাম্যদ্যোতক সমাজ ব্যবস্থা। আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেভরা স্থানগুলি, তার অতীত গৌরব কাহিনী এবং সুষম

সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। রামায়ণের হনুমন্ত যেমন আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয়ে সমুদ্র পার হয়েছিল, কবিও তেমনি আসামের পূর্ব স্মৃতিকথা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে চাইতেন যে দেশ শৃঙ্খল বিমুক্ত হোক—সে আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব পর্যায়েই সে এক নবতর অধ্যায় শুরু করুক—আসামের নবজন্ম হোক। এই মহান কাজে আত্মনিয়োগ করতেই তিনি যুবকদলকে মন মাতানো পাগল করা গান শোনান। সেই সব মন-নাড়াদেওয়া বক্তৃতা, উচ্চভাব, সময়োপযোগী সুর ও ধ্বনিদত্ত তাল তাঁর গানগুলিকে অপূর্ব করে তুলেছিল,। 'বিশ্বজিৎ তরুণ', 'অসমীয়া ভাই সব, সময় হয়েছে এবার', 'মাতৃমন্দির অঙ্গন শূন্য', 'তুমি জ্বালছো কেন আলো,' 'আমরা তরুণ, আমরা মৃত্যুরে করি না ভয়,' 'লোহিত নদীর উপর' প্রভৃতি কবিতা ও গীতগুলি আসামে চিরকালের জন্য প্রতিধ্বনি তুলবে তরুণতর সমাজকে আহ্বান জানিয়ে।

শিলং-গৌহাটি সর্বভারতীয় বেতার কেন্দ্র স্থাপনের পর অসমীয়া ভাষায় গান রচনা করবার একটা তরঙ্গস্রোত এসেছিল এবং অনেকগুলি গানের বই প্রকাশিত হয়, যেমন মহেশ গোস্বামীর 'অময়', মলিন বোরার 'রেণু' এবং 'সুরের কবিতা,' ভূপেন হাজারিকার 'জিলিকার লুইতারে পার,' লক্ষ্মীহীরার 'সুরসেতু' ও 'প্রথমা', তফজ্জল আলির 'মন্দাক্রান্তা' কমল চৌধুরীর 'গীতাবলী,' সূর্য বরার 'সুর-সন্ধানী', আলিমুন্নিসা পিয়ারের 'সুরনির্ঝর' এবং দেবেন শর্মার 'সলিতা'। এইসব আধুনিক অসমীয়া গানগুলি শুধু যে অতীতের ঐতিহ্যানুসারী ভক্তি, প্রেম, স্বদেশের প্রতি প্রীতি বা প্রকৃতির সৌন্দর্যের সম্বন্ধেই লিখিত তা নয়, বরং এইগুলি সাধারণ জনগণের স্বাধীনতা ও সাম্যের সংগ্রামকে সাহিত্যের মাধ্যমে টেনে এনে নিজেদের জাগরিত করার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরেছে। ভূপেন হাজারিকার রচিত গানগুলি এ ধরনের চেতনার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট এবং তিনি অসমীয়া গীতগুলিকে প্রাচীন রীতিনীতি, সুর, ঢং, গায়কী পদ্ধতি থেকে মুক্ত করে নবরূপায়ণে প্রতিষ্ঠিত করবার সার্থক চেষ্টায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর গান 'ঝট্ ঝট্ ঝট্ রেল চলে,' পাথর ভাঙানিয়া শ্রমিকদের গান 'ভাঙ, ভাঙ শিল, ভাঙোটা,' বা পালকিবাহকদের দুঃখের দুঃস্বপ্ন 'হে দোলা, হে দোলা, বড় বড় মানুষের দোলা' প্রভৃতি গানগুলি অনবদ্য। এছাড়া আছে মৎস্যজীবীদের জন্য 'রঙ্গমন মাছলাই গোল'—চা-বাগানের শ্রমিকদের

দুর্ভাগ্যের ইতিকথা 'এটি কলি, দুটি পাতা রতনপুর বাগিচায়' প্রভৃতি। বলাই বাহুল্য যে ভূপেন হাজারিকার গানের স্রোত এইসব নিম্নশ্রেণীর বিত্তহারা নরনারীকে কেন্দ্র করে রসসিঞ্চিত হয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। অবশ্য এর সঙ্গে মিশেছে লোকসংগীতের ধারা এবং স্থানীয় ইতিকথার প্রলেপও, যা পথচারী পথিক বা বাউল দল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বয়ে নিয়ে যেত। এই ধরনের লেখায় আর একজন শিল্পী খ্যাতিলাভ করেছেন—তিনি কবি কেশব মহান্ত—যাঁর ছড়া ও কবিতাগুলি সাধারণ মানুষের মনের কথাকেই ব্যক্ত করছে। তাঁর একটি চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে সেই গানটি 'জেউতি তোলাই মনত পরে' (যুবতী, তোমায় পড়ে মনে)—এই কবিতাটির ভাবার্থ হচ্ছে যে একটি ডাকপিয়নের মনে পড়ে যে দূরে গ্রামে তার প্রিয়াকে সে ফেলে এসেছে। এইসব মানবিক আবেদনভরা সাধারণ জনগণকে নিয়ে লেখা গানগুলি 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলে'ও দুঃখবাদী নয়। বরং তার জীবনের প্রতি অনুরাগে ও সুন্দরী পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে আছে এই শাশ্বত বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তফজ্জল আলির 'মন্দাক্রান্তা' (ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ) তাঁর প্রথম গানেই প্রতিফলিত।

এই ধরিত্রীর প্রতি ভালোবাসা থেকে বিচ্যুত নয়, অথচ অন্য ধরনের কবিতার রচয়িতা কেশব মহান্ত এবং নবকান্ত বরুয়া। এঁরা কবিতার মাধ্যমে সৌরতেজকে আহ্বান করলেন এবং অপূর্ব গীতিতে সেই সাবিত্রী-তৃষা তৃপ্ত হল যেমন—'প্রথম অরুণোদয়ের চমক রেখা', 'হে সবিতা, কোথায় তুমি পেলে এই বিশুদ্ধ সুবর্ণ বর্ণের হাসি', 'সমস্ত রাত্রি আমার চক্ষু নিদ্রাহীন তোমার দর্শন কামনায়', 'আমরা চলেছি আলোকের সন্ধানে', 'মেঘ বিদারণ করে চলো আমরা যাই সেই বিচিত্র বরণী রঙের মেলায়', 'ওগো মহাকাশ, দাও আমাদের একটু ছোট্ট আকাশ'—এইসব উপমা ও ব্যঞ্জনা আধুনিক অসমীয়া গীতিতে শুধু আছে নয়, বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেইজন্য এই মন্তব্য বোধ হয় অসমীচীন হবে না যে আধুনিক অসমীয়া গীতিগুলির বিষয়বস্তু তাদের বিশিষ্ট বক্তব্য বাদেও এই শ্যামলা ধরণীর মাধুরীর জন্য ব্যাকুলতায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আর এক দৃষ্টি ঊর্ধ্বে সূর্যের আলোকের জন্য ঘন আতপ্ত কামনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

নূতন কাব্য

কবিতা হচ্ছে ভাবাতিশয্যের আবেগে ভাষায় ও ছন্দে এক মূর্ত প্রকাশ এবং সাহিত্য হচ্ছে চিন্তা ও চেতনার ধারা। আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে তার বিশিষ্ট নিদর্শন—ডারউইন, ফ্রয়েড, ইয়ুং, মার্ক্সের চিন্তাধারা এই সাহিত্যে প্রতিফলিত। ফ্রয়েড বললেন যে আমাদের অচেতন মন নির্জ্জান নির্দেশনায় জীবনকে চালিত করে এবং তাকে অবদমন করলে কি কুফল হয় তাও তিনি নির্দেশ করেছেন, আবার ইয়ুং সামগ্রিক নির্জ্জানের প্রাথমিক স্তরগুলি কি ভাবে মানুষের চেতনায় প্রাকৃতিক স্তর থেকে অতিপ্রাকৃতে নিয়ে যায় তার সন্ধান দিয়েছেন। এই সব মনস্তাত্ত্বিকদের সাধুবাদ যে তাঁদের কল্যাণে কবিতা অন্তরের অশরীরী সত্তার বিকাশ ও প্রকাশ বা স্বপ্নসমবচনসম্ভার বলেই পরিগণিত হতে আরম্ভ হয়। ইয়ুং প্রাচীন অলৌকিক প্রবাদ কাহিনীগুলিকেও ('মিথ') সেই সেই জাতির বিশিষ্ট অবদান বলে না স্বীকার করে তাদের জ্ঞান পরিধির সীমানা নির্দেশ বলেই মনে করতেন। এই অনুমান অনুসারেই কবি ইয়েট্স্ এই ধরনের ঐতিহ্যবাহী কাহিনী সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেন এবং তাঁদের নিজেদের ভাবপ্রতীক হিসাবে ব্যবহার করতেন।

আজকালকার এই ধরনের সংগ্রহের বেশিরভাগই মার্ক্সীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। এই সমাজতন্ত্রবাদের ভাবধারার কবিতাগুলি দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ হলেও সমাজের এক দুর্ভাগ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি খুলে দেয় যা একদিন একটা বিপুল বিপ্লবের ধাক্কায় ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আজকালের তরুণ ও উদীয়মান কবিদের রচনা এই দ্বন্দ্বমূলক বিরোধবাদের দ্বারা প্রভাবিত। দুটি বিশ্বযুদ্ধে এই ব্যক্তি সমাজের প্রতিক্রিয়াই আধুনিক কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা জানি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্ৎস্ কাফকা, টমাস মান, টি. এস. এলিয়ট এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য কবিরা কেমন ভাবে ঘটনার স্রোতে হতবাক্ ও বিগতমোহ হয়েছিলেন। এলিয়টের এই সুর তদানীন্তন অসমীয়া কবিদের উপরও প্রভাব ফেলেছিল। একটা ঐতিহাসিক ব্যবধান যে সৃষ্টি হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায় যখন দেখি যে আজকালকার তরুণ সাহিত্যিকরা অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন প্রতীচির বর্তমান

সাহিত্য থেকে যতটা, ততটা ঐতিহ্যবাহী নিজেদের প্রাচীন সাহিত্যের থেকে নয়। এখনকার অসমীয়া কবিতায় তাই দেখি একটা অবিশ্বাসের সুর, সন্দেহ সংশয়ের আভাস—পুরাতনীর প্রতি অবজ্ঞার ভাব—সত্য, শিব, সুন্দর, ধর্ম, নিষ্ঠা, বিচার, প্রেম ; সবই যেন এহ বাহ্য। তাঁরা নূতন সময়োপযোগী পুনর্বিচার করতে চান। তাঁদের পুরানো বিশ্বাস গিয়েছে হারিয়ে, কিন্তু তাঁরা এখনও নবচেতনায় জাগ্রত হয়ে ওঠেন নি—একজন কবি জিজ্ঞাসা করছেন—"ভগবান, ভগবান, তুমি কি শুধু বীজগণিতের অজানা সংখ্যা—এক্স ?"

এই যে প্রাচীন বিশ্বাস উত্তরপুরুষরা হারাচ্ছেন, তার জন্য বেশ কিছুটা দায়ী আধুনিক মনস্তত্ত্ববাদ এবং সামাজিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞান। ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান অবদমনবাদ শুধু কাব্যের ভাষা ও তার বহিরঙ্গকেই আক্রমণ করে নি অন্তর্চেতনাকে আঘাত করেছে। মনের গূঢ় ইচ্ছা ও অবদমনই স্বপ্নে প্রতিফলিত হয় এবং ফ্রয়েডের মতে এইগুলিই অন্তর্নিহিত কামনা বাসনার পরিচায়ক ও প্রতীক। আধুনিক কবির কাছে বাক্যও প্রতীকোপাসনার মতো অন্তর্জীবনের অনুজ—যা ঘটছে তারই ছায়া। স্বপ্নে দেখা ঘটনাবলীর যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, কবিতার বাচন বা ছন্দ ভঙ্গিরও তেমনি কার্য কারণের সম্পর্ক সব সময়ে আনুপূর্বিক বিশ্লেষিত করা যায় না। একই প্রতীক বিভিন্ন ভাবের রূপায়ণও হতে পারে—কল্পনার মধ্যে যে একতারায় এক সুর বাজাছে তা না হতে পারে—সেখানে মিশ্র রাগিণীই সম্বল। ফ্রয়েডের এই অবদমন বা মানসিক ভাব বৈচিত্র্য বা বৈকল্যবাদ প্রেমকে নানা রঙে প্রতিফলিত করে। কবি প্রেমের সেই অতীন্দ্রিয় অনশ্বরতায় আস্থা হারিয়েছেন। একজন নগ্নিকা তপ্তরক্তা কামিনীই তাঁর দৃষ্টি পথের শুকতারা। আবার অন্য এক ধরনের কবিসমাজকেও মার্ক্সীয় দর্শন ও চিন্তাধারা প্রভাবান্বিত করেছে। এঁরা উপহাসছলে বলে থাকেন যে একটা ক্ষীয়মান সমাজে, প্রেম, বিশ্বাস বা কৃষ্টি চেতনা নূতনদিনের নূতন সূর্যসনাথ সমাজগঠনে অচল এবং এই সব আদর্শের বুলিকে প্রশ্রয় না দেওয়াই কর্তব্য। আবার হতাশ্বাস কবিরও সন্ধান মেলে যিনি মনে করেন যে এই বস্তুবাদী সামাজিক সভ্যতার অবসান অবশ্যম্ভাবী—সেই মৃত্যুর দিন আগত ঐ।

আধুনিক কবিদের অনেকের রচনাই বহুলভাবেই পঠিত হয়। তাঁরা পৃথিবীর অন্যদেশের সংস্কৃতি থেকেও বহু মাল মশলা সংগ্রহ করেছেন। সেইজন্য

তাঁদের রচনায় প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের বহু মনীষার বক্তব্যের ধারা মিলিত হয়েছে, শুধু তাই নয়, ইতিহাস, লোকবিশ্বাসের উল্লেখও তাঁদের রচনায় সুলভ। সেইজন্য তাঁদের লেখায় বেশ কিছু বিদেশী শব্দ, অর্থ ও প্রয়োগভঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটেছে যা সাধারণ পাঠক পাঠিকার পক্ষে অনেক সময় দুরূহ ও দুর্বোধ্য। যুদ্ধ-পূর্বের কবিরা দেশের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যেরই বিশেষ বর্ণনা দিতেন। তাঁদের কাব্যে ফুটে উঠত গ্রামীণ সভ্যতার সৌন্দর্য, সুখ, দুঃখ, দারিদ্র্যের বেদনা ইত্যাদি। আজকের কবিরা নগর-সভ্যতা সচেতন। নগরগুলিই আধুনিক সংস্কৃতির মুখ্য রক্ত-সঞ্চালক নাড়ী। এখানেই মধ্যবিত্ত সমাজের বাস এবং তাদের কর্ম ও বিলাসের আবাস। কয়েকজন কবি এই নাগরিক জীবনের মন্দ দিকটির কথাও ভেবেছেন—তাদের অপরিচ্ছন্ন যৌনতা, তাদের শৃঙ্খলাহীনতা ইত্যাদি। তরুণ কলেজ ছাত্রদের অপরিণত প্রেমের কথাও তাঁদের কাব্যে চিত্রিত হয়েছে। সেগুলি যেন অভিনয়ের ছবি, বাস্তবে ভিত্তিহীন ও অসার।

কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গির বৈপ্লবিক রূপ পরিবর্তনও যথেষ্ট সাধিত হয়েছে—প্রথম পরিবর্তন গদ্যছন্দের ব্যবহার ও সাধারণভাবে কথ্যভাষার সঙ্গে পদ্যছন্দ ও রীতির সামঞ্জস্য বিধান, দ্বিতীয়টি গদ্য ও পদ্যের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তার দূরীকরণ। এইভাবে কাব্যের প্রয়োজনে গ্রাম্যভাষার ও গদ্যরীতির ছন্দ ও ব্যঞ্জনা ব্যবহৃত হতে লাগল। অনেকে মনে করেন যে পুরনো মুদ্রার মতো প্রাচীন শব্দ বা বচন সমুচ্চয় কালের প্রভাবে অপ্রচলিত হওয়া উচিত। তারা নাকি ভাবরাজ্যে আন্দোলন তুলতে বা ঘাতপ্রতিঘাত করতে পারে না। ঐ শব্দ নিশ্চয় এখনকার যুগের বাণী বইতে হয় অক্ষম না হয় অচল। সেইজন্য আজকের কবিরা পুরাতনী বাক্য বা উপমা সাহিত্যে ব্যবহার করতে চান না। যদিও বা কখনও তা করতে হয় তখন তাঁরা সেই সব প্রয়োগগুলিকে নতুন ভাবে রঞ্জিত করে নতুন ভাষ্য আরোপ করতে চান। তাঁদের নিজেদের ভাব ও ভাষাকে সুস্পষ্ট করে তুলবার জন্য তাঁরা বিশ্ব সাহিত্যে অবগাহন করতে চান। এর ফলে তাঁদের লিখিত ভাষায় প্রচুর বিদেশী শব্দ, বাক্য যোজনার রীতি ও ইঙ্গিত প্রবেশ করেছে।

আজকের তথাকথিত আধুনিক কবিতায় তাই ছবিগুলি শুধু দণ্ডায়মান প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, সেগুলি সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্যও বটে। এই আদানপ্রদানের সংঘর্ষে বা ভাব্যরাজ্যে অনুভূতির বিনিময়ে একটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় মনোজগতে যাতে

তারা এক নূতন ধরনের আনন্দের স্বাদ পায়। 'চন্দ্রালোকের অন্ধকারে ও চোখের জল সুগন্ধ বহন করে আনে', 'সূর্য চিৎকারের দ্বারা আমাদের খোঁজ দেয়,' 'তাহাদের আকাশ নরম,' 'এক বৃদ্ধের গাত্রচর্মের মতো এই পৃথ্বী কর্কশ' প্রভৃতি বাক্যবিন্যাসগুলি মনে হয় যেন মহিলা কবি এডিথ সিটওয়েল বা রিল্‌কের দ্বারা প্রভাবিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অসমীয়া কাব্যকে ও কবিদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল ইংরেজি কাব্য। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসী, রুশ, জাপানী ও চীনা কাব্যের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। এই নব সাহিত্যে, বোদ্‌লেয়ার, পল ভ্যালেরি, ষ্টিফেন মালার্মে এবং রেইনার মেরিয়া রিল্কের ভাবের, রূপকল্পের, সুরের ছায়া পাই। এই সব নবীনকবিরা লাফ দেওয়া ছন্দও ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা এত বিদেশী রং ব্যবহার করেছেন যে তাঁদের কবিতায় আন্তর্জাতিক রূপটাই বেশি প্রকট। তাঁদের ভাষা 'এসপ্যারেণ্টো'র পর্যায়ে পৌছেছে। ইউরোপের 'ইমপ্রেসনিস্ট' কবিদের মতো তাঁদের কাব্য এত প্রতীক ও রূপকের চিত্রে ভরা যে এক এক সময় তাঁদের স্বাভাবিক পারস্পরিক যোগাযোগ বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য হয়। যে কোনো দেশের বা সময়ের বা সংস্কৃতির কোনো প্রতীক বা রূপকল্প সহসা এইসব নবীন কবিদের কাব্যেও ব্যবহৃত হলে সাধারণ অশিক্ষিত পাঠকপাঠিকার পক্ষে তার সম্পূর্ণ মর্মোদ্ধার করা শক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে ইতিহাসের ও ভূগোলের যে সব উল্লেখ আছে সেগুলি সবই প্রতীক। উদাহরণ স্বরূপ হেমকান্ত বরুয়ার কাব্যই ধরা যাক। হেমকান্তের কাব্যে পিরামিড, হিরোশিমা, নাগাসাকি শুধু নাম নয়—তারা সভ্যতার কবরভূমি। তারা নৈতিক অবলুপ্তির চিহ্ন। আবার হেমকান্ত যখন মহাকাব্যের চরিত্রগুলির নাম ব্যবহার করেন তখন তার ভিতরে আপাত অদৃষ্ট অন্য অর্থও থাকে। শান্তনুবংশের বংশধর বৃহন্নলা নাম যখন তিনি কাব্যে উপস্থাপিত করেন তখন তিনি আজকের সমাজেও এই ধরনের ক্লীব মানুষ আছেন তারই ইঙ্গিত দিচ্ছেন। কুন্তী, শকুন্তলা, দময়ন্তী প্রভৃতি সতী চরিত্রকে তিনি অন্য ভাবে রূপায়িত করেছেন। এইসব পৌরাণিক চরিত্রগুলি তাঁর প্রতীকী দর্পণে অন্যভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ নিম্নলিখিত কাব্যে ('আমরা কখনও বিশ্রাম করতে পারি না') পাওয়া যায়:

আমাদের চিত্তকে করো শান্ত
আরক্ত সাহসে। সীতা মহা কবিতা
রয়েছেন শায়িতা হলকর্ষণের নিম্নে।
স্বর্ণবর্ণ লাঞ্ছিতা মৃতা মৃগী আমাদের কাছে ডাকছে
এবং আমাদের সুবর্ণ গাত্রবর্ণও সেইসঙ্গে নাচছে
হে শকুন্তলা, আমায় ডেকো না
আমি ভস্মীভূত হয়ে যাই আমায় ফেলো না
কোরিয়া ভূখণ্ডে শ্বেতবর্ণ কাকও যেমন দৃষ্টিগোচর হয়
তেমনি কৃষ্ণবর্ণ ধানও সেথায় রয়
আমাদের শস্য উত্তোলন, হে প্রিয়া
তোমার ভরা যৌবনের মত্যেই পূর্ণ হিয়া
চরকার কাঠি ঘুরছে তোমার ওই চম্পক অঙ্গুলির সঞ্চালনে
তুলার ফাঁকে।
ইতিহাসের অভিনয়ের সাজঘরে
আমাদের তপনদেব নিদ্রায় নিমগ্ন
আমাদের দাবীর চিৎকার ধ্বনি লুটিয়ে পড়ে
মহাকালের বালুতটের গভীর স্তব্ধতায়
কত শতশত মানুষের কণ্ঠে ওই ধ্বনি, চলেছে তারা
তাদের দাবীর প্রিয় বক্তব্য কণ্ঠে উন্মত্ত যারা
এই তো মানুষের যাত্রা—চলেছে, বীর ভৈরব গর্জনে
কলস্রোতা ব্রহ্মপুত্রের পাশ দিয়ে
শতাব্দীর বুভুক্ষা তাদের উদরে নিয়ে
আমাদের বক্ষের উষ্ণ রক্তস্রোতে
এই তো জীবনের ডাক, বেঁচে থাকার মতো বাঁচার,
কার জন্য, তোমার জন্য, আমার জন্য
এবং আমাদের মত লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য
এসো, বসো, আমার কাছে,
মৃত মধ্যাহ্ন মরে যাক তোমার ঐ চোখের আগুনে
ওই আঁখি নেকড়ে বাঘের চোখের চেয়েও শাণিত

আমাদের পথ আমাদের ডাকছে
যেখানে শতশত যুগের আলোক বর্তিকা জ্বলছে, ভাসছে
বিরোধের কথা, কাব্যের শকুন্তলা মরে না
এবং আমরা মানুষরাও বিশ্রাম পাই না

যে কাব্যরীতি কবি গ্রহণ করেছেন তা একটি অনতিবিশ্বাসী মনের সুতীব্র ব্যঙ্গাত্মক স্বর—আজকের সভ্যতার ভিতর লুকিয়ে থাকা শূন্যগর্ভ মিথ্যাচার ও অনাচারগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ কশাঘাত। নতুন কবিরা পূর্ব ও পশ্চিমের বহু রচনা পাঠ করবার সুযোগ পেয়েছেন এবং তাঁদের লেখনীতে এ ধরনের উদ্ধৃতি অজস্র। এই উক্তিগুলি কখনো এসেছে ইউরোপের সাহিত্যসম্ভার থেকে, কখনো উপনিষদের বৈষ্ণবগাথার বা লোকগাথার ভাণ্ডার থেকে। কখনো তাঁরা আসামের প্রাচীন তথাকথিত রোমাণ্টিক বা ভাববহুল সাহিত্যকে উপহাস করেছেন। কিন্তু একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যেই তাঁরা এ কাজে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁদের লক্ষ্য শিক্ষিত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজ চিত্তকে ভাব সংঘাত ও আঘাত দিয়ে প্রবুদ্ধ করা—যেমন মনস্তত্ত্ব বিশারদ চিকিৎসকরা ভারসাম্যহীন রোগীদের দৈহিক 'শক' দেন। কবিদের আঘাতও হচ্ছে এই এক ধরনের মিশ্রভাষায়, নানা ধরনের বিভিন্ন বা বিপরীত উক্তিতে সাহিত্যস্নায়ুকে উত্তেজিত করে স্বস্থ ও সুস্থ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে প্রায়ই এই সব বহুজ্ঞান বিস্তৃত সদুক্তিকর্ণামৃত বা ঋজু বক্তব্যগুলি সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের মনে কোনো আন্দোলনের তরঙ্গই তোলে নি। নবকান্ত বরুয়া এই যুগের একজন উচ্চমানের কবি হবার খ্যাতি অর্জন করেছেন। নবকান্তর প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম—'হে অরণ্য, হে মহানগর', 'একটি দুইটি এগারোটি তারা' এবং 'যতি'। নবকান্তর মধ্যে অন্যের চেয়ে টি. এস. এলিয়টের প্রভাবই প্রচুর। এলিয়টের মতন তিনিও বিশ্বাস করেন যে কবিতার ভাষা, গদ্যের ভাষা থেকে ভিন্ন হওয়া উচিত, এমন আঙ্গিক হবে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত বোধিকেও রূপ দিতে সমর্থ হবে। স্বভাবতই নবকান্তর কাব্য দুরূহ হয়ে উঠেছে। আমাদের সভ্যতার সংকট দিনে দিনে বৃহত্তর ও ইঙ্গিতবহ হয়ে ওঠায় চিন্তা ও চেতনার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে ভাষাকে সুদৃঢ় করতে হয়। উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য নবকান্ত কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে

বাস করেন এবং তার ফলে তিনি রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী ও আরও কয়েকজন বাঙালী কবির সাহচর্য লাভে সমর্থ হন। কোথাও কোথাও তাঁর কাব্যে ও সুরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আমেজ মেলে। তিনি কবিতার আঙ্গিককে বারে বারে ছন্দ ও ধ্বনির তালে তালে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তিনি ছন্দগঠনে মিত্রাক্ষর, অমিত্রাক্ষর দুয়েরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং উভয় ধারাতেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এলিয়েটের মতোই তিনি বর্তমান যুগের একঘেয়েমি, দ্বিধাবিভক্ততা, আন্তরিকতা ও অতিরিক্ত আত্ম সচেতনতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং মধ্যবিত্তদের তথাকথিত 'নাকউঁচু-ন্যাকামি' সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু তার জন্য তিনি কখনও তিক্ত নন। জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে গ্রহণ করে তার রসোদ্ঘাটনই তাঁর কাব্যের মৌলিক সুর। কবির অনুভূতি নিয়ে ও উপলব্ধিগুলি এই ধরণীকে সুন্দর ও উন্নত করেছে, এইটি তাঁর কাছে সত্য, এগুলি নিছক প্রতীক প্রতীতি নয়, কাব্যের উপমা নয়, কবির জীবন সত্য। এই পৃথিবী থেকে সকলকেই চলে যেতে হয় তবু বারে বারে ফিরে আসতে চান তিনি (ফিরে আসার কাব্য)। এই বৃহৎ ও মহান নীল আকাশের নিচে, বৃহত্তর ও পূর্ণতর জীবন যাপনের জন্য কবির ভালোবাসা ও অকৃত্রিম কামনা, অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে 'রাত্রির আকাশে জানালার মাধ্যমে' "প্রার্থনা" নামে এক কবিতায়—

আমি অসহায়, আমার কিছুই নেই
আমার বিলাস শুধু তোমায় জানাই
হে নভোতল, হে দিগন্ত মহান, শোনো
বলো বঙ্কিম চন্দ্রের রজতশুভ্র তির্যক ললাট তূণ হতে
কোন বাণ ছুটে আসে বেগে,
তোমার বিরাট বিস্তৃতির আর একটুখানি দাও
আমাদের আকাশ অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

আজকালকার কাব্যিক রীতিতে শব্দ সম্ভারের ব্যবহার সীমিত। অন্য সব কবির মতো নবকান্তের কাব্যেও এই ভাব ও ভাষার বৈপরীত্য দেখা যায়। শব্দগঠনের মধ্যে স্তরের সৌষম্য নেই এবং সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা থেকে আহরিত বাক্যগুলির সঙ্গে অসমীয়া ভাবের বৈষম্যও দেখা যায়। ফলে এই

মিলিত প্রতীকগুলিতে স্বতোৎসারিত ব্যঞ্জনার অভাব ঘটেছে মাঝে মাঝে এবং নানা বর্ণের ছায়ায় কাব্যগুলি দীপ্যমান। তাই তাদের নিপুণ শিল্প সৌন্দর্য থাকলেও সাধারণের পক্ষে রসগ্রহণে বাধা উপস্থিত হয়—কারণ ঐ প্রতীকগুলির সৌন্দর্য আস্বাদনের ও রসগ্রহণের জন্য যে পরিমাণ সংস্কৃতি জ্ঞান ও বোধিব্যাপ্তির প্রয়োজন তা সাধারণ পাঠক শ্রেণীর নেই।

সৈয়দ আবদুল মালিক (১৯১৯—) গল্পলেখক হিসেবেই সমধিক খ্যাত। তিনি বামতন্ত্রী রাষ্ট্রপন্থার পূজারী, কবিতার সুরও সেই রকম। আজকালকার নবকবিসমাজের কাছে তিনি বরণীয়, কারণ তিনি সহানুভূতির সঙ্গেই জনগণের কথা বোধ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর কাব্যের উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন জনগণমনের সূক্ষ্ম চিন্তাধারা থেকে, সেইগুলিকেই তিনি সহজ বোধগম্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর কাব্যে, সাধু ভাষায় নয়, তাদের আয়ত্তাধীন কথ্যভাষায়, ভঙ্গিতে ও সুরে।

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যও (১৯২৪—) বামদলের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর কবিতাগুলি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিক্ত সমালোচনা। তিনি মাসিকপত্র 'রামধনু' সম্পাদক এবং তাঁকে ঘিরে নবীন কবিকুল যেন একটি পরিবার। রামধনু কাব্যে একটা নূতন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং কাব্যরসরসিক গুণমুগ্ধদের একত্রিত করেছে।

হরি বরকাকতি (১৯২৯—) ও মহেন্দ্র বরার কাব্যে আমরা অস্পষ্টতা অপ্রীতিকর মূর্তি ও বহু সাহিত্যিক উদধৃতি পাই। দুজনের কবিতায় বুদ্ধিজীবী কবি হিসাবে, বর্তমান যুগজীবনের আশা নৈরাশ্যযন্ত্রণা, বিশ্বসাহিত্য ও সমাজের নানা প্রশ্নের প্রতিফলন ঘটেছে। মহেন্দ্র বরা সম্প্রতি একটি কাব্য সংকলন প্রকাশ করেছেন এবং নামকরণ করেছেন 'নতুন কবিতা'। এই ছোটো কবিতার সংগ্রহ (৬৮) থেকে বুঝতে পারা যায় কি ভাবে ও কতদূর ছন্দে ও বিষয় নির্বাচনে এই সব কবিরা প্রাচীন ঐতিহ্য, বিষয়বস্তু, লিখন ভঙ্গি, রীতি ও সংস্কার থেকে মুক্ত হয়েছেন।

হোমেন বরগোঁহাঞি (১৯৩১—) ছোটো গল্প ও কবিতা সহজ ও সমান ভাবেই লেখেন। তাঁর কবিতাতে যৌন বিষয়ক রচনাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে এবং তাঁর এই প্রীতি কবি ডাইলান্ টমাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

অন্য সব তরুণ কবিরা, যেমন দীনেশ গোস্বামী, নীলমণি ফুকন (ছোটো),

বীরেশ্বর বরুয়া, মহিম বরা প্রভৃতি নব নব বিষয়ে প্রতীক ব্যবহারে ও রূপকল্পের ভাব চিত্রণে নূতন বক্তব্য রেখেছেন এবং তাদের মাধ্যমে সাহিত্যে ও সমাজ চেতনায় সংশয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পরিবেশ তাঁদের কাব্যে প্রতীয়মান।

বর্তমানে অসমীয়া কাব্যে প্রচুর পরিমাণে লেখা হচ্ছে কিন্তু একথা বলা শক্ত যে কতগুলি কালজয়ী হবে, আগামী দিনের সাহিত্যেও থাকবে। আমরা শুধু এই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি যে এই বৃহৎ খনিজ প্রস্তরে যথেষ্ট মূল্যবান আকর আছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নাটক

আসামে বৈষ্ণব আন্দোলনের সময় থেকেই 'অভিনয়' একটি জনমনোগ্রাহী শিল্পকর্ম। ভারতের অন্যত্র এবং ইংলণ্ডেও যেমন এর উৎপত্তি ধর্মযাজকদের প্রেরণায়, আসামেও তদ্রূপ। আজও গ্রামের নামঘরে বৈষ্ণবযুগের একাঙ্কিকা নাটকগুলি অভিনীত হয় এবং আবালবৃদ্ধবণিতার দল স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তাতে যোগ দেন। এই সব ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক অভিনয়গুলি দেশের চিরন্তন আচার বিচার বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত এবং আজও সামাজিক জীবনে এদের মূল্য অপরিসীম। আধুনিক নাটকের প্রেরণা—যা বর্তমান সমাজ জীবনকে প্রতিফলিত করবে বা তার নানা সমস্যাকে তুলে ধরবে বা সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানা প্রশ্ন উত্থাপিত করবে—সেই সব আধুনিক সমস্যাসংকুল নাটকের আগমন পশ্চিম থেকে। যদিও ব্যবসায়ী নাট্যমহল এখনও এই ধরনের গণনাট্যকে তুলে ধরেন নি, অব্যবসায়ী নাট্য রসিকদল স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্লাবে, সভায়, সমিতিতে এই ধরনের নাটক প্রচলনের চেষ্টা করছেন—অবশ্য নিজেদের খেয়ালখুশিমতো বন্ধু বান্ধব পাড়াপড়শীর দল গঠন করে থিয়েটার করবার ব্যস্ততায়। কোনো কোনো বিশেষ সামাজিক উৎসবেই এই সব নাটকের পালা অভিনীত হয় এবং সাধারণতঃ পুরুষরাই স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী অনুদান ও আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ কিছু বেড়েছে, বিশেষ করে সংগীত নাটক অকাদেমির সহযোগিতায়। ১৯৫৪ সালের শীতকালে ঐ অকাদেমি প্রথম জাতীয় নাটক মেলার প্রবর্তন করেন এবং চৌদ্দটি স্বীকৃত জাতীয় ভাষায় পঁচিশটি নাটক অভিনীত হয়। ভারতীয় সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের ইতিহাসে এই সম্বাৎসরিক নাটক অভিনয়-গুলি আমাদের জাতীয় উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

ব্রিটিশরাজশক্তির প্রথম অভ্যুদয়ের সময় থেকেই ভারতে যে সব নাটক লিখিত হত, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অভিনয় ও লোকমনোরঞ্জন—কাব্যরচনা বা সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা নয়। আধুনিককালের নাটকগুলি চার ভাগে বিভক্ত

করা যায়—পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক। পৌরাণিক নাটকগুলির বিষয়বস্তু বেশিরভাগই রামায়ণ মহাভারত থেকে সংগৃহীত। সামাজিক নাটকেরও দুটি বিভাগ, একটি গভীর সমস্যামূলক আর একটি হাল্‌কাধরনের হাস্য কৌতুকব্যঙ্গরস মিশ্রিত। এইগুলিতে সমকালীন অসমীয়া সামাজিক জীবনের ছবি পাওয়া যায়। লঘু হাস্যলাস্য রসের নাটকগুলিতে অসমীয়া জীবনের প্রাত্যহিক নানা অসংগতিপূর্ণ ব্যতিক্রমগুলিকে তুলে ধরে হাস্যকৌতুকের ভাণ্ডার করা হয়েছে। ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে অসমীয়া ইতিহাসের স্বর্ণযুগের অর্থাৎ আহোম রাজাদের কাহিনী চিত্রিত। তখনকার মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করবার কথা সাড়ম্বরে বর্ণিত হয়েছে, শুধু রাজা সেনাপতিদের বীর্য শৌর্যের কথা ও কাহিনী নয়, সাধারণ মানুষের বীরত্ব, উদারতা, আত্মত্যাগ, রাজনীতিবিদদের মন্ত্রণা দক্ষতা, সবই নাটকে প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়াও আছে জনসাধারণের স্বদেশপ্রীতি এবং প্রত্যেক অসমীয়া নাগরিকের জন্মভূমির প্রতি মমত্ববোধ, অবশ্য মাঝে মাঝে রাজসভার মন্ত্রগুপ্তি ফাঁস হয়ে যায়, তাও দেখানো হয়েছে, বিরুদ্ধ দলের উদয় হয়েছে এবং অন্যান্য অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা জীবন্তভাবে যোগ্য হস্তে নিপুণতার সঙ্গে লিখিত হয়েছে। অবশ্য রোমান্টিক পালাগুলিতে নৃত্যগীতের প্রাচুর্যও আছে। এদের সংখ্যা কম।

পৌরাণিক নাটকের মধ্যে দেবনাথ বরদলৈ (১৮৭৩-১৯১৬)-এর 'বৈদেহী বিচ্ছেদ', রমাকান্ত চৌধুরীর 'সীতাহরণ', পূর্ণকান্ত শর্মার 'হরধনু ভঙ্গ', ভারতচন্দ্র দাশের 'অভিমন্যুবধ', বেণুধর রাজখোওয়ার 'দক্ষযজ্ঞ' ও 'দুর্যোধনের উরুভঙ্গ', দুর্গেশ্বর শর্মার 'পার্থপরাজয়' ও 'বালিবধ', দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার বরুয়ার 'বৃষকেতু' ও 'গুরুদক্ষিণা' উল্লেখযোগ্য। এই সব নাটকে পৌরাণিক ঘটনাগুলির বিশেষ পরিবর্তন না ঘটিয়ে সাধারণ দর্শকদের মনে ঐ সব অতীত কাহিনীর ধর্মবোধ ও ভক্তিরসের প্রাবল্য এনে দেয়। এই সব নাটকীয় গুরু গম্ভীর বিষয়গুলিতে তথাকথিত অপরিণামদর্শী জনগণকে আকৃষ্ট করবার জন্য একটু লঘু ধরনের হাস্যরসও থাকত এবং এইগুলিই পরে সম্পূর্ণ লঘু নাটকের রূপ নিয়েছে।

ব্রিটিশযুগের সর্বপ্রথম সামাজিক নাটকের নাম করতে গেলে গুণাভিরাম বরুয়ার 'রামনবমী', রুদ্ররাম বরদলৈ-এর 'বাঙ্গাল-বাঙ্গালিনী' এবং হেমচন্দ্র বরুয়ার 'কানিয়ার কীর্তন'-এর নাম করতে হয়। 'রামনবমী'তে পাই বিধবা

বিবাহের যৌক্তিকতা, তার নায়িকা বালবিধবার শোচনীয় বিয়োগান্তে। নবমী নামে একটি বিধবা ব্রাহ্মণ বালিকা রাম নামে একটি তরুণের প্রেমে পড়ে। সে গর্ভবতী হয় এবং বিদ্রূপ ও কঠোর শাসনের সামনে দাঁড়াতে না পেরে আত্মহত্যা করে। 'বাঙ্গাল-বাঙ্গালিনী' নাটকটিও অসামাজিক গুপ্তপ্রেম, বদমাইসি ও অত্যাচারের সাক্ষী। 'কানিয়ার কীর্তন' একটি গণ আন্দোলনের পক্ষে লেখা—আফিম নেশার খারাপ ফল। ঐ নাটকে তথাকথিত ধুরন্ধর সমাজপতি ও ধর্মনেতাদের নৈতিক অধঃপতন, মিথ্যাভাষণ এবং অন্যান্য অন্যায় আচরণের কাহিনীর বিবৃতিতে নৈতিক মানের উপরও বিশেষ কটাক্ষপাত আছে।

তাঁর আর একটি নাটক 'মহরী'তে (আফিসের বাবু কর্মী) দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার বরুয়া একটি স্বল্প মাহিনার অতিরিক্ত কর্মভার প্রপীড়িত চা-বাগানের কেরানীর করুণ ইতিহাস এঁকেছেন। এরই পাশাপাশি রয়েছে আর একটি চিত্র—ঐ চা-বাগানের ইংরেজ ম্যানেজার মিঃ ফক্সের বিলাস বহুল উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা। এইভাবে হাস্যকৌতুকভরা ব্যঙ্গচিত্রগুলি দুমুখো চকচকে ধারালো ছুরির মতো ঐ সব অত্যাচার অনাচার ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে লেখা এবং ঘৃণা-ব্যঞ্জক নিন্দার প্রকাশ। ঐগুলি স্থানীয় লোকেদের একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসগুলির উপর খড়্গাঘাত, আবার অন্যদিকে সেই নগ্ন ভবিষ্যৎ দৃষ্টিহীন এবং মূর্খের মতো পশ্চিমী অনুকরণের উপরও দারুণ কশাঘাত। সত্যের খাতিরে জানিয়ে রাখা উচিত যে এর আগেও বহু লেখক এই ধরনের 'কমিক ফার্স' বা কৌতুক নাটিকা লিখেছেন। ঐ সব লেখকরা তলিয়ে যাওয়া সমাজের দোষগুলিই বড়ো করে তুলে ধরেছেন, কিন্তু তার গুণগুলিকে উপেক্ষা করেছেন, ফলে আমরা নৈতিক বৈশিষ্ট্যবিহীন এক ধরনের একপেশে নাটকই পাই।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তিনটি ঐতিহাসিক এবং চারটি হাস্যরসাত্মক লঘু নাটক লেখেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবনযাত্রার প্রথম নিদর্শনই হচ্ছে একটি কৌতুকনাট্য—যে বিষয়ে তাঁর নিপুণতার অভাব ছিল না এবং তাঁর হাতের কাছেই ছিল অসমীয়া জীবনযাত্রার নানা অসংগতি, ভুল ও ভ্রান্তি, যেগুলি তাঁর শ্যেনদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কৌতুকনাট্য 'লিতিকাই'তে (১৮৯০) এমন একটি হাস্যকর পরিস্থিতি লেখক গড়ে তুলেছেন যে কুশীলবদের বোকামি, পরকে প্রতারিত করবার এবং মিথ্যাকে সত্য বলে চালাবার প্রচেষ্টা ও চতুরালি

ফুটে উঠে একে রসসমৃদ্ধ করেছে। 'পাঁচনী'তে (১৯২৩) পাঁচনীর অতিথি বৎসলতা এমন এক অবিশ্বাস্য হাস্যাস্পদ স্তরে পৌছায় যা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আয় বুঝে ব্যয় করবার অনুযোগে সংঘর্ষ বাধিয়ে এক কৌতুকবহ পরিস্থিতি ঘটায়। 'নোমান' (১৯১৩) কৌতুকনাট্যে দেখি যে নহর ফুটুকা নামে এক কুঁজো বৃদ্ধ ভাঙা শরীর নিয়ে পুত্রের কল্যাণের জন্যে মন্দিরে পূজা দিতে যায় এবং তার কথা বলার বিসদৃশ ভঙ্গি ও বোকামির জন্য সেখান থেকে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে ফিরছে। 'চিকরপতি মিকরপাত' (১৯২৩) নামক নাটকে দুজন চোর তাদের চুরি করার নানা ফন্দি ফিকির দেখায় এবং এই সব দেখে এবং বিচার বিভাগের অপদার্থতা ও ঐ সব কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করে যে পরিস্থিতি হয় তা দেখে দর্শকদের হাসি চেপে রাখা দায় হয়। পরিস্থিতিকে বাড়িয়ে দেখানো, ভাব ও বাক্যের শ্লেষ, হাস্যকৌতুকময় বাক্যালাপের মধ্যে অসংগতি —এই সব উপকরণই হচ্ছে এই ধরনের কৌতুক নাটিকার বিশেষত্ব। কৌতুকরসও নিম্নমানের, কেন না যা কিছু হাস্যকর—তা পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। পরিস্থিতিকে টেনে নিয়ে সুদীর্ঘ এবং অত্যুক্তিতে পূর্ণ করাই এই সব নাটিকার প্রাণ এবং সেজন্যই এগুলি প্রকৃতজীবনের দর্পণ নয়।

বেজবরুয়া তিনটি ঐতিহাসিক নাটক ১৯১৪-১৬ সালের মধ্যে লেখেন— 'জয়মতীকুয়ারী', যাতে রানী জয়মতীর প্রিয় স্বামী ও দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয়টি 'চক্রধ্বজসিংহ' যাতে আসামের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কাহিনী পাই। মুঘলদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন সেনাপতি লাচিত বরফুকন সরাইঘাটের যুদ্ধে। এই নাটকে আমরা শুধু যুদ্ধের কাহিনীই পড়ি না, যুদ্ধজয়ের কৌশলের তত্ত্ব, তথ্য ও পরিচয় পাই এবং আরও পাই রাজ চক্রধ্বজসিংহের ও সেনাপতি লাচিত বরফুকনের সৈন্যবাহিনীর দুর্ধর্ষ অভিযানের এক বিচিত্র মনোরম কাহিনীর চিত্র। এটিকে পঞ্চাঙ্ক বিস্তৃত অসমীয়া জাতীয় সংগীত বলে গণ্য করা যায়। 'বেলিমার' নাটকটি আহোমরাজাদের ক্রমাবনতির ইতিহাস এবং শেষ পর্যন্ত বর্মীদের আক্রমণে এর শেষ নিশ্বাস পড়ল। এইটুকু লক্ষ্য করবার বিষয় যে এই তিনটি নাটকেই নাট্যকার ইতিহাসকে খাটো করেন নি বা নিজের ইচ্ছামতো বিকৃত করেন নি। তিনি ইতিহাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এইসব ঘটনাবলীর পরিপূরক পরিস্থিতি সৃষ্টির কৃতিত্ব ও মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন।

সংখ্যার দিক থেকে ঐতিহাসিক নাটকগুলি ভারী ও জনপ্রিয়। এইগুলিতে নাটকীয় ভঙ্গি দেখাবার সুযোগ বেশি, যুদ্ধ আছে, বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ আছে এবং চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক পটভূমিকা বা স্বরূপ পরিবর্তন না করেই তাদের আরও সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

নানা ঘটনার মধ্যে আছে একটা স্বয়ংক্রিয় গতি, যাতে নাটকের গতি বৃদ্ধি পায়, উপস্থাপনা সহজ হয় এবং মোটের উপর নাটকগুলি জনমানসে উপভোগ্য হয়। আসাম ঐতিহাসিক রচনার জন্য বিখ্যাত এবং জনগণও ঐসব পুরাতনী কথার পুনরাবৃত্তির দৃশ্য দেখতে ভালোবাসে। নাট্যপ্রণেতারাও দেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিকথা ভাষায় গেঁথে বর্তমান যুগের মানুষদের উপহার দিয়ে দেশের স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক নাটকগুলি বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলে সামাজিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক উদ্দেশ্যই সাধন করেছে।

নাটকীয় বৈপরীত্য ও তুলনার সূত্রে চরিত্রগুলিকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। যদিও তখনকার দিনের রীতি অনুসারে নাটকের ভাষা অমিত্রাক্ষরে লেখার রীতি, কিন্তু তিনি সরল গদ্যভাষায় এই নাটকগুলি রচনা করেছিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের মতোই অত্যধিক ভাবালুতা ও আতিশয্য থেকে বিরত থাকতেন। এইসব নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 'চক্রধ্বজ' নামক নাটকে 'গজপুরিয়া ও প্রিয়রামের' চরিত্র শেক্সপীয়রের 'চতুর্থ হেনরী' নাটকের 'ফলস্টাফ' ও 'প্রিন্স হল'-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা সুস্পষ্ট যে ঐ দুটি চরিত্রাঙ্কনে তিনি শেক্সপীয়রের অনুকরণ করেছেন। 'বেলিমার' নাটকের "ভুমুক বহুয়া" এবং "পিজয়ু", 'কিং লিয়ার'-এর "দি ফুল" ও অফেলিয়ার যেন প্রতিধ্বনি। নাট্যকার বিয়োগান্ত নাটকের মধ্যে কিছু কিছু হাস্যরসের লঘুছন্দও কয়েকটি দৃশ্যে প্রয়োগ করেছেন।

পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া আটটি নাটকের রচয়িতা—তার মধ্যে চারটি ঐতিহাসিক, একটি পৌরাণিক ও একটি হাস্যকৌতুক। 'জয়মতী' (১৯০০) 'গদাধর' (১৯০৭) 'সাধনী' (১৯১১) এবং 'লাচিত বর ফুকন' (১৯১৫) এই চারটি আসাম ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়ের ইতিকথা। 'জয়মতী' ও 'সাধনী' বিয়োগান্তক নাটক এবং 'গদাধর' ও 'লাচিত বর ফুকন' হাস্যরসাত্মক'। প্রথম তিনটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। 'লাচিত বরফুকন'

ও পৌরাণিক নাটক 'বাণরাজা'য় গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। 'জয়মতী' নাটক শোকবিধুর ব্যথার ও আত্মোৎসর্গের বিয়োগান্ত নাটক, কারণ সতী জয়মতী—আহোমরাজ লারারাজকে তাঁর স্বামী গদাধরের তৎকালীন ঠিকানা বা বাসস্থানের সন্ধান দেন নি, নানা প্ররোচনা অত্যাচার সত্ত্বেও, কারণ তিনি তাঁর শুধু স্বামীই নন, দেশের সুশাসনের প্রতীকও। যদিও 'জয়মতী' লেখকের প্রথম বিয়োগান্ত সাহিত্যনাটক, তবু পরবর্তী 'সাধনী' নাটকের চেয়ে এর চরিত্রগুলি প্রস্ফুট ও রসগ্রাহ্য। জয়মতীর চরিত্রে আছে দৃঢ়তা, ক্লেশ সহিষ্ণুতা এবং নানা গুণের সমাবেশ। 'সাধনী'তে সে সব নেই। এই সরলা মহিলাটি যেন পরের হাতে কলের পুতুল, ব্যক্তিত্বহীনা। 'পারাবতী' এবং এই নাটিকাটি বিয়োগান্ত নাটকের যে সব প্রাচীন শৈল্পিক রীতিনীতি আছে সেগুলিকে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে না। 'গদাধর' নাটকটি 'জয়মতী'র সমগোত্রীয় কিন্তু সাফল্যে তত উজ্জ্বল নয়। নাটকের প্রাণপুরুষ গদাধর পাঠকপাঠিকাদের আশা পূর্ণ করে না। এখানে নাট্যজনোচিত ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে রাগাড়ম্বর বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে, সংযত সংহত ভাবের চেয়ে ভাবালুতার মাত্রাধিক্যই বেশি এবং আখ্যান-ভাগকে পরিস্ফুট করার চেয়ে শূন্যগর্ভ অস্ফালনই আসর জমিয়েছে। নাটকের মূল বিষয়টিকে নানাভাবে রূপায়িত করার চেয়ে নাট্যকার বাক্যবাহুল্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, এনেছেন অপ্রয়োজনীয় ভাবালুকতা, অলৌকিক ব্যাপারের এক ঘেয়ে বিবরণ, প্রকৃতির প্রতি প্রেমের উচ্ছ্বাস এবং উদ্দেশ্যহীন সুদীর্ঘ বাক্যালাপ ও অপ্রয়োজনীয় হাস্যকৌতুকের দৃশ্য, যা সমস্ত নাট্যরসকে নষ্ট করে ও মৌলিক বিষয়বস্তুটিকে সরলভাবে স্পষ্ট হতে বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করে। বক্তব্য বিষয়গুলি প্রকৃতই ইতিহাসের ছায়া সে বিষয়ে সংশয় বা সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সব ঘটনাবলীতে সৃষ্ট নাটকটিতে বা সেই সব ঘটনার প্রমাণে নতুন কিছু তথ্য বা তত্ত্ব নাট্যকার দেন নি, কোনো নতুন চিন্তার ধারার আলোকপাতও করেন নি। 'বাণরাজা' 'হরিবংশ' অবলম্বনে লেখা, নাট্যকার পুরানো গল্পের কিছু অদল বদল করেন নি। সমস্ত নাটকটিই গদ্যে লেখা, যদিও এই নাটকে অতীন্দ্রিয় জগতের স্পষ্ট স্পর্শ থাকায় ঐতিহাসিক নাটকগুলির মতো এটিকেও পদ্যে লেখাই উচিত ছিল। ব্যবহৃত ভাষা স্বতস্ফূর্ত নয়, সংস্কৃত বহুল এবং এর চরিত্র চিত্রণে কোন নূতনত্বের আভাষ পাওয়া যায় না।

গোঁহাই বরুয়ার কৃতিত্ব এই যে তিনি সমাজের নিম্নস্তরের চরিত্রচিত্রণে ও

গ্রামীণ সভ্যতার আলোকে পুষ্ট সমাজের চিত্র অঙ্কনে পটু, কিন্তু তিনি পৌরাণিক ইতিবৃত্তের বিরাট আখ্যানগুলিকে অবলম্বন করে ইতিহাসকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে পুনর্জাগরিত করতে অক্ষম। তাঁর মধ্যে সেই সৃজনশীল কল্পনাশক্তি ছিল না, যাতে অতীতকে ও তার সম্পর্কিত কুশীলবদের নবজীবন-দান করে জনমানসে পুনপ্রর্তিষ্ঠিত করে সেই যুগকে কিছুক্ষণের জন্যও ফিরিয়ে আনা যায় এবং সেইসব ইতিহাস ধন্য মানব-মানবীদের চরিত্র নতুনভাবে বরণ করে নেওয়া যায়।

'গাঁওবুড়া' (গ্রামের মণ্ডল ১৮৯০), 'তেতন তামুলি' (১৯০৮), 'ভূত নে ভ্রম' (সত্যই বিদেহী প্রেত না মনের ভ্রম ১৯২৪) এই তিনটি কৌতুক নাট্যের মধ্যে শেষেরটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। গ্রাম্যজীবনে ভূত প্রেতের ভয় যে জনমানসে দৃঢ়বদ্ধ ধারণা সৃষ্টি করে লেখক সেই বিষয়ে তাঁর দেশবাসীদের সতর্ক করে দিতে চান। কিন্তু সেই প্রচার এত প্রকট রূপ নিয়েছে যে নাট্যের বিবর্তনে বা গল্পের রূপায়ণে তার সেই সার্থকতা ব্যাহত হয়েছে। 'তেতন তামুলি' একটি পূর্ণাঙ্গ কৌতুক নাটক যাতে আমরা একটির পর একটি ছবিই পাই, নাট্যের সমগ্রতার রূপ সেখানে বিরল। এই নাটকে তেতন চালাকি করে পরিস্থিতির প্রত্যেকটি পরিবর্তনের সঙ্গে নিজের সুবিধা সুযোগেরই ব্যবস্থার দিকে সচেষ্ট। অবশ্য নাট্যকার গ্রামীণ সমাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত, সেটা সুস্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়। এই কৌতুক নাট্যটির সফলতা এবং জনগণের কাছে এর চাহিদার কারণই এই যে এর গতিশীল ও উজ্জ্বল হাস্যকৌতুকের দাবী।

'গাঁওবুড়া' যদিও কৌতুকনাট্যগুলির প্রথমদিকের লেখা তবুও লেখকের এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে বিবেচিত হতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের ভাগের আসামে ব্রিটিশ শাসনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের প্রকৃত ছবি পাওয়া যায় এই নাটকে। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের মতো গোঁহাই বরুয়ার 'গাঁওবুড়া' একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই লেখা হয় এবং এই নাটিকাটি সুসমঞ্জস এবং অসমীয়া কৌতুক নাট্যের ইতিহাসে একটি সুনিষ্ঠ সংযোজন। 'গাঁওবুড়া'র নাম ভোগমান, তার কৃতিত্ব যে নিজের অন্যান্য কাজ অবহেলা করে সে সরকারী অবৈতনিক কাজ সমাধা করত এবং সেই কাজে সে কী ভাবে নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়ে, তার গ্রামবাসী বা অন্যদের অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করত

তারই রসাল বর্ণনা। চিত্রে চরিত্রে এটি একটি রসনাট্য হলেও হাসি তামাসা কৌতুক ব্যঙ্গের পেছনে যে একটি গভীর কান্নার সুর লুকিয়ে ছিল—সেই বৈশিষ্ট্যই একে স্মরণীয় করে তুলেছে এবং সেই জন্যেই এই নাটকটি আকর্ষক। নাট্যকার অতিশয় কৃতিত্বের সঙ্গে ভোগমান এবং রংদই-এর চরিত্র চিত্রণ করেছেন। নাটকটিকে কৌতুকনাট্য না বলে লঘুনাট্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে লেখক যে সব বিপরীত ধর্মী কিন্তু ধারালো উপমা ও অনুমান ব্যবহার করেছেন, তাতে তাঁকে সাধুবাদ জানাতে হয়। তাঁর গম্ভীর ঘরানার নাটকগুলি একটু একঘেয়ে কিন্তু তাঁর রসবিদ্রূপাত্মক হাস্যকৌতুক সংবলিত নাটকগুলি, তাদের চিত্রণ রূপায়ণে, এবং সুষ্ঠু অভিনয় ব্যবস্থায় প্রকৃতই অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

আর একজন সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার হচ্ছেন বেণুধর রাজখোওয়া (১৮৭২-১৯৫৫)। তাঁর শেউতি-কিরণ (১৮৯৪) নাটকটিতে শেক্সপীয়রের 'ওথেলো'র প্রভাব সুস্পষ্ট। আর একটি বিয়োগান্ত নাটক 'উরু ভঙ্গ' কিন্তু তিনি সমধিক প্রশস্তি পেয়েছেন ব্যঙ্গ কৌতুক নাট্যকার হিসেবে। সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে 'কুড়ি শতিকার সভ্যতা' (১৯০৮) 'তিনি ঘইনী' (তিনজন স্ত্রী বা ঘরনী), 'অশিক্ষিতা ঘইনী' (অশিক্ষিতা গৃহিণী), 'তোপানির পরিণাম' (নিদ্রায় স্বপ্নের ফলাফল) এবং 'চোরার সৃষ্টি' (চোরের সৃষ্টি)। প্রথমটিতে নাট্যকার দেখিয়েছেন, একালের পাশ্চাত্য শিক্ষায়, অর্ধশিক্ষিত যুবকেরা কিভাবে মিথ্যাচারের প্রশ্রয় দেয়। তারা তাদের স্বদেশের সনাতন রীতিনীতিগুলির প্রতি যেমন শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে না, তেমনি পাশ্চাত্যের নববিশ্বাসকেও ধ্যানধারণায় আয়ত্ত করতে পারে নি। তারা কোনো দেবদেবী বা ভগবানে বিশ্বাস করে না এবং জাতিভেদ প্রথাতেও অবিশ্বাসী, অথচ সমাজের ভয়ে তারা মৌখিক আনুগত্য প্রকাশে পশ্চাৎপদ নয়। বিবাহবিষয়ক ব্যঙ্গ কৌতুক নাট্যগুলিতে সতীনের ঝগড়া এবং অশিক্ষিতা রমণীদের কথাই বিশেষভাবে বর্ণিত যারা স্বামীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। 'তোপানির পরিণাম' নামক কৌতুকনাট্যে দেখি যে যুবক তোপানি একটি তরুণীকে ভালোবেসে তাকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে আসে ও পরে তাকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। গল্পটি অংশত পুরানো লোকগাথা থেকে নেওয়া। 'চোরের সৃষ্টি' নামে আর একটি হাস্যলাস্যময় কৌতুক নাটক, শেক্সপীয়রের 'কমেডি অফ

এরবুস্' এর ধরনে লেখা। ধুমুহা ও সৌরাম নামে দুই বিবাহিত ভদ্রলোক তাদের দৃষ্টি ভঙ্গির পার্থক্যে তাদের স্ত্রীদের গঞ্জনায় উত্যক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মতান্তর থেকে মনান্তর। এক রাত্রে চোর বাড়িতে ঢোকে এবং এই অসুখী স্বামী স্ত্রীদের ঝগড়ার ব্যাপাটি বুঝতে পারে। সে এমন একটা যাদুশক্তির দ্রব্যগুণের খবর জানত যে তাই দিয়ে ঝগড়ুটে স্বামী-স্ত্রীদের জানবার আগেই বৌ বদল করে দেওয়া যায়। চোরটি তাই করল। স্বামীরাও তাদের নতুন স্ত্রীদের সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে ঘরের কাজে মন দিল। এই নাটকে কয়েকটি দৃশ্য হাসি ঠাট্টায় ভরা। এটা একটা পুরানো লোকগাথার নতুন রূপ মাত্র। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য কুসংস্কার ছাড়ানো এবং তাঁর কোনো নাটকেই তার ব্যতিক্রম নেই। এই নাটকগুলির দুর্বল দিক এই যে অনেক জায়গায় অকারণে গানের অবতারণা আর দুর্বল সংলাপ।

চন্দ্রধর বরুয়ার (১৮৭৪-১৯৬১) লেখক হিসেবে সুনাম আছে তাঁর নাটক-গুলির জন্যে। তাঁর দুটি প্রধান নাটক পুরাণের গল্প নিয়ে লেখা—মেঘনাদ বধ (১৯০৪-৫) এবং তিলোত্তমা সম্ভব—দুটিতেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটি রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ বধ এবং অন্যটি সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী—কে তিলোত্তমাকে পাবে। দুটিতেই কি কাহিনীর গতিতে বা বর্ণনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রভাব দেখা যায়। এটা পরিষ্কার দেখা যায় যে নাট্যকার রাবণ ও মেঘনাদের উপরই দরদী। লক্ষ্মণ চরিত্রে কোনো বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় না এবং রামকে একজন বড়ো বীর ও মহৎ মানুষ রূপেই দেখানো হয়েছে। আমাদের নাট্যকার মেঘনাদের স্ত্রী প্রমীলাকে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই এঁকেছেন। মাইকেলের সীতা চরিত্রের চেয়েও এই প্রমীলা চরিত্র আরও সুন্দর এবং পাঠক ও দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। 'তিলোত্তমা সম্ভবে' দুই দানবের মৃত্যু এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মের জয় হবেই হবে এই সত্যই দেখানো হয়েছে। কামপ্রেরণা বা পশুজনোচিত ভোগবাসনা বা বিলাসেচ্ছা শুদ্ধ সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে নিয়ে যেতে পারে না। সৌন্দর্য যখন স্থূল কামনার দ্বারা অধ্যুষিত হয় তখনই তার পতন অবশ্যম্ভাবী। তিলোত্তমা সম্ভবের বক্তব্য হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত শয়তানির পতন অবশ্যম্ভাবী। 'তিলোত্তমা সম্ভব'কে একটি কাব্যনাটক বলা যেতে পারে। স্রোতের মত চলমান ভাষা, সুন্দর ছন্দ এবং চমৎকার গীতাবলির সংমিশ্রণে মনে হয় যেন এক ছন্দায়িত সাবলীল দীর্ঘ কাব্য শুনছি। কবি নিজেই এই

নাট্যরীতি পছন্দ করতেন এবং তাঁর পাঠক বা শ্রোতাদের সেই পন্থাই গ্রহণ করতে বলতেন। এই কাব্যনাটকে বেশি চরিত্র চিত্রণ বা গ্রামীণ লঘু শিল্পজনোচিত বচনবিন্যাসও নেই যাতে তিনি অন্যত্র খ্যাতিলাভ করেছিলেন। একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণের বালকভৃত্য, কলিয়া যে বনে জঙ্গলে তার জন্যে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করে—তার স্বর্গগমন এবং সেই মহোজ্জ্বল পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার দীর্ঘ কার্যকলাপ ও কাহিনী যদিও গম্ভীর একটা নাটকের মধ্যে একটু রসসৃষ্টির প্রয়াস, তবুও কোথায় যেন সুরের অসংগতি বা বেতালা হয়ে গেছে। তবে চন্দ্রধর বরুয়ার এই উপস্থাপনা সুষ্ঠু না হলেও তাঁর ভাষার ভঙ্গি সরল, শিল্পব্যঞ্জনা সুন্দর এবং তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দও সহজে পরিবর্তন যোগ্য। 'ভাগ্যপরীক্ষা' নাটকটি একটি কৌতুকনাট্য, যেখানে ললাটের লিখন এবং পুরুষকারের দৌলতে বিত্তলাভ একটি লঘু দ্বিস্রোতার সৃষ্টি করেছে। বরুয়ার মতে ভাগ্যের বিবর্তন, ললাটলিখনে নয়, নৈতিক মর্যাদায়। যেখানে এই সংকেত মানসিকতা বা গুণগত সম্ভ্রম আছে সেখানেই ধন এবং ক্ষমতার প্রাচুর্য। পাণিরামের পরিবর্তনশীল জীবনের পতন ও উত্থান সেই সত্যকেই লেখক আমাদের সম্মুখে এনেছেন। এই কৌতুকনাটিকাটিতে ঘটনার সমকালীন সাদৃশ্য যেমন আছে, তেমনি হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনারও ব্যাপার আছে, তাই এই নাটিকায় প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বহু ঘটনার সমাবেশ হয়েছে। সমস্ত নাটিকাটি একটি অতি ক্ষীণ ঐক্যসূত্রে গাঁথা এবং তাও মাঝে মাঝে ছিন্ন ও শ্বাসরুদ্ধ হয়েছে, যাতে মনে হয় নাট্যকারের মননে এই অভিব্যক্তিই ছিল যে যা ঘটে তাই ঘটুক এবং ঘটনা-গুলিই নাটিকার গতি ও স্রোত স্থির করে দেবে। লেখক গ্রাম্যজীবনের বহু বিচিত্র ছবি কৃতিত্বের সঙ্গে এঁকেছেন। তাঁর পাণিরাম ও মনিকি যেন জীবন্ত পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্র। তাছাড়া কেবলিয়া ভক্ত সম্প্রদায়ের চিত্র, মৎস্যজীবীদের অবস্থা, সুদখোর, মহাজনদের চরিত্র তাদের সামাজিক শ্রেণী অনুসারেই চিত্রিত হয়েছে কথায় ও কাজে। 'ভাগ্যপরীক্ষা' সেইজন্য অসমীয়া কৌতুক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সংযোজন।

এখনও জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে মিত্রদেব মহান্ত উচ্চস্থান অধিকার করে আছেন। 'বিয়াবিপর্যয়' (১৯২৪) এবং 'কুকুরি কানার অথমঙ্গলা' (অন্ধপ্রায় জামাতার অভ্যর্থনা এবং অষ্টমঙ্গলা উৎসব ১৯২৭) খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং একসময়ে আসামের প্রত্যেকটি থিয়েটারে অভিনয়কালে উষ্ণ

আদরেই অভিনন্দিত হয়েছিল। ইদানীংকালে তিনি আরও কয়েকটি কৌতুকনাট্য পরিবেশন করেছেন, যেমন 'এটা চুরুট্' (একটি সিগারেট), 'তেঙ্গার ভেঙ্গার' (চালক চোর), 'লেকলৌ চেঙ্কালাম জ্বর' (তাপহীন জ্বর) 'অচিন কাহার থোরা' (জাত-পাত অজানা), 'বোমফুটকা' (দমবাজি মারা মানুষ) এবং আরও কয়েকটি। তবে তাঁর পূর্বের নাটিকাগুলিই সাহিত্যিক ও নাটকীয় গুণে পরবর্তীগুলির চেয়ে ভালো। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও পাত্র-পাত্রীদের মাত্রাজ্ঞানহীন ব্যবহারই 'বিয়া বিপর্যয়' কৌতুক নাট্যটির হাস্যরসের উপাদান। লেখক গ্রাম্যজীবনের নানাবিধ অশোভন আচরণ, যেমন শিশু-বিবাহ, বিবাহে পণপ্রথা এবং নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেছেন, তবে এইসব কাহিনীতে কিছু কিছু নাটকীয় অত্যুক্তিও আছে।

ইন্দ্রেশ্বর বরঠাকুরের প্রধানত নাট্যকার নামেই প্রসিদ্ধি এবং প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলা ও অভিনয় সম্বন্ধেও তাঁর বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ আছে। তাঁর প্রধান নাটক 'শ্রীবৎসচিন্তা' সুপরিচিত একটি পৌরাণিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা ও নাট্যকারের শিল্পসুলভ কুশলতার পরিচয় বহন করে। একথা সর্বজনবিদিত যে এইসব পৌরাণিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে নাট্যবর্ণিত চরিত্র-গুলিকে মনের মতো করে সুসজ্জিত করতে ইচ্ছা করলে এমন সব পাত্র পাত্রীর উপস্থিতি নাটকে যুক্ত করতে হয়, যাদের সঙ্গে পৌরাণিক গল্পের সংগতি রাখা সময় সময় দুরূহ হয়ে পড়ে। গ্রন্থকার কিন্তু সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখেই তাঁর নাট্যগুলিতে বহু পার্শ্বচরিত্র সৃষ্টি করেছেন যাদের উপস্থিতি নাটককে বৈচিত্র্যময় ও সজীব করে তুলেছে। মনে হয় তাঁর কল্পনা যখন সেকালের পৌরাণিক বা অন্য কাহিনী নিয়ে মত্ত তখন হাতের কাছে দেখা স্থানীয় পরিবেশে গড়ে ওঠা চরিত্রগুলিও উঁকি ঝুঁকি দেয় এবং এই দু'য়ের সুষ্ঠু সংমিশ্রণেই তাঁর কৌতুক নাট্যগুলি হয়েছে রসোত্তীর্ণ। এই বিচার সুষ্ঠুভাবে প্রতিভাত হয় যখন আমরা তাঁর সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে অবদানের কথাও মনে রাখি। 'ইন্দ্রমল্লিকা' (যুথিকা) নামে তাঁর একটি কবিতা সংগ্রহও আছে। সংস্কৃত সাহিত্যরসিক এবং পুরাতনী ভারত চেতনার গুণগ্রাহী বোদ্ধা বরঠাকুর এইসব বিষয়ে নানা গুণকীর্তন করে প্রবন্ধই লেখেন নি, কিছু কবিতাও রচনা করেন। 'ভারতী' (ভারতবর্ষ বিষয়ক) 'শরদে নমস' (শরৎকালকে

অভিবাদন), 'দুর্বাসা', 'বাল্মীকি', 'বেদব্যাস', 'উর্বশী' এবং অন্যান্য কবিতাগুলি তাঁর বিশিষ্ট ভারত প্রীতির নিদর্শন।

অতুলচন্দ্র হাজারিকা সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করেন কবি হিসেবে। তিনি যদিও পৌরাণিক আখ্যায়িকার কবিতা ও গল্প এখনও লিখছেন, তবু শিশু সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য দান আছে, কিন্তু তাঁর খ্যাতির মূল নাট্য-রচনার উপর। তাঁর রচিত নাটকগুলি সংখ্যায় বহু এবং সেগুলি তিনটি বিভাগে ভাগ করা যায়—এক, যেগুলি পৌরাণিক কথা ও কাহিনীর উপর লিখিত ; দুই, যেগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জির উপর বিধৃত এবং তিন, অন্য নানা ঘটনার নাট্যসম্ভার। পৌরাণিক নাট্যবিভাগে আছে, 'নন্দদুলাল', 'কুরুক্ষেত্র', 'রুক্মিণী হরণ', 'বেহুলা', 'নরকাসুর', 'শকুন্তলা', 'নির্যাতিতা চম্পাবতী', ও 'শ্রীরামচন্দ্র'। শুধু শকুন্তলা ও বেহুলা ছাড়া অন্যগুলির মূল উপকরণ রামায়ণ মহাভারত বা ভাগবত এবং সেগুলি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। নাট্যকার গ্রামীণ কাহিনীর উপর নিজের টিকা টিপ্পনী বা ভাষ্য প্রয়োগ করেন নি। তিনি চরিত্র ও আখ্যানগুলিকে যেমনভাবে পেয়েছেন তেমন ভাবেই নাট্যরূপে পরিবর্তিত করেছেন এবং যেখানে যতদূর সম্ভব তাদের নাট্যরূপে স্থানীয় আদর্শ ও লোকাচারকেই স্বীকার করে নিয়েছেন, কোনো অদলবদল করেন নি। 'শকুন্তলা' সম্বন্ধে নাট্যকারের নিজেরই উক্তি যে দুটি একটি জায়গা ছাড়া তিনি প্রচলিত কাহিনীই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নাট্যকারকে অভিনন্দন জানাতে হয় এইজন্য যে যা আশা করা যায় নি, তিনি ঐসব কাহিনীর মর্মকথাকে ও তাদের অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে, আসামের স্থানীয় পাত্র পাত্রীদের ও তাদের কথা এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন যে তাদের চরিত্রে এই সুষ্ঠু সংমিশ্রণ স্বাদু ও সাহিত্যরসসম্পন্ন হয়েছে। এই স্থানীয় পরিবেশ দেখা যায় 'রুক্মিণী হরণে' রুক্মিণীর বিবাহ বাসরে, 'বেহুলায়' কন্যার সখিদের তাঁকে ঘিরে রাখার চিত্রে, 'নরকাসুরে' পথ-তৈরি-করা শ্রমিকদের চিত্রে এবং 'শ্রীরামচন্দ্রে' হরধনু ভঙ্গের পর তাঁর বিবাহের গম্ভীর উৎসবে।

প্রাচীন গাথা বা কিংবদন্তী থেকেই সংগৃহীত হোক বা আধুনিক সমাজজীবন থেকেই গৃহীত হোক পাঠক বা দর্শকের সঙ্গে, স্রষ্টা ও দ্রষ্টাদের মধ্যে একটা সুনিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং বর্ণিত চরিত্রগুলির সঙ্গেও একটা সজীব সংযোগ। 'রুক্মিণী হরণে' বিদূষক বেদনিধিকে সকলেই গ্রামের ভাঁড়

বলে চিহ্নিত করতে পারে তাই সেখানে কোনো বিদ্বেষ বা দুষ্ট বুদ্ধি নেই। তবুও চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার কোনোরকম অসংগতি ঘটাবার চেষ্টা করেন নি, অবশ্য চেষ্টা স্বভাবতই তিনি করলেও পারতেন কারণ পৌরাণিক গল্পগুলির মধ্যে চরিত্ররূপায়ণে বা নাট্যসংঘাতে বা উপসংহারে নতুন কিছু রসসংযোগে নাট্যামোদীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল না—ঐসব চরিত্রগুলির উদ্ভব, বিস্তৃতি ও পরিণতি সর্বসাধারণের জানা। তবু 'কুরুক্ষেত্র' নাটকে নাট্যকার একটু অদল বদল করেছেন। গান্ধারী চরিত্রে এমন একটি রমণীরূপ ফুটে উঠেছে যে, তিনি উত্থান পতন এবং ভাগ্যের ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করতে অভ্যস্তা। তাঁর স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সমবেদনায় ও প্রেমে নিজের দর্শনাকাঙ্ক্ষাকে স্বেচ্ছায় স্তব্ধ করে রেখে সারাজীবন দুই চোখ বেঁধে রেখেছিলেন, সেই বাঁধন খোলার সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর যে আবেগ বহুল ভাষণ, সেটি একটি ভাবগম্ভীর রসাল সুন্দর কবিতাবিশেষ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বচ্ছ গতিতে তাঁর নাটকগুলি সুখপাঠ্য। মাঝে মাঝে নাটকে গদ্যও স্থান পেয়েছে কিন্তু সেইগুলি বৈচিত্র্যই সৃষ্টি করে। কতকগুলি পৌরাণিক নাটক তিন অঙ্কে বিভক্ত; কতকগুলি চার, পাঁচ এমন কি সপ্তাঙ্ক নাটকও আছে। 'শকুন্তলা' নাটকটি সপ্তাঙ্ক। অঙ্ক ও দৃশ্যগুলি পূর্ববর্তী রীতি অনুসারেই রচিত, কেবল 'শ্রীরামচন্দ্র' ও 'নির্যাতিতা' ব্যতীত। এই দুটি নাটকের আরম্ভ ও শেষ বেশ চিত্তাকর্ষক। শেষেরটিতে ও 'রুক্মিণী হরণে' নাট্যকার আধুনিক নাট্যরীতির সঙ্গে বৈষ্ণবযুগের ধারাকে মিশিয়ে দিয়েছেন এবং তা থেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে পুরাতনী প্রথা এখনও সচল এবং এর ভিতর দিয়ে নতুন জাতীয় নাট্যধারার সৃষ্টি হতে পারে। তিনি অভিনয়ের সাজসজ্জা আয়োজনের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতেন, বিশেষ করে 'বেহুলা' প্রভৃতি নাটকে।

তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি—'বণিজ কোঁয়ার', 'কনৌজ কোঁয়ারী' এবং 'ছত্রপতি শিবাজী'। 'বণিজ কোঁয়ার' শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'—এর অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে পঞ্চাঙ্ক নাটক। এই অনুসরণটিতে অসমীয়া নাট্যকারের বিশিষ্ট কৃতিত্ব এই জন্য যে ইংরেজি নাটকের খ্রিষ্টিয়ান-ইহুদী শ্রেণী সংঘাতের অনুরূপ ঘটনা, যা নাটকের প্রাণস্বরূপ, তা তিনি অসমীয়া ইতিহাস-পঞ্জির ভিতর থেকে খুঁজে বের করেছেন। অসমীয়া অনুসরণে অমিয়কুমার (অ্যান্টোনিয়ো) এবং চন্দনমল (শাইলক্) সত্যই অসমীয়া সমাজের প্রতিনিধি

এবং বহিরাগতরা তাদের শোষণ করে। এই দুই পক্ষের মধ্যে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভাষাভিত্তিক তিক্ততা থাকতে বাধ্য। অসমীয়া লেখক এই নাট্য ভাব ও ভাষায় নিপুণতা এনে এই নাটকটিকে শেক্সপীয়রের ঠিক অনুসরণ না করে এটিকে প্রায় একটি বেগবান নতুন নাটকে পরিণত করেছেন যেটিকে অনুবাদ, অনুকরণ বা অনুসরণ না বললেও চলে। 'কনৌজ কোঁয়ারী' রাজপুত ইতিহাসের এক গৌরবময় কাহিনীর একটি ছিন্নপত্র বিশেষ—পৃথ্বীরাজ ও জয়চাঁদের পারিবারিক কলহকে সংযুক্তা মূলক করে তার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব। তখন মুসলমান আক্রমণের প্রথম যুগ। যদিও এই পুস্তকে নাট্যরস সীমিত তবুও ভারত ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট যুগকে অসমীয়া সাহিত্যে স্থান দান, লেখকের একটি বিশিষ্ট অবদান। ব্যক্তিগত চরিত্র হিসাবে জয়চাঁদ, রাণা এবং সংযুক্তা, আলাপ আলোচনা কথোপকথনে, আগ্রহের, শৌর্যের ও বীর্যের এবং অন্তর্দাহযুক্ত জীবনীশক্তির পরিচয় দেয়। 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে লেখক যে বাঙালী নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'গৈরিকপতাকা' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। অতুল হাজারিকা প্রমাণ করেছেন যে ঐতি-হাসিক নাটকে ইতিহাসভিত্তিক খণ্ড খণ্ড সংবাদ পরিবেশনে বাধা না দিয়েও সৃজনশীল নাটক লেখা সম্ভব। তিনি শিবাজীকে উচ্ছ্বসিত উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত করেছেন। অথচ নাট্যকার অসমীয়া বীরদের বীরত্বের গাথা ভুলে যাননি এবং নাটকের সুবিধা সুযোগ মতো তার কীর্তন করেছেন এবং আরও দেখি যে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেব রামসিংহের বাক্যালাপের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম একতার যে প্রয়োজন আছে, সে সম্বন্ধে শুধু আবহিত নন, তার যথার্থ স্বীকৃতি দিয়েছেন। হাজারিকার মিশ্রধরনের নাটকগুলির নাম হচ্ছে—'মর্জিয়ানা' 'মানসপ্রতিমা', 'আহুতি' এবং 'রংমহল'। আরব্য-উপন্যাসের একটি জনপ্রিয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'আলিবাবা ও চল্লিশজন তস্কর'-এর অনুকরণে 'মর্জিয়ানা' নাটক লেখা। তাকে মক্ষীরানী করে এই নাটকের কল্পনা ও ভাবনা, এবং তাই নাটকের নামকরণও সুষ্ঠু। 'আহুতি' একটি সামাজিক নাটিকা, সেখানে দুই প্রজন্মের মধ্যে চিন্তাচেতনার ব্যবধান সৃষ্টি হতে বাধ্য। এই নাটকে নায়ক আনোয়ার আদর্শবাদী এবং আসামের বাইরে থেকে পাঠিয়ে দেওয়া কয়েকটি সমস্যা সম্বন্ধে সামান্যভাবে আলোচনাও করেছেন যা তর্কবিতর্ক মূলক। এই নাট্যে মধ্যযুগীয় নাটকীয় সূত্রের মতো একজন সূত্রধারকেও

দেখতে পাওয়া যায় এবং তাঁর বক্তৃতায় নাট্যের দ্রুতগতির কিছু সাহায্য হয় নি বরং নাট্যোচিত কর্মপ্রবাহ ব্যাহত হয়। অনেক জায়গায় এইগুলি ঘটনামুখী হয় নি এবং অবিশ্বাস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুইটি নাটিকা 'কল্যাণী' ও 'মূলা গাভরু', আহুতির সঙ্গে একই পুস্তকে প্রকাশিত এবং মোটের উপর তাদের বক্তব্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। 'মানসপ্রতিমা' পারস্যদেশীয় 'শিরি ফরহাদ' উপাখ্যানের কাব্যিক অনুসরণ। কিন্তু অসমীয়া সৃষ্টিতে এর অনুকরণ পাঁচমিশেলী রূপ নিয়েছে এবং ভাষায় মিতব্যয়িতারও অভাব।

এই প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য মনে রাখা উচিত যে অসমীয়া নাট্যশালার দাবীপূরণের জন্যই অতুল হাজারিকা নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। তবে আগে বাঙালী নাট্যকারেরাই এই অভাব পূর্ণ করতেন; যেমন গিরীশচন্দ্র ঘোষ বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। অতুল হাজারিকার সার্থকতা এই যে তিনি এই অভাব পূরণ করলেন এবং তাঁর এই সফলতায় অন্য অনেকে নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্যে নাটক লেখার প্রেরণা লাভ করলেন।

দৈবচরণ তালুকদারের তিনটি নাটক— 'বিপ্লব', 'বামুনি কুঁয়ার' ও 'ভাস্করবর্মা' বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। বিপ্লবের (গণ আন্দোলন) আখ্যানভাগে পাই—এক প্রজাপীড়ক অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রজারা আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই বিদ্রোহের প্রথম দিকে নেত্রী ছিলেন কবি চন্দ্রমোহনের কন্যা পার্বতী এবং পরে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন জমিদারের পুত্র স্বয়ং বিপিন। গর্বোদ্ধত জমিদারের দর্প চূর্ণ হয় এবং তিনি প্রজাদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করেন। নাটকটি পার্বতী ও বিপিনের বিবাহের আনন্দের মধ্যেই শেষ হয়। নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্র চিত্রণ দুর্বল। তবে এর মধ্যে কিছু দেশপ্রেমের গান আছে এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানের নির্দেশ আছে। 'বামুনি কোঁয়ার' একটি ঐতিহাসিক নাটক, যেখানে অসম ইতিহাসের একটি মনোরম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অহোমরাজ তয়োকামিথির দুই মহিষী। একসময় রাজা যখন দূরে চুটিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেছেন এবং বড়োরাণী রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেছেন তখন সপত্নী হিংসায় ছোটোরাণীকে রাজার অনুপস্থিতির সুযোগে হাবুং নামে এক জায়গায় নির্বাসনের আদেশ দেন। নির্বাসিতা মহিষী এক ব্রাহ্মণগৃহে আশ্রয় পান এবং সেখানে এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর নাম হয় 'বামুনি কুঁয়ার' (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গৃহে জাত রাজকুমার)। এই রাজপুত্র ক্রমশঃ বড়ো

হন এবং পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই মূল ঐতিহাসিক তথ্যকে কেন্দ্র করে রচিত কতকগুলি কল্পনামূলক উপনাটকীয় কাহিনী মূল নাটকে যোগ করা হয়েছে। শৈল্পিক সৌন্দর্য বেড়েছে দুটি কাল্পনিক চরিত্র বোদাই ও বরোমি-তে যাদের শিল্পচাতুর্যে ও রসমাধুর্যে নাটকটি অনবদ্য ও মনোহারী হয়েছে। 'ভাস্কর-বর্মা' সপ্তম শতাব্দীর কামরূপ রাজা ভাস্করবর্মার চিত্র। দুঃখের বিষয় এই নাটকে কথা ও কিংবদন্তীর জয় হলেও চরিত্রচিত্রণে ধীরগতি ও অবসাদের পরিচয়ই পাই।

জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার তিনটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও কতকগুলি প্রকাশের অপেক্ষায়। সেই তিনটি এই—'শোণিত কুঁয়ারী' (শোণিতপুরের রাজকুমারী), 'কারেঙ্গার লাগিরী' (রাজসভার নাগরী) এবং 'লভিতা'। শোণিতকুমারী নাট্যকারের অল্পবয়সে লেখা নাটক এবং এই 'পালা'য় আমরা পাই একজন উদীয়মান কবি ও নাট্যলেখককে। দ্বিতীয় নাটকটি 'কারেঙ্গার লাগিরী' তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক এবং অসমীয়া ভাষায় লেখা নাটক-নাটিকাগুলির মধ্যে একটি স্মরণীয় কীর্তি। নাট্যকার এখানে আর অতিজাগতিক বা অতীন্দ্রিয় দৃশ্যের মধ্যে নেই, তিনি নিজের স্বজাতিদের মধ্যেই বিচরণ করছেন। এখানে নাটকীয় সংঘাত ঘটছে মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে। পুরানো প্রজ্ঞা ও নতুন আদর্শবাদের মধ্যে, মানুষ ও তার অদৃষ্টের মধ্যে, এবং কবি তারই মধ্যে অতীতের ভূতকে দেখছেন বর্তমানের মধ্যাহ্নে। রাজকুমারী কাঞ্চনকে বিবাহ করতে বাধ্য হলেন সামাজিক চাপে, যদিও তিনি জানতে পারলেন যে রাজকুমারী তাঁর বান্ধব অনঙ্গরামের প্রেমিকা। অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তিনি অনঙ্গরামের হাতেই কাঞ্চনকে সমর্পণ করলেন। কিন্তু এই ঔদার্যকে কলঙ্কিত করা হল এই অপবাদে যে প্রাসাদ পরিচারিকা শেফালির সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়ে তিনি লিপ্ত। রাজমাতা শেফালিকে গোপনে নির্বাসিত করলেন। রাজপুত্র এই কথা শুনেই তাকে উদ্ধার করবার জন্য রওনা হলেন। শেফালি কিন্তু রাজকুমারকে এই সামাজিক অপযশ থেকে মুক্ত করতে ব্যগ্র হল। সে তার কামগন্ধহীন নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্যে নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিল। কুমারের জীবনে তার এই আত্মত্যাগ চিরকালের জন্যে এক শূন্যতাই রেখে গেল। আন্তরিকভাবে আগরওয়ালা একজন রোমান্টিক স্রষ্টা। আদর্শ প্রধান ভাবালু প্রেম ছাড়া তাঁর নাটকগুলিতে জীবনের

সহজ সরল প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাসের দিকই প্রতিফলিত হয়েছে। নাটকের বিভাগে অঙ্ক ও দৃশ্যগুলি আধুনিকভাবেই পরিচালিত ও প্রতিফলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি দৃশ্যে নাট্যকার কী ভাবে অভিনয়ের গতি স্থির করতে হবে তার শিল্পসম্মত নির্দেশও দিয়েছেন। কথোপকথনগুলি সজীব, স্পষ্ট এবং স্বতোৎসারিত। দৃশ্য সংযোজনে এবং চরিত্রাঙ্কণে নাটকীয় প্রয়োজন এবং বাক্-সংযম সর্বদাই তিনি স্মরণে রেখেছেন। চরিত্রগুলি প্রকৃতিগত ভাবে গড়ে উঠেছে। এবং নাটকীয় বৈপরীত্য তাদের শুধু স্পষ্টই করে নি, জীবন্ত ও সমর্থ করেছে। সুন্দরের বিপরীত সুদর্শন, কাঞ্চনের বিপরীত শেফালি এবং রেবতী ও সেঁউতি নাটকটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। 'শোণিত কুঁয়ারী'র ধোঁয়াটে এবং আধিভৌতিক পুরাকাহিনীর এবং 'কারেঙ্গার লাগিরী'র ভাবরসিক বিয়োগান্ত নাটকের পর জ্যোতিপ্রসাদ 'লভিতা'তে নেমে আসলেন বর্তমানের পাগলামিভরা ধরণীর ধূলিপ্রান্তে। পড়ে রইল তাঁর কল্পনাশ্রয়ী পুরাতনী কথা, কাব্য ও কাহিনী আর তদুপযোগী গান। 'লভিতা'য় আমরা পাই ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবের বিদ্রোহের ঝনঝনানি, দেশের স্বাধীনতার জন্য যখন জনগণমন উত্তাল ও কলরবমুখর হয়ে উঠেছে। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব যে তিনি এই নাটকের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছিলেন যে অসমীয়া তরুণ তরুণীদের মনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্পর্শ কিভাবে উদ্দীপিত করেছিল, নাড়া দিয়েছিল, বিপ্লবকে এগিয়ে দিয়েছিল। লভিতা ছিল আই, এন, এর একজন প্রাক্তন মহিলা সেনা এবং যুদ্ধান্তে তার অতি করুণ সামাজিক অবস্থা আমাদের গভীরভাবে বিচলিত করে। প্রকৃত সত্যঘটনার ভিত্তিতে লেখা এই নাটকটির মৌলিক তত্ত্ব হচ্ছে—সময়োপযোগী বিভিন্ন কর্মধারার প্রবাহ এবং বাধাপ্রাপ্ত আবেগের নর্তন। চরিত্রগুলি ঘটনাস্রোতের গরম আবহাওয়ায় যেন টগবগ করে ফুটছে এবং সেই চলমান গতির পরিবেশই নাটকের শক্তি। প্রকৃত ঘটনাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে নাট্যকারকে অনেক সময় তাঁর কাব্যশক্তি প্রকাশের ধার ও নাট্যভঙ্গিকে সংযত করতে হয়েছে। যদিও নাটকীয় রীতি নীতি অনুসারে এই নাটকটিকে বিয়োগান্ত আখ্যা দেওয়া যায় না, তবু পাঠক-পাঠিকার মনে যে ভাব প্রতিধ্বনিত হয়, সেটি বিয়োগান্তেরই অনুরূপ। 'লভিতা'তে 'কারেঙ্গার লাগিরী'র রোমান্টিক সৌন্দর্য নেই বটে কিন্তু নাটকের গতিবিধি জনগণের জানা ও চেনা পথেই অগ্রসর, এর বৃহৎ পরিধি ও এর

আবেদন এত সরল ও সহজবোধ্য যে নাট্যকারের অন্যান্য রচনার অপেক্ষা এই বিশিষ্ট নাটকটিই জনসাধারণের কাছে তাঁকে প্রিয় করেছে।

নকুলচন্দ্র ভূঁইয়া ছোটোগল্প লেখক হলেও নাট্যকার হিসেবেই সুপরিচিত। তাঁর দুটি নাটক 'বদন বরফুকন' ও 'চন্দ্রকান্ত সিংহ' আসামের গৌরবময় ইতিহাস —অসম যুগেরই পরিচয় প্রদান করে। বেজবরুয়ার 'বেলিমার' ও হিতেশ্বর বরবরুয়ার 'অহমর দিন' দুটি ঐতিহাসিক নাট্য, ঠিক নাটকও নয়, ইতিহাসও নয়। এই দুটি নাটকেই ইতিহাসকে কেন্দ্র করে নানাধরনের কাল্পনিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এবং তদুপযোগী চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে যাতে সেই যুগের ঐতিহ্য প্রতি-ফলিত হলেও এটি দিনগত পাপক্ষয়ের ধারাবাহিক সঠিক ইতিহাস নয়। 'বদন বরফুকন'-এর নাট্যকার ঐতিহ্যের প্রকৃত রূপটি ধরতে পারেন নি, সেখানে ঘটনার থেকে আনুগত্যই প্রবল। যদিও নাটকের সৌকর্যের জন্য তিনি গোলাপীর মতো কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সেগুলি যেন অসংলগ্ন এবং মূল সুরটিকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করে না। চরিত্রচিত্রণে নাট্যকারের সংগৃহীত বিষয় বস্তুর উপর বেশ আধিপত্য আছে। গর্বোদ্ধত স্বদেশপ্রেমিক রঙ্গন যখন ঘটনাচক্রে তাল হারালেন এবং অন্যেরা তাঁকে অতিক্রম করছে, তখন তিনি মাতৃভূমির বিরুদ্ধেই গেলেন। এই চিত্রটি বেশ শক্তির সঙ্গেই চিত্রিত হয়েছে। দূরদর্শিনী রাজমাতা, উন্নতমস্তক প্রধান মন্ত্রী পূর্ণানন্দ এবং দুর্বলমনা চন্দ্রকান্তের চরিত্রচিত্রণ সুপটু হাতেই ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও সহানুভূতির সঙ্গেই আঁকা হয়েছে। নাট্যকার একটি কাব্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে তদানীন্তন আসামের দুরবস্থার দরুন দায়ী শুধু রঙ্গনের দলবদল নয়, অতিনির্ভর-শীল একগুঁয়ে রাজনৈতিক কৌশলও। এই নাটকের স্বগোত্র ও উপসংহার 'চন্দ্রকান্ত সিংহ' আর একটি ঐতিহাসিক নাটক যাতে আহোম রাজ্যের দুরবস্থা ও পতনের চিত্র আঁকা হয়েছে। চন্দ্রকান্ত চরিত্রে আমরা দেখি এক দুর্বল, ভীরু, অলস, স্বার্থান্ধ, অদূরদর্শীকে ঘিরে রেখেছেন একদল সেই ধরনেরই স্বার্থপর, হিংসুক, লোভী, ষড়যন্ত্রকারী রাজ-অমাত্য ও সভাসদদল, যাদের চরিত্র সুচারু-রূপেই দেখিয়ে মূল নাটকটিকে প্রকাশ করতে সহায়তা করছে। নাটকের শেষ অঙ্কে যখন চন্দ্রকান্তের ভুল ভাঙল, তখন তিনি নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন ও তিরস্কার করছেন—তখনকার বাক্যালাপগুলি দর্শকদের মনকে স্পর্শ করে এবং তাঁরা তাঁর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হন। অন্য চরিত্রগুলিও মোটামুটিভাবে

সফলতা অর্জন করেছে। চতুর্থ অঙ্ক—আহোমদের প্রতি বর্মীদের নৃশংস অত্যাচার ও ভয়-দেখানোর দৃশ্যগুলিও আন্তরিক ভাবে দেখিয়ে সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে।

কমলানন্দ ভট্টাচার্য সংগীত রচয়িতা, নাট্যকার এবং একজন সফল অভিনেতা। অভিনয় বিষয়ে তাঁর নাম 'নওগাঁ ড্রামাটিক ক্লাব'-এর সঙ্গে জড়িত। তাঁর দুখানি বই 'নাগা কুঁয়ার' (নাগা রাজপুত্র) এবং 'অবসান' বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। 'নাগা কুঁয়ার' কানসেং নামক এক আহোম রাজকুমারের কাহিনী। যখন 'চুপিম্ফা' অসম সিংহাসনে সমাসীন তখন একজন অতি সুন্দর যুবক 'খুনরাও' রাজসভায় এসে রাজার গুণগান করত, উপহার দিত। একদিন রাজমহিষীর দৃষ্টি ঐ সুন্দর যুবকের উপর পড়ে এবং তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজাকে সেই কথা বলেন। এতেই রাজা রানীর উপর এতই ক্রুদ্ধ হন যে গর্ভবতী রানীকে তখনই নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন, ঐ তরুণ নাগাদের দেশে। সেখানে রানী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন যিনি আসামের ইতিহাসে 'নাগা রাজকুমার' নামেই প্রখ্যাত। তিনি যখন বড়ো হয়ে আহোম রাজাকে সম্মান জানাতে এলেন তখন রাজা (যিনি তাঁর জনক) সাদরেই তাঁকে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে বরণপাত্র গোঁহাইন বা রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। ঐ রাজকুমার কানসেং মুঘল আক্রমণ কালে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। নাটকটি শৌর্য বীর্যের বহু আখ্যানের সঙ্গে প্রেমেরও নানা কাহিনীতে ভরা। 'অবসান' নাটকটি শ্রীকৃষ্ণের জীবনের শেষ লীলা, যদুবংশ ধ্বংস ও ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের গল্প। গল্পটি অতি করুণ সুরে রচিত।

কমলেশ্বর চলিহার 'ধূলি' একটি প্রতীক একাঙ্কিকা। ধূলিই (নাটকে একটি নারীর মূর্তিরূপে দেখানো হয়েছে) শেষ পর্যন্ত সকলের আশ্রয়। সারা-জীবন সে দুঃখ ভোগ করেছে কিন্তু প্রয়োজনের সময় সকলেরই সেবা করেছে, বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু ঘটে। গোপালক রাখালের দল তার মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয় এবং হেমন্তলক্ষ্মী তার দেহাবসানে ব্যথিত হয়ে মৃদুমন্দ বাতাসে শবদেহের উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকেন।

পার্বতীপ্রসাদ বরুয়ার কাব্যনাটক 'লক্ষ্মী' এবং 'সোনার সোলং'ও প্রতীকী রচনা। লক্ষ্মী হচ্ছেন গ্রীষ্মের নিদাঘতপ্ত দিনের শেষ বেশে শরৎ বিদায় এবং হেমন্তিকার আবাহন। শুভ্রবসনা শারদলক্ষ্মীকে শ্বেতবরণ কাশংশুকা তৃণ-

মঞ্জরীতে ও শেফালিকার কলগীতনৃত্যে বিদায় সম্ভাষণ জানায়, ঋতুরানীকে সসম্মানে পৌঁছিয়ে দেয়। ধনধান্যপুষ্পভরা দেবী হেমন্তিকা কার্তিক মাসে ধরাধামে আসেন এবং শস্য উৎপাদনের শেষে কার্তিকা বিহু উৎসবে তাঁর জয়যাত্রা উদ্‌যাপিত হয়। নাট্যকার শস্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করে ঋতুরঙ্গের অভিনয় লিপিবদ্ধ করেছেন। 'সোনার সোলং' কতকগুলি সুরসমৃদ্ধ মধুর প্রতীক গীতবল্লরীর সংগ্রহ। 'বিন বিরাগী' (ভ্রাম্যমাণ-বৈরাগী) গায়ক কবি পরম আনন্দের অনুসন্ধানে পথে পথে চলেছেন—সে চলেছে অচিন দেশের পথে—সে যাত্রার নেই শেষ। সে সবাইকেই প্রশ্ন করছে—নীল আকাশে উড়ে যাওয়া হাঁসের সারি থেকে পথের নিচে নির্ঝরকে, যে স্রোতস্বতী কুলুকুলু করে গান গেয়ে চলেছে—কেউ কি তার সোনার সোলংকে অর্থাৎ আদর্শ সুখের সন্ধান বা খবর দিতে পারে? সে দেখতে চায়, পেতে চায়, বুঝতে চায় সেই আনন্দ-নিকেতনের জ্যোতিধারাকে—এই তার পদযাত্রার কৌতূহল। শেষ পর্যন্ত বিন বিরাগীর চৈতন্যোদয় হয় যে মনের মানুষকে মনের মাঝেই খোঁজ করতে হয়—সে আছে জীবনের ভিতরেই—ইহৈব—এইখানেই। এই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকেই গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং সেইটেই সত্যসনাতনে রূপান্তরিত হয়। এই প্রতীক রহস্য ছাড়াও তাঁর নাটকের গান ও কবিতাগুলি অসমীয়া কাব্যে ও গীতি সাহিত্যের শুধু একটি বিশিষ্ট অবদান নয়, শ্রেষ্ঠতমদের অন্যতম।

যদিও এটা স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই যে ইংরেজি নাট্যকলা ও শিল্পরীতি অসমীয়া নাটকে প্রভাব ফেলেছে, তবুও একথাও স্বীকার করতে হয় যে সেই প্রভাব খুবই অল্প এবং তার প্রভাব খুবই কম ও ভাসা ভাসা জাতীয় জীবনের গভীরতম তলকে স্পর্শ করতে পারেনি। নাটক গড়ে ওঠে সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করে এবং তার স্ফুরণ ও স্ফুটন সেই দীপশিখাকে ঘিরেই। অসমীয়া সমাজ ব্যবস্থা, ইংরেজি ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন, সেইজন্যে এই বিদেশী প্রভাব অসমীয়া নাট্যশালাকে গভীরতম স্তরে আলোড়িত করতে পারেনি। নাট্যের বিষয়ে নির্বাচনে, সামাজিক পরিস্থিতির চিত্রণে, ঐতিহাসিক ঘটনা পরিবেশের উন্মোচনে জাতীয় ভাব ও স্বদেশীয়ানার প্রতি ঝোঁক থাকতে বাধ্য। যদি না থাকে তবেই সেই নাটক জীবনের প্রতিচ্ছবি হয় না। এই মৌল লক্ষণটিই বিদেশী প্রভাবকে যথাসাধ্য সীমিত করে থাকে, কোনো ভাবে বিদেশী

প্রভাবের অনুপ্রবেশ ঘটলেও। যদিও লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'চক্রধ্বজ সিংহ' নাটকের 'গজপুরিয়া'র চরিত্রে শেক্সপীয়রের নাটকের 'ফলস্টাফ'-এর প্রভাব পড়তে পারে, ঐতিহাসিক নাটকের গৌণ কাহিনীর গঠনে এবং পুরুষবেশে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় অসমীয়া নাটকে একই উৎস থেকে এলেও সেগুলিকে বহিঃপ্রভাবের এহবাহ্য সীমা বলা যায়। অসমীয়া নাট্যাঙ্গনে শেক্সপীয়রের নাটকের অনুসরণে লেখা নাটকগুলি বেশিদিন চলেনি, কারণ অসমীয়া সমাজ ও পশ্চিমী সমাজের চিন্তাচেতন ভাবধারা, সমাজ ব্যবস্থা এবং নাট্য পরিবেশের স্পষ্ট ছায়া ছিল ভিন্ন ধরনের।

'ভ্রমরঙ্গ' (১৮৮৯) শেক্সপীয়রের 'কমেডি অফ এররস'-এর অনুবাদ। এই বোধহয় অসমীয়া রঙ্গমঞ্চে শেক্সপীয়রের প্রথম আবির্ভাব। তারপর দেখি দুর্গেশ্বর শর্মার 'চন্দ্রাবলী' (অ্যাজ ইউ লাইক ইট), নবীনচন্দ্র বরদলৈ-এর 'তারা' (সিম্বেলিন), দেবানন্দ ভরালির 'ভীমদর্প' (ম্যাকবেথ) এবং পদ্মধর চলিহার 'অমরলীলা' (রোমিও জুলিয়েট)। এইসব অনুসরণ, অনুকরণ বা অনুবাদে ইয়োরোপীয় নামের বদলে পাত্রপাত্রীদের অসমীয়া নামই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অসমীয়া নাট্যরঙ্গমঞ্চে তাদের যে বিশেষ কিছু প্রভাব পড়েছিল তা মনে হয় না। কোনো সফল নাট্যকারই নাটককে প্রাণবন্ত করতে না পারলে রঙ্গমঞ্চে তা জমে ওঠে না। অনুকরণ বা অনুসৃতি প্রায়ই প্রাণহীন অঙ্গাবরণে পরিণত হয়েছে। তার উপর তাদের দ্বিমাত্রিক চরিত্রচিত্রণ বিশেষ কোনো ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করে না, এগুলি রক্তহীন নিষ্প্রাণ বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে ইংরেজি নাটকের নিপুণ অনুবাদকের দল (যদিও কিছু ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়), যেন পল্লবগ্রাহিতার রাজপথেই পথ পরিক্রম করেছিল—তাদের ইংরেজ প্রভুদের চিহ্নিত সৌন্দর্যমণ্ডিত অধ্যায়গুলিই যেন পুনঃপ্রদর্শিত হয়েছে, এক অচেনা মাটিতে সেগুলিকে রোপণের ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।

১৯৪৭ এবং তারপর

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর এবং ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর অসমীয়া সাহিত্য এক সৃষ্টিশীলতার নবযুগে প্রবেশ করেছে এবং বহু লেখক নানা দিক থেকে সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করে তোলবার চেষ্টা করছেন। আজ-

কালকার নাটকগুলি বর্তমান যুগের রুচি ও ভাবনাকে প্রকাশ করছে, যুগ সমস্যার নানা বিচিত্র প্রসঙ্গ নিয়ে নাটক রচিত হচ্ছে। সেজন্য প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নাটকগুলির আর গণমনে তেমন স্থান নেই, সেই আঙ্গিক বা ভঙ্গিতে নাটক লিখিত হলেও সেগুলি নতুন আলোকে সমসাময়িক জীবনের ভাষ্য হিসেবেই রচিত হয়েছে—যা পূর্বেই বলা হয়েছে প্রতীকী নাটকের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। যে স্বাদেশিক চিন্তা ও দেশপ্রেম এর আগে বহু নাটকের উপজীব্য বিষয় ছিল এবং আহোম ইতিকথায় সেই সব ভাবের বহু উপাদান মিলত। তবু তখনকার নাট্যকার তারই মধ্যে থেকে বিষয় নির্বাচন করে চরিত্র আঁকার দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন এবং এখনকার মতো অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে নাটকের মাধ্যমে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আদর্শ ও মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করতেন না। আধুনিক নাটক রচয়িতারা ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে, হিন্দু মুসলমান মিলনের উদ্দেশ্যে বা ইংরেজ শাসনের হীন জাতিগুলির বিরুদ্ধে বা যে সব স্বদেশের বীররা দেশের জন্য অত্যাচার বা অবিচার সহ্য করেছেন বা প্রাণ দিয়েছেন নির্যাতনের বলি হয়েছেন তাদেরই সাধুবাদ দেবার উদ্দেশ্যে নাটক লিখেছেন। চন্দ্রকান্ত ফুকনের 'পিয়ালী ফুকন' এই ধরনের একটি ইংরেজ বিদ্বেষী নাটক। চন্দ্রকান্ত নিজে একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন ও সেই ঘনিষ্ঠ অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই তিনি একটি স্বদেশপ্রেম সিঞ্চিত নাটক লিখলেন এবং অভিনয়ের ব্যবস্থাও করলেন। পিয়ালী ফুকন আহোম রাজবংশের শেষ পুরুষ যিনি গোপনে ব্রিটিশদের আসাম থেকে বিতাড়িত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একটি ব্রিটিশ অস্ত্রাগারে আগুন লাগাবার আয়োজন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়েন এবং তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ফাঁসিতেই তাঁর জীবনের শেষ। প্রবীণ ফুকন আর একজন ব্রিটিশ বিদ্বেষী নাট্যকার এবং তাঁর 'মণিরাম দেওয়ান' নাটকে তিনি দেখিয়েছেন যে একজন অসমীয়া রাজপুরুষ মণিরাম কি ভাবে আসামে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁকেও এই অপরাধে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিতে হয়। এই দুই নাটকেই অতি আধুনিক চিন্তাধারা প্রকাশ পায়। সারদাকান্ত বরদলৈ হিন্দু মুসলমান ঐক্যের উপর নির্ভর করে তাঁর 'মগরিবার আজান' নামে নাটক লিখেলেন। এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে—একজন মুসলমান একটি তরুণী হিন্দু উপজাতীয় কন্যাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন

দিল। এই নাটকে অত্যন্ত বাস্তবভাবে চিত্রিত হয়েছে যে গ্রামে কিভাবে হিন্দু মুসলমান ও উপজাতীয় লোকেরা একসঙ্গে মিলেমিশে সুখ শান্তিতে বাস করে।

কিন্তু আজকালকার বেশির ভাগ নাটকই নগরজীবনের সমস্যা ও খুঁটিনাটি নিয়েই ব্যস্ত। আগের যুগের সামাজিক সংস্কারমূলক নাটকের জায়গায় ঐসব সামাজিক বৈষম্যের মূল কারণ নির্ণয়মূলক নাটক এসেছে। আজকাল নগর-বাসীরা এই সব অর্থনৈতিক ও নাগরিক সমস্যা নিয়েই জর্জরিত, সমাজে আজ নারীদের কি বক্তব্য ও তাদের স্থান নিয়েও নানা আলোচনা চলছে। যুগের সঙ্গে যুগ সমস্যাও বদলাচ্ছে এবং তার চিত্রণ অবশ্যম্ভাবী। শারদা বরদলৈ-এর 'পহিলা তারিখ' (মাসের প্রথম দিন) অত্যন্ত নিপুণভাবে নিম্ন মধ্যবিত্ত স্বল্পমাহিনাজীবী কর্মচারীদের করুণ কাহিনী বিবৃত করেছে; এদের দেখা যায় যে মাসের প্রথম দিনেই আগের মাসের ঋণ শোধেই সব টাকা অদৃশ্য হয়।

গৌহাটি ও শিলং-এ আকাশবাণীর শাখা খোলার পর একাঙ্কিকা নাটক-গুলি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে কতকগুলিতে সাহিত্যিক গুণও দেখা যায়। এই নাটকগুলির মধ্যে শুধু গল্পবিন্যাস বা ঘটনার বিবৃতির উপরই নাটকের গতি নির্ভরশীল নয়, এখানে নরনারীর মানসিক ঘাত প্রতিঘাতে যে সব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেগুলিকেই তুলে ধরা হয়। মনস্তত্ত্বের সংঘাতের উপরও লেখকের প্রখর দৃষ্টি। এই সব সংঘাত হয় অর্থনৈতিক না হয় সামাজিক ব্যবধান ও দোষত্রুটি নিয়ে। এইখানে দু একটি চরিত্রকে তুলে ধরে নাট্যকার এমন এক পরিস্থিতি ও সমস্যার সৃষ্টি করেছেন যে সমাজজীবনের কতকগুলি সাধারণ দিক বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। সেই দৃষ্টি ভঙ্গিতে এই নাটকগুলিকে বিচার করলে বলা যেতে পারে যে শিল্পের রীতি অনুযায়ী এই একাঙ্কিকা নাটকগুলি ছোটো গল্পেরই স্থান অধিকার করেছে। উদাহরণ স্বরূপ সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা যায়—'এবেলার নাট' (অর্ধদিনের নাটক) নামে একাঙ্কিকাটি—একটি পরিবারের পিতা, মাতা, পুত্র ও কন্যার দুই প্রজন্মের জীবনবোধ, মূল্যায়ণ ও আদর্শবাদের সংঘাত দেখি, কেউ কেউ পুরানো মানকে ধরে রাখবার চেষ্টায় ব্যস্ত, কেউ বা সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনে নতুন মূল্যমান দিতে প্রস্তুত। এই নাটকের কৌতুকময় দিকটি

এই যে এই সব ঘটনা ঘটে গেল এক অর্ধবেলার মধ্যেই। এই বিষয় বস্তুকে ধীরে ধীরে সুষ্ঠু বাক্যালাপে রসোত্তীর্ণ করে তুঙ্গে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা এত সুচারুভাবে ও সুকৌশলে সুসম্পন্ন হয়েছে যে এটি যে কোনো বিশেষ দেশের বা সমাজ ব্যবস্থার ঘটনা বোঝাই যায় না। এই ধরনের নাট্যালাপ সামাজিক ও জাতীয় গণ্ডি পেরিয়ে, বিস্তৃত ক্ষেত্রে সার্বিক পরিবর্তনের আভাস দেয়। আগামী দিনের একাঙ্কিকা নাটকগুলি বোধহয়, নানা রুচির দর্শকদের পরিতৃপ্ত করার একমাত্র নাটকীয় ধারক বাহক ও পোষক হতে পারবে।

নবম পরিচ্ছেদ

উপন্যাস ও ছোটোগল্প

ব্রিটিশ কর্তৃক পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া উপন্যাস লেখার রীতি প্রবর্তিত হয়। প্রতীচ্যের অনুপ্রেরণাই এই ধরণের সাহিত্য স্থষ্টির মূল। অরুণোদয় পত্রিকাতেই প্রথম 'বুনিয়ান'-এর 'পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস' বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। নাম দেওয়া হয় 'যাত্রিকরের যাত্রা'। 'কামিনী কান্ত' এবং 'ফুলমণি আরু করুণা' সম্বন্ধে আগেই আমরা লিখেছি। অবশ্য দুটি পুস্তকই ক্রিশ্চান মিশনারীদের দ্বারা প্রভাবিত এবং তাদের শাস্ত্র থেকে সংগৃহীত গল্প। ১৮৮০ সালে পদ্মাবতী দেবী ফুকনানীর 'সধর্মর উপাখ্যান' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এটিই সর্বপ্রথম একজন অসমীয়া মহিলা রচিত উপন্যাস। এর মধ্যে কিছু সাহিত্যিক রস ও গুণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু একটি স্থনির্দিষ্ট ঘটনা বহুল গল্পকে কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাস—হেমচন্দ্র বরুয়ার 'বাহিরে রংচং ভিতরে কোওয়া ভাতুরি' (বৈঠকখানায় হাঁকডাক অন্দরে লবডঙ্কা)। যেহেতু এই উপন্যাসটি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা, যেমন তখনকার দিনের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সেজন্যে এখানেই প্রথম বাস্তবতার কঠিন সংঘাত ও নির্মমতা এবং চরিত্রচিত্রণে তার প্রকাশ দেখতে পাই। সামাজিক উপন্যাসের পরেই ঐতিহাসিক উপন্যাস সাহিত্যের আসরে জমে বসেছে। এই বিষয়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াই পুরোগামী লেখকদের একজন। তাঁর 'পদুমকোয়ারী' একটি ব্যর্থ প্রেমকে কেন্দ্র করে বিয়োগান্ত উপন্যাস। গল্পের সারাংশ হচ্ছে—পদুম ভালোবাসে স্থর্যকে। পদুমের বাবা ও কাকা, হরদত্ত ও বীরদত্ত কামরূপের এক দুর্ধর্ষ জমিদারবংশজাত এবং তারা আহোমরাজের বিরুদ্ধে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্র করে। এই গণ্ডগোলের মধ্যে পাদুম ও স্থর্যের প্রেম কিন্তু বাধা পায় না এবং স্বাভাবিক ভাবেই পরিস্ফুট হয়। গ্রন্থকার তখনকার দিনের সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থার ও আবহাওয়ার এমন একটি স্থন্দর চিত্র এঁকেছেন, যেন চরিত্রগুলি কাল্পনিক নয়, তাল ও মান অনুসারে সময়ানুগ-ও। তারা যেন সেই যুগেই

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করেছে। ঘটনাগুলিকে অতি বিশদভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখানো হয়েছে এবং গল্পের মধ্যে সত্যের ছাপ পড়েছে এবং ঔপন্যাসিক ঘটনাবিন্যাসের বলিষ্ঠ কৌশলে, ভাবের সামঞ্জস্যে এবং পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু মিশ্রণে রসোত্তীর্ণ হওয়ায় লেখক সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন।

পদ্মনাথ গোঁহাইবরুয়া দুটি উপন্যাস রচনা করেন 'লাহরী' ও 'ভানুমতী'—দুটিই প্রেমকেন্দ্রিক এবং অহোম যুগের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হলেও এগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। গল্পের আখ্যানে ও বিবর্তনে, চরিত্রচিত্রণে বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তেমনি তেজ নেই।

রজনীকান্ত বরদলৈ (১৮৬৯-১৯৩৯) সাহিত্যের অন্যক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ, করলেও, তিনি একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক বলেই সমধিক খ্যাত। তাঁর অসমীয়া অতীতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং সেই মূল্যবান সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি তাঁর দেশের লোকদের কাছে উচ্চ আদর্শ তুলে ধরেছেন এবং মানবীয় ভুলভ্রান্তির জন্যও তাঁর বেদনা বোধ ও সহানুভূতি ছিল। সব শ্রেণীর মানুষের জন্যেই তাঁর উদার মনের দরজা খোলা ছিল এবং তিনি নিজেই সেই মিশ্ররস তাঁর উপন্যাস সাহিত্যের মাধমে পরিবেশন করেছেন এবং সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করতেন—যেন একজন কর্মব্যস্ত পাঠক এখান থেকে ওখানে দ্রুত ঘুরে চলেছেন, সেবা দিয়ে, প্রেম দিয়ে লোকের দুঃখ দূর করবার জন্যে। জীবনের প্রধান কামনা বাসনার মধ্য দিয়ে যা চিরকালীন এবং যা কোনো শ্রেণী বা দল বা বিভেদ দিয়ে প্রতিহত নয়, সর্বংসহ, তাকেই পরিস্ফুট করেছে। তাই তিনি অসমীয়া সাহিত্যের উদার হৃদয়ের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে সরস স্রষ্টা।

স্যার ওয়ালটার স্কটের দ্বারা বরদলৈ যে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন সে কথা স্বীকার করতেই হবে। স্কটের এবং মহৎ বাঙালী ঔপন্যাসিক বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রতি তাঁর ছিল শ্রদ্ধা। তাঁদেরই মতো পথের ধারের চমৎকার দৃশ্যের প্রতি তাঁর ছিল মমতা, তাঁদের মতোই রসবোধ। এই সম্বল করেই তিনি কলম ধরলেন আসামের জাতীয় অস্তিত্বের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কালে ইতিহাস বর্ণনা করতে। তাঁর রচিত গ্রন্থে শুধু দার্শনিক ও সৃজনশীল কল্পনা শক্তিরই প্রকাশ নয়, সেখানে আছে সাহিত্যক নিপুণতা, বর্ণনার আবেগ ও জীবনের ঘটনাবলীর প্রতি সত্যানুরাগ। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের জনপ্রিয়তা সাধারণত বেশিদিন

স্থায়ী হয় না এবং শীঘ্রই তাঁদের জনপ্রিয়তা কমে সিংহাসনচ্যুতি ঘটে। কিন্তু বরদলৈ অসমীয়া উপন্যাস রাজ্যে আজও অধিপতি, তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস-গুলি অসমীয়া উপন্যাস জগতে আজও রসে সমুজ্জ্বল। স্কট ও বঙ্কিম যেমন নিজ নিজ সাহিত্যক্ষেত্রে এক-একটি বিশিষ্ট নাম, বরদলৈও অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যের এক বিরাট প্রতিভা। 'মিরিজিয়ারী' নামক উপন্যাস ছাড়া বরদলৈ-এর সব উপন্যাসই ইতিহাসভিত্তিক। ১৮৯৫ সালে রচিত 'মিরিজিয়ারী' তাঁর প্রথম ঔপন্যাস। এতে দুটি মিরি তরুণ-তরুণীর করুণ প্রেমের কাহিনী বর্ণিত—যে প্রেম মিলনের সাফল্যে দুঃখবিরহ জ্বালাকে অতিক্রম করতে পারে নি। উপজাতির চরিত্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাস অসমীয়া সাহিত্যে এই বোধ হয় প্রথম। 'মনোমতী' (১৯০০) তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। অহোমরাজাদের শেষ যুগে, বর্মী আক্রমণের পরিবেশে, লক্ষ্মীকান্ত ও মনোমতীর প্রেম উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে এটি লেখা, যখন দেশের চারিদিকে অরাজকতায়, অশান্তিতে, অবরোধে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত ও জনজীবন বিধ্বস্ত। লেখক কিন্তু লক্ষ্মীকান্তের বীরত্ব ও গাম্ভীর্য এবং মনোমতীর রমণীসুলভ মাধুর্য দুইই সুচারুভাবে পরিস্ফুট করেছেন এবং আমাদের স্মৃতিতে তারা আজও উজ্জ্বল। একজন ইংরেজ কবির অনুসরণে বলা যায় যে মহত্তর জনসমাজে যে আশীর্বচন ও প্রার্থনাবাণী স্বতঃ উৎসারিত হয়ে ওঠে, তাই এই দুই প্রেমিক প্রেমিকার প্রাপ্য—মুকুটধারী সম্রাট বা যুদ্ধবিজয়ী বীরের গৌরব সেখানে অকিঞ্চিৎকর। 'রঙ্গিলী র (১৯২৫) পিছনেও সেই কালো ইতিহাসের প্রেতছায়া। বর্মীরা দেশ আক্রমণ করেছে, চতুর্দিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক গণ্ডগোল, পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, রাজ-অমাত্যদের মধ্যে নিত্য ষড়যন্ত্র, তারই মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে একটি আদর্শ মহিলার আলেখ্য যার উজ্জ্বল দীপ্তিতে সেই তিমির-নিবিড় ক্ষণগুলিও দীপ্যমান। এই মহীয়সী মহিলার একান্ত প্রেম মানবিক পর্যায় ছাড়িয়ে প্রায় ভাগবতীপ্রেমেই পর্যবসিত হয়। ঔপন্যাসিকদের ধারণা যে 'রঙ্গিলী'র এই প্রণয় প্রদীপ্তা নারীর প্রতিচ্ছবি শুধু একটি ঘরের ঘরণীর নয়, বরং সেই পতনের যুগের বহু সংসারের দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে স্মরণীয় নারীচরিত্রের প্রতীক। আর একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হচ্ছে—'রহদাই লিগিরি' (রাজ-সভায় সখিপর্যায়ে দাসী)—এখানেও লেখক একটি বিশুদ্ধ প্রেম আখ্যায়িকার সূচনা করেছেন। 'রহদাই' একজন অতিসাধারণ তরুণী যে দয়ারামের সঙ্গে

গভীর প্রেমে পড়েছে—সেও একজন অনন্য সাধারণ তরুণ নয়, একজন সামান্য যুবক। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—'রহদাই'-এর জ্বলন্ত প্রেমশিখা স্থির অবিচলিত ভাবেই জ্বলতে থাকে রাজকীয় প্রচণ্ড অপ্রসন্নতা ও নির্যাতনের মধ্যেও, নানা প্রলোভন সত্ত্বেও। যখন অত্যাচার ও অনাচার, তীক্ষ্ণ আঘাতে তার জীবন যাত্রা অসহ্য হয়ে উঠল তখন সে যোগাভ্যাসে মনকে আরও দৃঢ় সংযত করে শুধু নিজেকে রক্ষা করতেই সক্ষম হল না, দয়ারামের মানসিক পরিবর্তন ঘটাল। 'নির্মল ভকত' (১৯২৫) উপন্যাসে নায়ক নির্মল ব্রহ্মদেশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে বন্দী হয় এবং তাকে ব্রহ্মদেশে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সে কোনো রকমে ঐ দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দেখে যে শুধু তার দেশের নয়, আপন গৃহেরও, বহু পরিবর্তন হয়েছে। তার স্ত্রী অন্য এক পুরুষের অঙ্কশায়িনী। নির্মল কিন্তু জীবনে হতাশ না হয়ে একজন বৈষ্ণবভক্তে রূপান্তরিত হল এবং অবশিষ্ট জীবন সেই অনুসন্ধিৎসাতেই তৎপর হয়ে শান্তিলাভ করল। উপনিষদের সেই বাণীই তার সাধনার সম্বল "যা অশ্রুত ছিল, তা শ্রুত হল, যা মননে আসেনি, তারি চিন্তা মননে আবির্ভূত হল—যা বোধগম্য হয়নি, তা বোধিতে উদ্ভাসিত হ'ল।"

'তাম্রেশ্বরীর মন্দির' আর একটি উপন্যাস, যা ঐতিহাসিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, এমন কি পরিচিত স্থানাদির দ্বারা চিহ্নিত ও সীমিত হয়ে একটি যুগল মানবীর প্রেমের প্রবল প্লাবনের ইতিকথাই সেখানে উপজীব্য বিষয়। তাদের নাম 'ধনেশ্বর ও অঘোনী' যাদের মিলনে নানা বাধা ও বিরোধ উপস্থিত হয়, যার মধ্যে সব থেকে বেশি বাধা আসে মন্দিরের তান্ত্রিক সাধকগোষ্ঠীর কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত তান্ত্রিকরা হার মানে বৈষ্ণবদের কাছে এবং সর্বগ্রাসী ভালোবাসার জয় হয় অন্ধ আচারের উপর। ঘটনার কাল 'নির্মল ভকতের'ই সমকালীন।

'দন্দুভা দ্রোহ' (১৯১৯) আর একটি উপন্যাস যেখানে আহোম শাসনের বিরুদ্ধে কামরূপ জনগণের বিদ্রোহের উপাখ্যান লেখা হয়েছে। আহোম রাজ-প্রতিনিধি বদনচন্দ্রের কুশাসনে তিতিবিরক্ত হয়ে কামরূপবাসীরা দুই ভাই হরদত্ত বীরদত্তের নেতৃত্বে বিপ্লবে যোগদান করে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরদত্ত মৃত্যু বরণ করেন এবং হরদত্ত ধরা প'ড়ে সামরিক বিচারে মৃত্যুদণ্ডাদেশ পান। হরদত্তের মেয়ে ধরা পড়ার চেয়ে ব্রহ্মপুত্রনদের পুণ্যসলিলে আত্ম বিসর্জন দেওয়াই

শ্রেয় মনে করলেন। এই উপন্যাসে প্রেমের কাহিনীও স্থান পেয়েছে এবং এই সব ঘটনার কাল ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি। 'রাধা রুক্মিণী' রজনীকান্ত বরদলৈ-এর আর একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এইটির বিষয়বস্তু 'মোরামারিয়া বিদ্রোহ'—তারা ধর্মে বৈষ্ণবপন্থী এবং এই উপন্যাসে গ্রন্থকার রাধা এবং রুক্মিণী নামে মোরামারিয়া বৈষ্ণব দলের অন্তর্গত তুই তেজস্বিনী বীরাঙ্গনার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যদিও বরদলৈ-এর উপন্যাসগুলি ঐতিহাসিক পরিবেশে লেখা তথাপি তাদের লক্ষ্য ইতিহাসকে নতুন করে রূপায়িত করা নয়। বরং উপন্যাসের নবনব চরিত্রগুলিকে কল্পনায় সঞ্জীবিত করে তোলা হয়েছে। এই চিত্র রূপায়ণে তাঁর দক্ষতা প্রশংসনীয়। বরদলৈ-এর নারী চরিত্রগুলি বিশেষ-ভাবে মনোহারিনী। তাদের প্রেম, নিষ্ঠা, চারুশীলতা, মানসিক উদ্যম ও নূতন ভাবে প্রকাশ করার শক্তি, কাজে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা বহু বাধা বিরোধের মধ্যে অমিত বীর্য ও শৌর্যের পরিচয় তাদের প্রশংসনীয় করে তুলেছে। অথচ ঔপন্যাসিক তাদের সম্পূর্ণ রূপে দেখাতে যে বিশেষ উৎসাহী তা মনে হয় না। তাঁর উদ্দেশ্য ঐ সব চরিত্রকে অবলম্বন করে নাটকীয় আখ্যান সৃষ্টি যেখানে থাকবে চমকপ্রদ অস্বাভাবিক ঘটনাবলী এবং বৈচিত্র্যময় রোমাঞ্চকর কাজকর্ম, যেন একটি ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে নানা রকম সুন্দর কাজ করা একটি রঙিন ছবি। রজনীকান্ত বরদলৈ-এর উপন্যাস সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখনীয় যে তাঁর উপন্যাসের প্রতিপাদ্য হল যে মানবজীবনে সত্যশিব সুন্দরের আদর্শই প্রধান ও নৈতিক বলই শ্রেষ্ঠ। লেখক তাঁর লেখায় তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব মতবাদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন এবং এই বিষয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন এই অনুমান অসংগত না হতে পারে। উপন্যাসের কাহিনী সুকৌশলে পরিকল্পিত কিন্তু লেখক জনগণের সাধারণ বিশ্বাস যার মধ্যে ছায়াঘন আধভৌতিক বিশ্বাসও আছে, তার সাহায্য নিতে দ্বিধা করেন। দণ্ডিনাথ কলিতার তুটি উপন্যাস—'সাধনা' ও 'আবিষ্কার' সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে লেখা। তুটিরই প্রধান চরিত্র—দীনবন্ধু ও মাধব তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিলাস বৈভব সব ত্যাগ করে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় রত। তুটি স্ত্রীচরিত্র—রম্ভা ও প্রতিমার মাধ্যমে লেখক পতিতা নারী-দের সমস্যা আলোচনা করেছেন ও তার সমাধান কিসে সম্ভব তার নির্দেশ দিয়েছেন। এই তুই উপন্যাসেই সতত বিচারশীল লেখকের সামাজিক সত্তার

নিদর্শন পাই। তিনি সামাজিক অবিচার, সংকীর্ণতাবাদ প্রভৃতি বৈষম্যের প্রতি তাঁর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তৃতীয় উপন্যাস—'গণবিপ্লব' আহোম রাজাদের শেষযুগের মোয়ামারিয়া বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত। ইতিহাসের ঘটনা বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত হয়েছে, কিন্তু চরিত্র চিত্রণে একটা সৃজনশীল কল্পনা-শক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। একই ধরনের ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় তাঁর বৃহৎ কবিতা 'অসম সন্ধ্যা'য়। 'কলিতা' বহিরঙ্গে বাস্তববাদী কিন্তু অন্তরের অন্তঃপুরে সনিষ্ঠ প্রেরণাজাত চরিত্র বা পরিচিত পরিকল্পনায় ক্ষমতার অভাব দেখি তাঁর রচনাতে। দৈবচন্দ্র তালুকদার (১৯০১-১৯৪৩) কবিতা, গল্প এবং নাটক তিন ধারাতেই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একটি বিভাগে মনঃসংযোগ না করার ফলে, যা স্বাভাবিক তাই ঘটেছে, অর্থাৎ তিনি সাধারণ মানের উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। তাঁর 'অপূর্ণ' উপন্যাসের নায়ক একটি গ্রামীণ চরিত্র প্রেমধরের বহুবাধাগ্রস্ত জীবনকাহিনী—সে বহু বাধা অতিক্রম করে জীবনে জয়ী হয়েও অবশেষে অপরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। তার ফলে তার জীবনের আদর্শ অপূর্ণই থেকে যায়। 'আগ্নেয়গিরি' উপন্যাসের নায়ক কনকসমাজ ও তার আচারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। 'বিদ্রোহ' খানিকটা এই উপন্যাসেরই পরিপূরক, এখানেও কনকই নায়ক। সমাজ আচার লঙ্ঘন করে কনক বিধবা আইকনকে বিবাহ করে এবং উভয়ে জাতীয় মুক্তির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে। আইকন গ্রামীণ সংস্কার ও পুনর্গঠনে নিয়োজিত আর কনক স্থান থেকে স্থানান্তরে বিদ্রোহের শিখা জ্বালিয়ে চলেছে—সাদিয়া থেকে লাহোরে ঝড়ের বেগে। কাহিনীটির কোনো মহৎ উদ্দেশ্য বা সুপরিণতি নেই। নির্জীব একঘেয়ে ভঙ্গিতে রচিত কাহিনীতে কোনো সাবলীলতা বা স্বাচ্ছন্দ্য নেই। কেবলই কাল্পনিক বীরত্ব ব্যঞ্জক ঘটনার ব্যর্থ বর্ণনা। এর কাহিনীগুলি যেন কেবল কথার ফুলঝুরির আয়োজন। গত দশকের পূর্বের ও পরের উপন্যাস সাহিত্যের সম্যক ও সুষ্ঠু আলোচনা করলে দেখা যাবে যে সেই দশকের অসমীয়া সাহিত্যের কৃতকার্যতা কতটা সীমাবদ্ধ। বর্তমানে এই ধরনের লেখার মান যথেষ্ট উন্নত এবং তার সুষ্ঠু চিহ্নও পরিস্ফুট। পূর্বেকার ভাবসম্বল রোমাণ্টিক গাথার পরিবর্তে আজকের লেখকেরা সত্য ঘটনার ভিত্তিতে মনস্তাত্ত্বিক অধ্যায়ে পৌঁছেছে। সমাজে অবহেলিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতি বা তথা কথিত নিম্ন শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি পড়েছে এবং তাদের অনন্যসামাজিক

অবস্থান নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলেছে। আসামের গ্রাম্য জীবন অবলম্বনে এই ধরনের একটি উপন্যাসের নাম 'জীবনর বাটত' (জীবনের রাজপথে)। লেখকের ছদ্মনাম—বীণা বরুয়া। সুপরিচিত লেখক শ্রীযুক্ত বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া এই ছদ্মনামেই তাঁর আর একটি উপন্যাস—'সেউজি পাতর কাহিনী'তে (সবুজ পাতার গল্প) আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে সহানুভূতির সঙ্গে লিখেছেন। দীননাথ শর্মার 'নদাই' গ্রাম্য জীবন সম্পর্কে আর একটি উপন্যাস। এই উপাখ্যানে চাষী নদাই-এর চরিত্র চিত্রিত হয়েছে বিচিত্রভাবে—সে শুধু চাষই করে না, তার সমগ্র জীবন এই গ্রাম-কেন্দ্রিকতার সুরে বাঁধা এবং গ্রন্থকার তাকে গ্রামীণ সংস্কৃতির একজন আদর্শ পুরুষ হিসেবে দেখিয়েছেন—সে সদাশয় অতিথি বৎসল এবং গ্রামের সকলের সঙ্গে তার আত্মার আত্মীয়তা। হিতেশ ডেকার 'আজির মানুহ' (এই যুগের মানুষ) এবং 'মাটি কার' উপন্যাসে বর্তমান যুগের কৃষি ভিত্তিক সমাজতত্ত্বের মৌলিক প্রশ্ন তুলে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক মূল্যায়নে মানুষের স্থান কোথায় তা নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থকারের 'ভারা ঘর' একটি চমৎকার প্রেমের আখ্যান যা নগর কেন্দ্রিক তথাকথিত সভ্যসমাজে লোকবৃদ্ধির কারণে গৃহসমস্যার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আদ্যনাথ শর্মার 'জীবনর তিনি অধ্যায়' (জীবনের তিন অধ্যায়), চন্দ্রকান্ত গগৈ-এর 'সোনর নাঙ্গল' (সোনার লাঙ্গল), গোবিন্দ মহান্তর 'কৃষকর নাতি' (চাষীর বংশধর) প্রভৃতি গ্রন্থ সামাজিক সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ সম্ভূত উপন্যাস হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

নবকান্ত বরুয়ার 'কপিলীপরীয়া সাধু' একটি প্রণয়মূলক আখ্যানকে কেন্দ্র করে লেখা। কপিলী নদীর প্রায় প্রত্যেক বছরই গতি প্রকৃতি বদলাত এবং সেইজন্যে জনগণের দুঃখ দুর্দশারও শেষ ছিল না এবং লেখক সেই কথাই ভাষায় রূপ দিয়েছেন। যোগেশ দাসের (১৯২৭) 'দাবর আরু নাই' (মেঘ কেটে গেছে)-তে গত বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ শৃঙ্খলার যে দারুণ অবনতি ঘটেছিল তারই পরিচয় রয়েছে। তাঁর 'সহারি পাই' ও 'জোনাকির জুই' প্রেমের মধুর গল্প পরিবেশন করে, যা এই পৃথিবীর নরনারীর সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ। তিনি কতকগুলি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি ঘটিয়ে যে সামগ্রিক রসসমৃদ্ধ উপন্যাসের পত্তন করেছেন, সেগুলি সমাজজীবনেরই খণ্ড খণ্ড অংশ যা প্রতিফলিত হয়েছে একটি বড়ো আয়নার মধ্যে। মহম্মদ পিয়ার আর

একজন ঔপন্যাসিক যিনি 'সংগ্রাম' নামে উপন্যাসে নগরজীবনের চিত্র, মধ্যবিত্ত সমাজের তরুণদের দুঃখ বেদনা ও সংগ্রাম সংঘর্ষের ইতিকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর 'হেরোয়া স্বর্গ' (ভ্রষ্ট স্বর্গ) মুসলিম পরিবার কেন্দ্রিক উপন্যাস। কতকগুলি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসও বর্তমানকালে রচিত হয়েছে যেখানে বাস্তবমুখীনতা, অবচেতন মনের ক্রিয়াকলাপ এবং মানস অভীপ্সার প্রবেশ তরঙ্গভঙ্গে চেতনার গহীনে, ভাব সমুদ্রে নরনারীকে ঘুরপাক খাওয়ায়, তাও দেখানো হয়েছে। প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামীর 'কেচা পাতর কপনি' (কচি পাতার কাঁপন) একটি তরুণের আদর্শগত অশান্ত মানসের চিত্র, যে সুন্দরের উপাসক হয়েও তার চাওয়া পাওয়ার তালে বেতালে নিজের জীবনকে লণ্ডভণ্ড করেছে। গোস্বামীর প্রতিভা ও কলাকুশলতা মৌলিকভাবে সৌন্দর্য কেন্দ্রিক এবং সে যেন স্বপ্ন জগতের লেখক। রাধিকামোহন গোস্বামীর 'চাকনইয়া' (গভীর গর্ত) একটি হতাশ যুবকের গল্প যে আজকের যুগের ও সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। তাঁর 'বা-মারলী' (ঘূর্ণি) বর্তমান সভ্যতার ঘূর্ণি-ঝড়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এই কারণেই যে, আমাদের গ্রামীণ জীবনের যুগযুগান্তের ঐতিহ্যবাহী স্তব্ধ শান্ত জীবনবোধকে উৎখাত করে ঐ ঝড়ের মাতামাতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের 'রাজপথে রিঙ্গিয়াই' (রাজ-পথের ডাক) একটি তরুণ বিপ্লবীর জীবনকথা। সে সমাজ জীবনের অসত্য ও অনাচার দূর করতে চায়। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং তাঁর সৃষ্টি মনস্তাত্ত্বিক। তাঁর 'আই' (মা) একটি ছকে ফেলা বিধবা ব্রাহ্মণীর গল্প যাকে রাতদিন কঠিন দারিদ্র্য এবং সামাজিক দায়িত্বহীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়। 'ইয়ারুইঙ্গম' আর একটি অপেক্ষাকৃত ঘোরালো ও বড়ো কাহিনী যা লেখা হয়েছে 'টাংখুল নাগা'দের জীবনী নিয়ে। গল্পের আরম্ভ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানীদের নাগাপাহাড় থেকে পিছিয়ে যাওয়া, এর সঙ্গে নাগা-জীবনের বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা দেখানো হয়েছে নাগা পুরুষ ও নারীদের জীবন্ত চরিত্রে। সৈয়দ আবদুল মালিকের 'রথর চকরি ঘুরে' (রথচক্র ঘোরে) নামক উপন্যাস-প্রবন্ধ আত্মজীবনীমূলক। 'ছবি ঘর' নামে আর একটি উপন্যাসে মালিক মনোবিকলন এবং সামাজিক চেতনার বিশ্লেষণে মনোযোগ দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষানিরীক্ষার চাপে আসল গল্পটিই হয়েছে গতায়ু। 'সূর্যমুখীর স্বন' মালিকের সব থেকে সাম্প্রতিক ও সফল সৃষ্টি।

এইটি একটি রোমান্টিক কাহিনী, তরুণ গুলাস পঞ্চদশবর্ষীয়া তারাকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু তারার মা কাপাহি তাকে প্রতারণা করে। শেষ পর্যন্ত গুলাস মেয়ের বদলে মাকেই বিয়ে করতে ব্যধ্য হয়। কাঞ্চন বরুয়া (ছদ্মনাম) রচিত 'অসীমত ইয়ার হেরোল সীমা' (যার সীমারেখা হারিয়ে গেছে অসীমে) সম্প্রতি প্রকাশিত আর একটি বৃহৎ উপন্যাস। এখানে গ্রন্থকার উত্তর-পুর্ব আসামে ডিহিং নদীর ধারে ১৩০০ বছর আগের কতকগুলি ঘটনাকে, উপন্যাসের মনোরম ভাবপ্রবণ ভাষায় সাজিয়ে গুছিয়ে উদ্দাম ও ভাবরসে গদগদ হয়েছেন। কিন্তু এত যত্ন ও কলা কৌশলে সাজালেও কাহিনীর অবাস্তবতা ও অযৌক্তিকতা গল্পটিকে অবাস্তব, অলীক, অসম্ভব ও বয়স্কদের কাছে এটিকে একটি রূপকথায় পরিণত করেছে।

যতই না নতুন ভাবধারা আসুক বা অন্য ধরনের উপন্যাস লেখার প্রচেষ্টা চলুক, আজও অসমীয়া উপন্যাসে ভাব-প্রবণতা, রসের উচ্ছ্বাস এবং পলায়নপর মনোবৃত্তিই প্রাধান্য পেয়েছে, যার সঙ্গে জীবনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য কম। এই সব উপন্যাসের একদল মুগ্ধ পাঠক পাঠিকা ছিল, সে কথা সত্য, যেমন মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলারা, যাঁরা একটা গতানুগতিক ভালো-না-লাগা সাধারণ গৃহস্থ জীবনের নানা চিন্তা দুর্ভাবনা নিয়েই ক্লিষ্ট থাকতেন। এই সব বই পড়ে তাঁরা তাঁদের চিরাচরিত অভ্যস্ত জীবন থেকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও কল্পনার স্বপ্নি রাজ্যে চলে যেতেন। এই ধরনের উপন্যাসের চাহিদা, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে উঠেছিল এবং তরুণ পাঠক পাঠিকাদের নবারুণদীপ্ত মনের রসমাধুর্যের প্রয়োজন মিটিয়েছিল। তবে একথা উল্লেখ না করলে একটা ভুল ধারণা থেকে যাবে যে এই ধরনের উপন্যাস মোটেই রসোত্তীর্ণ নয়। কয়েকটি পাঠযোগ্য হয়েছিল শুধু গল্প লেখার কলাকুশলতায় নয়, ভাষার সুযোগ্য ব্যবহারেও। প্রেমনারায়ণ দত্তের 'প্রণয়র স্মৃতি' (ভালোবাসার স্রোত), 'নিয়তির নির্মালি' (নিয়তির মালা), শুচিব্রত রায়চৌধুরীর 'বা-মারলি' (ঘূর্ণি) মোটের উপর চলনসই গ্রহণযোগ্য সৃষ্টি। ঠিক সেই কারণে রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলিরও খুব বিক্রি ছিল। গোয়েন্দা কাহিনী বা সেই সম্পর্কিত উপাখ্যানগুলি অসমীয়া সাহিত্যে নতুন। ঐতিহাসিক কারণেই তাদের উন্নতি হয় নি। সেদিন পর্যন্ত আসামে খুব বড়ো শহর ছিল না। অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যাও সীমিত ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং

নানা মানসিকতার লোকসমাগম বেড়ে যাওয়ায়, নানা ধরনের অপরাধও সংঘটিত হতে থাকে এবং দৈনিক পত্রিকাগুলিতে তার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই সব ঘটনাই রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলির প্রেরণা জোগায়। প্রেমনারায়ণের 'পা-ফু' সিরিজ বেশ সুপরিচিত। তবে বেশিরভাগ গোয়েন্দা বা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসগুলির মধ্যে না আছে উদ্‌ভাবনী শক্তি বা সত্যিকার শিল্প শৈলী বা লিখবার প্রতিভা যা অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস্য করে তুলতে পারে। ফলে অসম্ভব কাহিনীগুলি শেষ পর্যন্ত অসম্ভবই থেকে যায়।

পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রধান সাহিত্যিক অবদান হচ্ছে ছোটো গল্প। বহু প্রাচীনকাল থেকেই অসমীয়া সাহিত্যে নানাধরনের গল্প, কাহিনী, পৌরাণিক আখ্যান, হিতোপদেশাবলী, গাথা ও পাঁচালি প্রচলিত। কিন্তু আজকের দিনের ছোটো গল্পের সঙ্গে তাদের প্রভূত প্রভেদ বিষয়বস্তুতে এবং রচনা-কৌশলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আধুনিক ছোটো গল্প লেখার রীতি অসমীয়া সাহিত্যে দানা বাঁধে এবং তার রূপ পরিবর্তন হতে থাকে। ছোটোগল্প রচনা সাহিত্যিক ও সামাজিক মর্যদা পায়। পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিদেশী সুপ্রসিদ্ধ লেখকদের যেমন, চেকভ, মোঁপাসা বা বা সমারসেট্ মম্ প্রভৃতির দৃষ্টান্তে ছোটোগল্প লেখা প্রেরণা পায়। আধুনিক ছোটোগল্পে বাস্তবতা প্রবল। এখানে আমরা জীবনের সমালোচনা পাই। 'অরুণোদয়' পত্রিকায় জীবনে সংঘটিত নানা সংবাদের পরিবেশন ও প্রকাশই হ'ত, কিন্তু সেগুলি ছোটোগল্প নয়। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম ছোটোগল্প লেখক। তিনিই ছোটোগল্প লেখার মধ্যে নতুন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসেন। ঘটনাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি সার্থক ছোটো গল্পের অবতারণা করতেন, এবং তাঁর রীতি ও শৈলী আজও শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। তাঁর মর্মগ্রাহী গল্পগুলি জনগণের জীবনযাত্রার ধারাকে তাদের সমগ্রতায় অর্থাৎ সুখে, দুঃখে, হর্ষে, বিষাদে, বলিষ্ঠতায় দুর্বলতায় প্রত্যক্ষ করিয়েছে। এই গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে, বেজবরুয়া মানবিকতার সঙ্গে স্বাজাত্যবোধের কোনো বিরোধ ঘটান নি, বিশেষ করে অসমীয়া কৃষক জীবনের সঙ্গে, যার বিষয়ে আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রকৃত জ্ঞান ছিল না। তাঁর কতকগুলি গল্প অতি মনোমুগ্ধকর ও কাব্যরসসিঞ্চিত। এই ভাবস্নিগ্ধ রসাশ্রয়ী গল্পগুলি

আজও আমাদের স্মৃতিকে আলোড়িত করে। 'জল-কুয়ঁারী'-তে প্রকৃতির প্রসন্নরূপ আমরা দেখি, আবার 'কন্যা' ও 'রতনমুণ্ডা' গল্প শাণিতরুদ্ররূপ; প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য ও সমবেদনা প্রকাশ পায় তাঁর 'এরাবারি' গল্পে বেশ সজীব ভঙ্গিতে। বেজবরুয়ার গল্পগুলির কেন্দ্র—গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজ এবং সেখানে আমরা তার নানাছন্দের স্পন্দন অনুভব করলেও, নিপীড়িত নির্যাতিত ক্ষুধিতের প্রেতকান্না শুনি না, যার প্রতিধ্বনি আমরা শুনি বর্তমান যুগের লেখক-দের গল্পে। কখনো কখনো তাঁর গল্পগুলির ভঙ্গিতে দুটি বিপরীত রীতির দেখা পাই—দুটি আলোর রেখা যেন এক হয়েছে পথের চৌমাথায়—ব্যঙ্গ ও বৈপরীত্য। কতকগুলি গল্পের পরিধিতে মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, উচ্চাভিলাষ এবং অন্ধ সংস্কারের প্রতি আছে তীব্র বিদ্রূপ ও তথাকথিত শিক্ষিত বা আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণীর প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ। আবার কতকগুলিতে দেখি, তেমনি কশাঘাত সেই সব গ্রামীণ যুবসমাজের দিকে, যারা সব কিছু পশ্চিমী অভ্যাস, বসনভূষণ ও আচারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে উন্মাদের মতো সেই দিকে ছোটে। তিনি অসমীয়া গ্রামীণ জীবনের মৌলিক ধারার সঙ্গে এত সুপরিচিত ছিলেন যে, ঐ গতানুগতিক জীবনের ধারা ও তার সমস্যা নিয়েও অসাধারণ চমৎকার গল্প লিখতে পারতেন। বেজবরুয়ার গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর গল্পের চরিত্রের সহজাত সততা ও আন্তরিকতা। তাঁর গ্রামীণ গল্পগুলিতে জীবনের আশা নিরাশা ভয় আনন্দ দুঃখ লোভ দুর্বলতা করুণা কুসংস্কার আবার গ্রামীণ প্রেমের সরল বিশ্বস্ততা ধরা পড়েছে।

শরৎচন্দ্র গোস্বামী (১৮৮৭-১৯৪৫) আর একজন গল্প লেখক, যিনি সাহিত্যের এই বিভাগে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর দুটি গল্প সংকলন—'গল্পাঞ্জলি' ও 'ময়না'য় আমরা পাই কতকগুলি সুচিন্তিত ও সুগঠিত গল্প, যার মধ্যে শৈল্পিক নৈপুণ্য ও কলাকুশলতা পরিবেশ সৃষ্টি ও চরিত্রচিত্রণে সার্থক হয়ে উঠেছে। এই সব গল্পের বিষয়বস্তু সেই পুরাতন গ্রামীণ মানুষের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, আনন্দ নিরানন্দ, গতিহীন প্রেমের বিবরণ। 'ময়না' গল্প সংকলনে 'বনরিয়া প্রণয়' (উদ্দাম পাশবিক প্রেম) নামক গল্পে একটি মিরি তরুণ ও তরুণীর ভালোবাসার আখ্যান পাই। দুপক্ষেরই বাবা মা'র এই বিয়েতে আপত্তি। তারা যুগলে ঝাঁপ দিল ব্রহ্মপুত্রের উত্তাল তরঙ্গে। সবাই মনে করল যে তারা প্রেমে বিফল-মনোরথ হয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু

ভাগ্যের বিধান অন্যরূপ। তারা জলেই আবাল্য বর্ধিত, সাঁতারে দক্ষ, তারা অন্য এক দূর গ্রামে উঠে সেখানেই থেকে যায় এবং স্বামী-স্ত্রীর মতোই বাস করে। এই গল্পে আমরা সরল মিরি জীবনের একটা সহজ ছবি পাই। 'নদরাম' নামে গল্পটি উপজাতি কাচারীদের জীবনের এক বাস্তব ছবি। কাচারী যুবক নদরাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফরাসীদেশে গিয়েছিল। বহুদিন সে দেশে ফিরে আসে নি। তার অবর্তমানে তার স্ত্রী ঐ গ্রামেরই ভাটিরাম নামে এক যুবককে বিবাহ করে। যুদ্ধের শেষে নদরাম ফিরে এলে এই ব্যাপারটা জটিল আকার ধারণ করে। নদরাম ডেপুটি কমিশনারের কাছে নালিশ জানায় এবং তিনি ভাটিরামকে নদরামের স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেবার আদেশ দেন। নদরাম মকদ্দমায় জিতলেও শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী তার সঙ্গে বাস করতে অস্বীকার করে এবং তাকে বাধ্য করলে সে আত্মহত্যা করবে জানায়। এই কথা শুনে নদরাম স্বেচ্ছায়, হিংসা দ্বেষের বশবর্তী না হয়ে এক মহত্তর প্রেরণায় তার স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের অধিকার ছেড়ে দেয় এবং তাকে তার নির্বাচিত পুরুষের সঙ্গেই বসবাস করতে বলে চলে যায়। আরও কয়েকটি গল্পে আমরা অসামাজিক অবৈধ প্রেমের কাহিনী পড়ি কিন্তু কোথাও গল্পের মধ্যে অমার্জিত রুচির বা ভাববার কথা নেই, কিংবা অবাস্তবতার চিহ্ন পড়ে নি। 'যাত্রী' আর একটি গল্প যেখানে অবৈধ প্রেমের কথা আছে। গদাধর শান্তির প্রেমে মুগ্ধ এবং তাকে সঙ্গিনী করতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামাজিক বাধা নিষেধের ভয় তাকে থামিয়ে রাখে এবং সে পালিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। 'ব্রহ্মপুত্রর বুকত' (ব্রহ্মপুত্রের বুকে) নামক গল্পে দেখা যায় এক বিবাহিতা মহিলা পরপুরুষের সঙ্গে গোপন প্রেমে রত এবং তার সমাজবিরোধী দুঃখ কষ্টে ভরা জীবন শেষ করে ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বুকে ঝাঁপ দিয়ে। বেশ কয়েকটি গল্পে গোস্বামী বালবিধবাদের শোক দুঃখ ভরা জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। তাঁর সংস্কারমুক্ত স্বাধীনচেতা এবং ভাবপ্রবণ মন গভীরভাবে বাস্তববাদী ছিল। গোস্বামী অত্যন্ত শান্ত নিষ্ঠায় তার লোকচরিত্র ও তার স্খলন বর্ণিত করেছেন।

নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (১৮৮১-১৯৪৭) আর একজন গল্পলেখক। তাঁর গল্পে নতুন ধরনের চিন্তার ও চেতনার অবতারণাই শুধু নয়, রচনাভঙ্গিরও স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়।

লক্ষ্মীনাথ ফুকনও (১৮৯৭-১৯৭৫) একজন বিশিষ্ট ছোটো গল্পলেখক। নানা

সময়ে লেখা ছয়টি ছোটো গল্প নিয়ে তাঁর একটি গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়, তার নাম—'ওফাইডাং' (বৃহৎ হট্টগোল)। এই সব গল্পে অতি চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে কয়েকজন আধুনিক শিক্ষিত পুরুষ ও মেয়ের চরিত্র কাহিনী। 'মহিমাময়ী' নামে একটি গল্পে ঐ নামের এক মহিলা, চা-বাগানের এক হেড ক্লার্কের ঘরণী; স্ত্রী বাড়িতে অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিটি পাই পয়সার হিসাব করে খরচ করতেন, কিন্তু তাঁরই একজন অল্প বয়স্ক আত্মীয় তাঁকে দিয়েই কিভাবে ছলে কৌশলে তাঁর এতদিনের কষ্টে জমানো টাকা খরচ করিয়ে দিল, তার একটি মনোরম ছবি দেখিয়েছেন। গল্পটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি পরিবারকে ঘিরে তাদের প্রতিদিনের নানা ঘটনার গল্প। 'টাইপিস্টের জীবন'—মানিক সাইকা নামে এক তরুণের অত্যন্ত দুঃখময় জীবনের কাহিনী। সে সামান্য বেতন পায় এবং অভাবের সংসারে কিছু আয় বাড়ানোর জন্য সে অফিসে বাঁধা সময়ের পরেও কাজ করত। এই অত্যধিক খাটুনি তার দুর্বল রুগ্ন শরীরে সহ্য হল না; রোগাক্রান্ত হয়ে অল্পবয়সেই সে পরলোকগমন করল। আদর্শবাদী কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারীর অকালমৃত্যুতে অফিসের লোকেরা শোকসভা করে গভীর শোকের প্রস্তাব গ্রহণ করে। চা-বাগানের মালিক চৌধুরী ব্রাদার্স কোম্পানি, যাদের অধীনে সে কর্মচারী ছিল তার একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি, তিনশো টাকা খরচ করে করিয়ে, অফিস ঘরে টাঙিয়ে রাখার ব্যবস্থা করল। কিন্তু ঐ টাকার তিনভাগের এক ভাগও সময় মতো পেলে ঐ কর্তব্য-পরায়ণ কর্মচারীর জীবন রক্ষা পেত, অথচ মৃতের সম্মানে এত ঘটা ও আড়ম্বর করা হল। লক্ষ্মীনাথ ফুকন চলিত কথ্যভাষায় ও ভঙ্গিতে লিখতেন বলে তাঁর লেখার আকর্ষণ ছিল। আরও একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল—তাঁর একটা সরস কৌতুক বোধ যাতে তাঁর মনোগ্রাহী ও চিত্তরঞ্জক চিত্রগুলিকে আরও আকর্ষক করে তুলত।

মহীচন্দ্র বরার (১৮৯৪-১৯৪৩) হালকা ধরনে লেখা মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন আলেখ্যগুলি তাঁর যুদ্ধপূর্ব গল্পগুলির মতো ততটা জীবন্ত ও সরস নয়। ঐগুলি 'আহ্বান' নামক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। তবু তাদের সাহিত্যিক গৌরব স্বীকার না করে পারা যায় না। মহী বরার ছোটো গল্পের প্রধান গুণ যে তিনি অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজের যে অংশের আখ্যান লিখেছেন, তারা সাধারণত তাদের অবস্থায় নির্বিরোধী সন্তুষ্ট জনসমাজ, যারা অভাব অনটন

অনশনের মধ্যেও জীবনের দুঃখ কষ্টকে সুস্থ সবল চিত্তে গ্রহণ করতে পারে। ছোটোগল্প লেখায় একজন কৃতী শিল্পী বরার লিখনভঙ্গির পারিপাট্য এবং নগর সুলভ কৌতুকরস লক্ষণীয়। তিনি ঐগুলিকে তাঁর রচনায় ব্যবহার করে লোকচক্ষুর সামনে তাদের অসম্ভাব্যতাকে প্রমাণ করেন। অসমীয়া সাহিত্যে তাঁর গল্পগুলি তুলনাহীন কারণ বিশেষ কয়েকটি ধরনের স্ত্রীপুরুষের চিত্র তিনি উপস্থাপিত করেছেন, যাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের সম্পর্ক শুধু নয়, ভাষার উজ্জ্বলতা, গল্পের শৈল্পিক ধারা, সমাজের চরিত্র চিত্রণে সবই অনবদ্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কল্পনাশক্তির স্রোত যেন বন্যার মতো ছুটেছে এবং পুরাতনী রীতিনীতি, বাধাবন্ধনকে অতিক্রম করে চলমান রঙ্গরসে আপ্লুত করে বহে গেছে।

আর একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছোটোগল্পলেখক হচ্ছেন হলিরাম ডেকা (১৯০০-১৯৪৩) যাঁর লেখায় পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির গভীরতর বিশ্লেষণ ও ব্যঙ্গরস। তাঁর 'অলকালই চিঠি'তে অলকা নামে এক কাল্পনিক মহিলার উদ্দেশে লেখা। এই সব চিঠির মাধ্যমে লেখক একটি পত্র উপন্যাস গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু এই পুস্তকটির গুণ তার গল্পে বা আখ্যানে নয়। বিশ্লেষণধর্মী ক্ষমতায় ডেকার গদ্য লেখন রীতি উচ্চাঙ্গের ও চিন্তাসমৃদ্ধ।

লেখক লক্ষ্মীধর শর্মা অল্প বয়সেই মারা যান। তাঁর ছোটোগল্পগুলি 'আহ্বান' পত্রিকাতে ছড়িয়ে আছে। পাঁচটি গল্পের একটি সংকলন 'ব্যর্থতার দান' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর গল্প 'বিদ্রোহিনী'তে পাই একটি বালবিধবা ললিতার দুঃখের কাহিনী এবং নির্মম সমাজের অনুশাসন ভেঙে সে কিভাবে জীবনকে নতুন করে গড়তে সাহসিনী হল, তারই কাহিনী। এখানে এই নারী অপদার্থ সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে। আর একটি গল্প 'শিরাজ' -এ পাই—সীতা ও অনিলের মধ্যে যে প্রেমের ফুল ধীরে ধীরে ফুটে উঠছিল, তা হঠাৎ ঝরে পড়ল, কারণ অনিল সমাজের চোখ রাঙানির ভয়ে ভীত। সমাজ-পতিরা খবর জোগাড় করেন যে সীতা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর কন্যা নয়। সীতা দুর্বলচিত্ত অনিল কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়। 'লীলা' গল্পটি আধুনিক সভ্যতা ও বিচারহীন সামাজিক ব্যবস্থা ও রীতিনীতির উপর তীব্র কশাঘাত। লক্ষ্মীধর অসমীয়া ছোটো গল্পকে মর্যাদা, বিষয়সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা দান করেছেন।

লক্ষ্মীধর শর্মার গল্পেই সর্বপ্রথম স্ত্রীচরিত্রের আপাতদৃষ্টিতে ক্ষণভঙ্গুর আবেগের ছবি পাওয়া যায়। তাঁর পরবর্তী অনেকেই আধুনিকা স্ত্রী-মনের নানা পরিবর্তনের চিত্র এঁকেছেন। বীণা বরুয়া (১৯১০-১৯৫৪) রমা দাস এবং আরও কয়েকজন এই নতুন অঙ্গিকের গল্পলেখিকা। বীণা বরুয়ার 'পট-পরিবর্তন' কতকগুলি ছোটো গল্পের সংকলন, যার অনেকগুলি গল্প কলেজ ছাত্রীদের অনতি গভীর সদাপরিবর্তনশীল ভাবালু প্রেমের কাহিনী। তিনি গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধেও লিখেছেন এবং তাঁর 'অঘোনীবাই' গ্রন্থে ঐ নামের প্রধান গল্পে যে স্ত্রীচরিত্রকে চিত্রিত করেছেন, তিনি হচ্ছেন এমন একজন অনন্যা মহিলা যিনি নিজের দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগ অনটন অনশন তুচ্ছ করে গ্রামের অন্যদের সাহায্যকারিনী সেবিকা। এই পুস্তকে আমরা গ্রামীণ জীবনের নানা ধরনের নরনারীর সুন্দরভাবে গাঁথা একটি বর্ণাঢ্য চরিতমালা পাই যেগুলি গ্রামজীবনের স্ত্রী ও পুরুষদের আমাদের সামনে নিয়ে আসে অতি সুচারুভাবে। রমা দাসের গল্প লিখন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর অনন্য শিল্প চাতুর্য। তাঁর লেখায় আছে বর্ণনার উজ্জ্বল ছটা, বাক্যালাপের সরসতা, চিন্তার গভীরতা এবং মনের দোদুল্যমান তৎক্ষণিক ভাবগুলিকে ভাষায় রূপান্তরিত করবার অদ্ভুত ক্ষমতা। এইসব গুণগুলিই তাঁর রচিত গল্পগুলিকে অসমীয়া সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছে। তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পই প্রচলিত সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং লেখক সেখানে মনোবিকলনের সূত্রগুলিকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী (১৯০৬—) আর একজন লোকমান্য লেখক যাঁর ছোটোগল্পগুলি বাস্তববাদী। তাঁর দুটি গল্পসংগ্রহ 'অরুণা' ও 'মরীচিকা' যেন জীবনের বৃন্ত থেকে টুকরো করে ছিঁড়ে আনা ফোটাফুল। 'অরুণা' ও 'জয়রাজ' গল্প দুটিতে আমরা এক শক্তিধর লেখকের অন্তরের স্পর্শ পাই। 'রতন' চরিত্রের দুর্ভাগ্য যে তার জনক জননীর মিলনে বিবাহের অনুষ্ঠান হয় নি। সে জারজ ও সমাজ তার প্রতি নৃশংস ব্যবহার করেছে ও ঘৃণার পরিচয় দিয়েছে —লেখকের সহনাভূতিশীল মানসে তারই প্রতিবাদ দেখি। তাঁর আর একটি গল্প—'বিধবা' উল্লেখযোগ্য। বৃদ্ধামাতা ও যুবতী কন্যা দুজনেই পতিহীনা— এই অপরাধেই তাদের উপর সমাজের নির্যাতন অত্যন্ত কঠোর ও মর্মান্তিক রূপে দেখানো হয়েছে। প্রমীলার বৃদ্ধা মায়ের দেহান্তে শবসৎকারের জন্যে

গ্রামবাসীরা কেউই এগিয়ে আসে না, শেষকালে গ্রামের মণ্ডলের যুবক ছেলে, ঝড়জল অগ্রাহ্য করেও তার বাবার মতের বিরুদ্ধে ঐ শবদেহ নিজেই শ্মশানঘাটে বয়ে নিয়ে গিয়ে দাহের ব্যবস্থা করে। তখন তার কুচক্রী বাবা, গ্রামের মোড়ল মশাই ও অন্যদের টনক নড়ে এবং তারা পরে শ্রাদ্ধে যোগ দেন ও নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। 'মরীচিকা'র গল্পগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নানা ঘটনায় সমাজজীবনে যে সব ক্ষয় ও ক্ষতি হয়েছিল তারই উপর লেখা। গোস্বামীর 'জিয়া মান্নুহ' (জীবন্ত মানুষ) একটি ছোটো উপন্যাস, সেখানে সমাজজীবনের মূল্যবোধের ক্রমাবনতির চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে। পরিবর্তিত সমাজ চেতনার কি কি বিষয়ে সংস্কার প্রয়োজন বা নতুন সংযোজন অত্যাবশ্যক তার প্রতিও লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

যে সব ছোটোগল্প রচয়িতারা লক্ষ্মীধর শর্মার পরে লিখতে আরম্ভ করেন তাঁদের উপর ফ্রয়েডের প্রভাব প্রচুর। বহুযুগ থেকে প্রচলিত সামাজিক ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে, বিশেষ করে নরনারীর যৌন-সম্পর্ক সম্বন্ধে নানা প্রতিক্রিয়া উপন্যাস ও ছোটোগল্পের উপজীব্য বিষয় হয়ে ওঠে। এরই ফলে গল্প লেখকরা অবচেতন ও অচেতন মনে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত হন এবং তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রের মনোবিকলনে অনেক সুযোগ খুলে যায়। ছোটো গল্পের লেখকরা তাই অবৈধপ্রেম, যৌন আকর্ষণ ও কামনা বাসনার পরিতৃপ্তির কথাই বেশি করে লিখতেন, শুধু ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে নয়, প্রকাশ্যে—যেন জীবনের রথচক্রে কামবিলাস ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসাধন এমন একটি সাধারণ ঘটনা, যা নিঃসংকোচে প্রকাশ করার মধ্যে কোনো বাধা নেই। তাই এই ধরনের প্রেম ও কামকেলিকৌতুক বর্ণনা করতে তাঁদের একটুও দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না। বরং তাঁরা এই যৌন সম্পর্ককে জীবনের মহৎ প্রেরণা ও বিরাট শক্তির প্রকাশ্য অনুভূতি স্বরূপ বৃহত্তর ধর্মের নামেই বিবৃত করেছেন। তাঁরা নরনারীর এই প্রাথমিক সম্পর্ককে একটা নবতর ব্যাখ্যায় অভিষিক্ত করে বৃহত্তরভাবে ফ্রয়েডিয়ান্ ব্যাখ্যাগুলিকেই সামাজিক, লৌকিক এবং ব্যক্তিগত পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। আজকের ছোটো গল্প মধ্যবিত্ত শ্রমিক ও কৃষকদের সুখদুঃখ নিয়েই ব্যস্ত। নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে ধন বৈষম্য সমান সুযোগের

অভাব এবং তৎসংক্রান্ত সমস্যাগুলি ছোটোগল্পের উপাদান ও উপকরণ জোগায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দেশে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও নৈতিক বিপ্লব ঘটে গেছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে। এই যুগ পরিবর্তনে নানা সমস্যার উদ্ভব হয় এবং সেগুলিই গল্প লেখার পক্ষে সুষ্ঠু উপাদানে পরিণত হয়েছে। পূর্বযুগের সামাজিক অবস্থার তুলনায় দুঃখকষ্ট, অসন্তোষ, অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতি যা শ্রমিক শ্রেণীদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা সহ্য করতে হয়েছে তারই প্রতিক্রিয়া, ক্রোধ এবং প্রতিশোধ নেবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা— এই সবই প্রতিফলিত হতে দেখি ছোটো গল্পে।

সৈয়দ আব্দুল মালিক (১৯০৯-) একজন ছোটো গল্প লেখক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। অধিকাংশ অসমীয়া গল্পলেখক ঔপন্যাসিক স্থিরচিত্তে লেখাকেই জীবন ও জীবিকা করতে পারেন নি, মালেক সাহেব গত কুড়িবছরের বেশি ছোটো গল্প রচনায় নিরত এবং ইদানীং কালের ছোটোগল্পলেখকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা এবং নিরলস লেখনী চালনা তাঁর লিখন রীতির ভঙ্গিকে বিবর্তিত করে তাঁকে শক্তিমান, স্বতন্ত্র এবং পরিণত শিল্পী করে তুলেছে। সাধারণ ভাবপ্রবণ প্রেমের কাহিনী দিয়েই তাঁর গল্প রচনার সূত্রপাত, কিন্তু এখন তিনি মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজচেতনার নানা সূক্ষ্ম স্তরের রূপায়ণ নিয়েও ব্যস্ত। তাঁর গল্পে যৌন আবেদন আছে বিশেষ করে নগরের যুবক যুবতীদের মধ্যে। তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তিনি পটু এবং কৌতূহলের সৃষ্টি করেন, তাতে পাঠক-পাঠিকাদের মনে আরও জানবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে—যেমন একটি পতিত বা পতিতাকে কেন্দ্র করে তিনি গল্প লিখলেন—তাঁর উদ্দেশ্য এই যে এত বড়ো একটা সমস্যার সামাজিক পটভূমিকা কোথায়—কিভাবে ঐ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব তা দেখানো। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে কিভাবে আধুনিক যুবতীদের দুর্বলতা ও লঘুচিত্ততা তাদের নৈতিক মূল্যবোধকে অবনত ও অধঃপতিত করে এবং এই পতনে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, ঘটনা পরম্পরার বিরুদ্ধে তারাই জয়ী হয়েছে। 'শেষ উপকূলার সেলুয়া পার' (প্রত্যন্তভূমির শেষে শেওলা তীরভূমি) 'প্রাণ হেরোয়ার পাচত' (প্রাণ হারাবার পর), 'জোয়ার আরু উপকূল' (প্রবল জোয়ারের স্রোত এবং তটভূমি), এবং 'মরহা পাপড়ি' (শুকনো পাপড়ি), এই সব গল্পগুলি, শেষের নামের সংকলনে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক গল্পেই

স্ত্রীজাতির মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ও মনস্তত্ত্বমূলক অভিমতও আছে। সর্বগ্রাসী প্রেম অসামাজিক হলেও অনেকগুলি গল্পে লেখক তাকে সহানুভূতির সঙ্গেই নিয়েছেন। লেখকের বোধহয় ইচ্ছা ছিল যে প্রেমের প্রচলিত সংজ্ঞাকেই পরিবর্তিত করে তিনি প্রমাণ করবেন যে সতীত্ব বা ব্যক্তিগত শুচিতার প্রশ্নগুলি চিরন্তন নয়, অপরিবর্তনীয়ও নয়, বরং সমাজ, কাল, ও ঘটনাবলির সঙ্গে সম্পৃক্ত সেই বোধ থাকা উচিত। তিনি মনে করেন যে তথাকথিত পতিত বা পতিতাদের মধ্যেও মানবতাবোধ আত্মসম্মানজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হয়তো তাদের পদস্খলন হঠাৎ ঘটে গেছে, জীবনের ভরকেন্দ্রকে বিচলিত করে দুঃখে নিপতিত করেছে। মালিকের কতকগুলি গল্পে ধনী ও নির্ধনের, সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব দেখা যায় এবং মধ্যবিত্তদের মধ্যে অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষিত হয়। 'সিওমরিল' এই ধরনের কাহিনী, যেখানে সমাজব্যবস্থার দুর্বিপাকে অনেক জ্ঞানী ও গুণী মানুষরাও অকালে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয় অন্নের অভাবে। এই যে অন্যায় অর্থনৈতিক দুর্দশা সমাজে প্রচলিত তার বিরুদ্ধে মালিকের ছোটো গল্পের মাধ্যমে এক নতুন শক্তিশালী শৈলী রচিত হয়েছে। তাঁর রচনাগুলি একধরনের অভিনব স্বচ্ছ সুন্দরভাবে রসায়িত এবং তার মধ্যে আছে একটু ভিন্নভাব ও কারুকুশলতা।

দীননাথ শর্মার (১৯১৪—) গল্পগুলি চারটি সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে— 'দুলাল' (১৯৫২), 'অকলশরিয়া' (সঙ্গীহীন, ১৯৫৩), 'কোয়া ভাতুরিয়া ওথর তলত' (মিথ্যা ঠোঁটের ফাঁকে), 'কল্পনা আরু বাস্তব' (কল্পনা ও বাস্তব, ১৯৫৫)। তাঁর বেশিরভাগ গল্প অবৈধ প্রেম সম্পর্কে এবং তার মধ্যে অনেক-গুলিতে স্ত্রীলোকের চরিত্র অত্যন্ত কদর্য ও হীনভাবে আঁকা। একটি গল্প 'ফেটিগোম'-এ (কেউটে সাপ), 'কোয়া ভাতুরিয়া ওথর তলত'-এ সংকলিত, এই ধরনের অনেকগুলি চরিত্র আছে। এই প্রকৃতির স্ত্রীলোকদের জন্যে লেখকের কোনো স্থায়ী সহানুভূতি নেই। অবশ্য কয়েকটি গল্পে তাদের দুঃখ দুর্দশা কষ্ট ভয়ের মধ্যে স্ত্রীলোকের জীবন যেন গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরা এবং তাদের সংগ্রামের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা ; অবশ্য সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশ্লেষণেও প্রয়াস দেখি। এই সংকলনের মধ্যে কতকগুলি গল্প আছে যা জোলা ও মোঁপাসাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সমুদ্রপারের সুদূর সমাজের আভাস এনে দেয়। এইসব গল্পগুলিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্নদেশী নরনারী

প্রেম-বিলাসেরও চিত্র পাওয়া যায়। এইগুলি ছাড়া তাঁর অন্য গল্পগুলির কেন্দ্র নগর ও গ্রামীণ আসামেই। 'কল্পনা আরু বাস্তব' গ্রন্থে কতকগুলি গল্প, যেমন স্ত্রীরত্ন, অসমীয়া পল্লীর সৌন্দর্য বর্ণনায় মুখরিত। দীননাথ শর্মার প্রধান ত্রুটি যে তাঁর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি স্বচ্ছ বা সাবলীল নয়।

হেমেন বরগোহাঞি কবি ও ছোটো গল্প লেখক দুইই। তাঁর গল্পের দুটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে—'বিভিন্ন কোরাস' এবং 'প্রেম আরু মৃত্যুর কারণে' (প্রেম ও মৃত্যুর জন্য)। বরগোহাঞির লেখায় ফ্রয়েডিয়ান নির্জ্ঞান ও অবচেতন মনের প্রভাব দেখি এবং স্বভাবতই তিনি যৌন আবেদন ও অবচেতন সমস্যার খোলা-খুলি আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখায় সংযত শৈলী এবং শব্দের মিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

পদ্ম বরকাকতি তাঁর উপন্যাস এবং ছোটোগল্পগুলিতে সমাজশালীনতার বাধানিষেধ না মেনে প্রকাশ্যভাবেই যৌন সমস্যাকে উপজীব্য করে তুলেছেন। সৌরভ চলিহা আর একজন উদীয়মান লেখক যিনি ক্ষীয়মাণ সমাজের স্ত্রী ও পুরুষদের সম্পর্কে তীব্র ব্যঙ্গে কশাঘাত করেছেন।

ভবেন সইকিয়া, লক্ষ্মীনন্দন বরা এবং মহিমা বরা, এই ত্রয়ী লেখক গ্রামীণ সমাজের উপর গভীর সহানুভূতির সঙ্গে আলোকপাত করেছেন—তাঁরা গ্রামীণ জীবনকে নানা পরিস্থিতির মধ্যে যথাসাধ্য পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছেন।

যুদ্ধোত্তর সাহিত্যে যে পরিবর্তন হয়েছিল তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ছোটোগল্পের বিষয় এবং আঙ্গিকের উপরেও এর প্রভাব পড়েছিল। আধুনিক ব্যস্ত জীবনের যথাযথ সাহিত্যিক বিনোদন ছোটোগল্পের পাঠক এবং লেখক উভয়েরই সংখ্যাধিক্য ঘটাল। স্কুল-কলেজের তরুণ ছাত্রেরাই ছিল ছোটো গল্পের লেখক। তাদের ধারণা ছোটোগল্প রচনা করা কিছু কঠিন কাজ নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ফ্রয়েড, মার্কস প্রভাবিত এই তরুণ লেখকরা চান সাহিত্যিক, নান্দনিক, দার্শনিক, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধগুলি যাচাই করতে। তাঁরা চান এই সব মূল্যবোধগুলি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচিত হোক। সামাজিক ব্যবহার, আভিজাত্য, আচরবিশুদ্ধি এবং নৈতিক আগ্রহ—এগুলির নতুন করে সংজ্ঞা নিরূপিত হোক। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এই সব লেখকরা ডুব দিয়েছেন মানব মনের গভীর অতল অন্ধকারে। দাম্পত্য

সম্পর্কের পোষমানা ভাব ও দুর্বলতা, রোমান্স, নতুনের জন্য উন্মাদনা, অবৈধ প্রণয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, শর্তসাপেক্ষ বিবাহের উত্তেজনা—মনে হয় লেখকদের স্থায়ী আলোচ্য বিষয়। ধনী-দরিদ্র, জমিদার-চাষীর মধ্যে আর্থিক আত্মীয়তা তাঁরা খতিয়ে দেখতে চান এবং বঞ্চিতদের প্রতি আরো ভালো ব্যবহারে পরামর্শ দেন।

ইউরোপীয় ভাবনা ও জিজ্ঞাসার উদার, বাস্তব ধারায় প্রভাবিত এই তরুণ লেখকরাও তাঁদের আঁকা জীবন অথবা জীবনের ঘটনাবলীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চান। তাঁরা ভাবেন, সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে তাঁদের মুক্তি সর্বস্তরেই বাস্তবতা দাবি করে। সে জন্য বিষয়বস্তুর মতো ভাষার ক্ষেত্রেও বাস্তবতা অনুসৃত হয়েছিল। অসুন্দর, অসম্মানকর অথবা অশ্লীল মনে হতে পারে এমন যে সব রচনার বিরুদ্ধে অলিখিত বাধানিষেধ সেগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। এ কথা সত্যি যে যদি কোনো সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও উন্নতি কামনা করতে হয় তবে সেই সাহিত্যকে অন্ধ বিশ্বাসের গভীর ঘুম থেকে মুক্তি দিতে হবে। অন্যদিকে আবার একথাও সত্যি যে শুধু পরিবর্তনের জন্যেই পরিবর্তন, সব সময়ে উন্নতির প্রতীক বা মানদণ্ড নয় এবং সাহিত্যের রীতিনীতি বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা কদাচিৎ সাহিত্য সৃষ্টির উৎকর্ষে বা সৌন্দর্যানুভূতির পরিপূর্ণতাকে প্রকাশ করে।

দশম পরিচ্ছেদ

গদ্য : সাধারণ

আগেই বলা হয়েছে যে বর্তমান অসমীয়া সাহিত্যের অগ্রগতির মূলে আছেন আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের ধর্মযাজকরা ও তাঁদের অসমীয়া সহকর্মীরা। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণভিরাম বরুয়া এবং হেমচন্দ্র বরুয়া ব্যাকরণ রীতিকে সুস্থিত করে দিয়ে অসমীয়া ভাষাকে শিক্ষা বিস্তারের বাহক, সামাজিক সংস্কার এবং ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান আধ্যাত্মচর্চার ধারক করে তোলেন। তাঁদের রচনাবলী ছিল সাহিত্যরসবিবিক্ত দুরূহ প্রবন্ধ এবং সেগুলির মধ্যে সাবলীলতার অভাবও ছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াই প্রথম অসমীয়া লেখক যিনি অসমীয়া গদ্যকে ভাষা ও ভাবের গুরুগম্ভীর বাঁধন থেকে মুক্ত করে চলমান করে তোলেন। নৈর্ব্যক্তিক এবং বিষয়ভিত্তিক লেখার বদলে অসমীয়া ভাষাকে ব্যক্তি ভাবগত ও রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করে তার উন্নতি সাধনে বেজবরুয়ার কৃতিত্ব সামান্য নয়। তিনি অসমীয়া গদ্যরীতিতে নকশা ও হালকা বিষয়ে রচনার ধারা প্রবর্তন করেন এবং যথোপযুক্ত ব্যঙ্গ কৌতুকের প্রয়োগে সামাজিক খারাপ দিক-গুলোর উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যাতে তাদের প্রতিকারের ব্যবস্থা ভবিষ্যতে করা যায়। ব্রিটিশ লেখক চেষ্টারটন-এর মতো তিনি প্রবন্ধ ও ছোটোগল্পের মাঝামাঝি একধরনের মধ্যপথ বা রম্যরচনা আবিষ্কার করেন, যা গুরুগম্ভীর নয়, রসসমৃদ্ধ লঘু মনোহারিত্ব প্রদান করে। ফলে জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাগুলিও হাস্যরসের বা কৌতুকের উপাদান জোগায় ও সাহিত্যের উপকরণ সৃষ্টি করে। বেজবরুয়া তাঁর লেখায় ও রম্যরচনায় ইংলণ্ডের রক্ষণশীল টোরি দলের স্যার রজার ডি কভারলীর অনুকরণে কৃপাবর বেজবরুয়া নামে একটি চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন এবং অসমীয়া জীবনের অসামাজিক দিকগুলির উপর দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগের জন্যে ঐ চরিত্রটিকে ব্যঙ্গ করে অসমীয়া জীবনের রীতিনীতির, মিথ্যা ভুলের গ্লানি ও দোষত্রুটিগুলির ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর চমৎকার প্রসাদ-গুণসম্পন্ন রচনা—'বরবরুয়ার ভাবর বুড়বুড়ানি' (বরবরুয়ার চিন্তার বুদ্বুদ) আসামে খুবই পরিচিত। সেখানে সমকালীন অন্তঃসারহীন মানুষ ও প্রতিষ্ঠান-

গুলিকে নিয়ে নানা ধরনের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও হাসিঠাট্টার মধ্যে সমাজজীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে ঐ কথোপকথন ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যায় নি এবং সংযত ভাবেই রচিত। সমকালীন জীবনে যে নানা অসংগতি ছিল এবং ঐগুলি যে জাতীয় স্তরে নানা সমস্যার উৎপত্তির কারণ তা তিনি হাসিঠাট্টার মধ্যেই দেখিয়েছেন, সেজন্যে এই সব লেখাগুলি আজও আগ্রহের সঙ্গে লোকে পড়ে, কারণ এগুলি রসিকরঞ্জনকারী ও হৃদয়-গ্রাহী। আমরা যখন সেগুলি পড়ি তখন তা আমাদের শুধু আনন্দই দেয় না, জ্ঞানও বাড়ায় এবং লোকচরিত্র বুঝতে সাহায্য করে। কিন্তু তাঁর রচনাগুলি একেবারে দোষত্রুটিহীনও নয়— মঁতেই-এর মতো ছাড়াছাড়া ও বিক্ষিপ্তভাবে লেখা।

সত্যনাথ বরা (১৮৬০-১৯২৫) আর একজন বিশিষ্ট গদ্যলেখক। তিনি সমসাময়িক সমাজের ছোটো ছোটো অহমিকা ও সামাজিক অসার্থকতা এবং অসংগতির উপাদানগুলি কৌতুক রসে ডুবিয়ে ব্যঙ্গচিত্রে রূপ দেন। তাঁর 'কেন্দ্র সভা' নামে সংকলনটি সেইগুলির সমষ্টি। তাঁর গদ্যলেখার রীতির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় 'সারথি', 'চিন্তাকলি' ও 'সাহিত্য বিচার' নামে বইগুলিতে। ঐ তিনটি বইয়ে তাঁর নিবন্ধগুলি শুধু চিত্তাকর্ষকই নয়, চিন্তাকর্ষকও। তা ছাড়া ঐগুলি ঘননিবদ্ধ ও জাতিধর্মনির্বিশেষের জন্যেই লেখা। 'মহাবিশ্ব' 'জীবনের উদ্দেশ্য', 'কর্তব্য', 'দৃঢ়তা' 'চরিত্র', 'ধনের ব্যবহার' প্রভৃতি কতকগুলি প্রবন্ধে সাহিত্যকে উন্নয়ন, শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণের সোপান হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। "জ্ঞানলাভই মনের অন্ধকারকে দূরীভূত করে", "চিন্তাই মানসিক হজমের যন্ত্র", "প্রকৃত উন্নতির পথে বাধা হচ্ছে কুসংস্কার", "পুস্তকাবলীর সম্পদ হচ্ছে সঞ্চিত স্বর্ণের মতো", "এই বসুন্ধরা নিছক জলধারার স্রোত", "দীর্ঘসূত্রিতায় সুযোগ হারায়", "কর্মে ক্রমাগত অভিনিবেশই কর্মকে করে সহজ, যেমন স্বর্ণ গলে যায় অ্যাসিডে", এই ধরনের বেকনের মতো সমান্তরাল ভাবে গাঁথা বাক্যযোজনা তাৎক্ষণিক বিচার বিমুক্ত। এই সব রচনার মাধ্যমে সত্যনাথ বরা ভাষাকে একটা নিজস্ব স্বরূপ দেন, নতুন ব্যাকরণ ও প্রয়োগনীতি প্রবর্তন করেন এবং অসমীয়া প্রবন্ধে নতুন ঘননিবদ্ধ অথচ রক্তবাহী শিরা উপশিরার মতো গতিশীল ছন্দ ও ভাবগভীর দার্শনিক ভঙ্গিও প্রদান করেন।

কালীরাম মেধী আজীবন সাহিত্যসেবায় আত্মোৎসর্গ করেছেন। কতকগুলি পুরাতনী অসমীয়া পুঁথি আধুনিকভাবে সম্পাদন করার কৃতিত্ব তাঁর। অসমীয়া

ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটা তুলনামূলক পুস্তকও তিনি রচনা করেন। তিনি প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধেও বহু নিবন্ধ লিখেছেন। শান্ত গদ্য-রীতির নায়ক কালীরাম, সত্যনাথ বরাকে স্মরণ করিয়ে দেন।

সত্যনাথ বরার সহধর্মী আর একজন লেখক ছিলেন—পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া, যাঁর কাব্য ও নাটকের কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। বেজবরুয়ার মতো তিনিও 'উষা' এবং 'অসম বন্তী' (আসামের আলোক) এই দুই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের একজন। বিংশশতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে এই দুটি পত্রিকাই অসমীয়া সাহিত্যের উজ্জীবনের ইতিহাসে অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্ব জোগায়। গোঁহাঞি বরুয়া নিজে এই দুটি পত্রিকায় বহু বিষয়ে বহু ধরনের প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি স্কুলপাঠ্য কতকগুলি বইও সংকলন করেন। যদিও সেগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নেই, তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে সেগুলির সাহায্যে অসমীয়া ভাষায় একটি স্বচ্ছন্দ সরল গতির সজীব গদ্য-রীতির অনুশীলন আরম্ভ হয়, যাতে একজন তরুণকে সৃষ্টিশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। কিন্তু গদ্যলেখক হিসেবে গোহাঞি বরুয়ার মহত্ত্ব—তাঁর তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থ 'শ্রী কৃষ্ণ'। এই পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণচরিত্রের প্রভাব যথেষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে পৌরাণিক গল্পের জটিল জাল থেকে উদ্ধার করে বিচারসহ বোধগম্য মানবিক মহিমার তুঙ্গে তিনি স্থাপন করেছেন। এই প্রথম অসমীয়া সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের উপরে একটি আদর্শ মানবোচিত বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্লেষণেরও ঐতিহাসিক সূচনা হয়। লেখক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়েছেন শুধু ভগবান বলেই নয়, তিনি একজন সফল কর্মী—পুরুষোত্তম।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য আর একজন শক্তিশালী লেখক যাঁর ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলিতে এক যুক্তিগ্রাহ্য মনন ও আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। কমলাকান্ত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি একেশ্বরবাদী ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মত, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি উদার ছিল। ধর্মযোদ্ধার মন নিয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধ সংকলন 'গুটিদিয়েক চিন্তার ঢেউ'তে উল্লেখযোগ্য তাঁর বিশ্লেষণী শক্তি, বিতর্ক ও সমালোচকসুলভ মতামত। কমলাকান্তের শিক্ষামূলক প্রবন্ধাবলীতে পাওয়া যায় সামাজিক ন্যায় বিচারবোধ এবং পুরোহিতশ্রেণীর অন্যায় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ। তিনি ক্ষয়ে যাওয়া পুরানো প্রথাগুলিকে ধরে থাকার

বিরুদ্ধেও তাঁর জোরালো বিষাণ বাজিয়েছেন। যুক্তিহীন আচার আচরণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল আক্রোশ। তিনি অনড় হিন্দুসমাজকে প্রতীচ্যের কাছে শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করে সচল হবার উপদেশ দেন। সত্যধর্মের প্রতি তাঁর ছিল উদার মনোভাব, তিনি বিধবা বিবাহ সমর্থন করতেন এবং এই ধরনের সমাজ সংস্কার তাঁর সমর্থন লাভ করেছিল। তাঁর বই 'অষ্টাবক্রের আত্মজীবনী'তে তিনি উপনিষদ, গীতা বা অন্য ধর্মগ্রন্থকে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও মতানুসারেই গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ভাষ্য ও ব্যাখ্যা আধুনিককালের চিন্তাধারার সঙ্গে সংগতি রেখে চলেছে ও সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য।

অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর গদ্য রচনাগুলির বেশির ভাগই অধুনালুপ্ত 'চেতনা' নামে একটি পত্রিকায় ও 'ডেকা অসম' (নবীন আসাম) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি ঐ দুটির সম্পাদকও ছিলেন। কতকগুলি রচনা 'আহুতি' নামে একটি পুস্তকে সংকলিত হয়। সেগুলি সমসাময়িক ঘটনার এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা, বিশেষ করে আসামের সমস্যা নিয়ে লেখা এবং ঐগুলির মধ্যে পাওয়া যায় অসমীয়া জনগণ ও তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর ভালোবাসার পরিচয়। তাঁর লেখার ভঙ্গি তাঁরই নিজস্ব এবং উদ্দীপক। এর মাধুর্য যেন একটা গভীর মহিমান্বিত দীর্ঘ স্বরের ছন্দে বর্ণিত— যেন একটা অর্গান বাজছে ঝংকারে ঝংকারে। তাঁর ভাষার ভঙ্গি শুধু উত্তেজনাপূর্ণ নয়, তার গতি যেন লাফিয়ে চলা, সাপের হিস্ হিস্ শব্দের মতো তীব্র ও তীক্ষ্ণ অথচ তাঁর কথা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে আছে সরলতা আত্মবিশ্বাস এবং সত্যনিষ্ঠা। তাঁর ভাষা অনেক সময় ভাব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে অপারগ হওয়ায় কোনো কোনো লেখা অস্পষ্ট ও ঘোলাটে হয়েছে। রায়চৌধুরী সত্তর বছর পার হয়ে গেলেও চিন্তার সজীবতায় এবং আগ্রহের আতিশয্যে যে কোনো তরুণকে পরাজিত করতে সক্ষম।

জগন্নাথ বরা সমসাময়িক আর একজন চিন্তাশীল লেখক যিনি সামাজিক ও সাহিত্যিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন। তাঁর লেখার গুণ হচ্ছে যে তিনি সব জিনিস বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চান এবং তাঁর গদ্যভাষার মধ্যে চিন্তার গভীরতা ও ভাষার স্পষ্টতা আছে, আর আছে দ্রুততালের ছন্দ ও বাক্য বিন্যাসের ঘটা।

হেমচন্দ্র গোস্বামী (১৮৭২-১৯২৮) মানসিক গঠনে একজন পুরাতত্ত্ববিদ ও

ইতিহাসবেত্তা ছিলেন। তবুও তাঁর যৌবনে একটি কবিতার বই প্রকাশিত করেন—'ফুলর ঝাকি' (ফুলের সাজি)। পরে তিনি ইতিকথার ভক্ত হয়ে পড়েন এবং সেই অদম্য আকর্ষণের ডাকে আহোম যুগের বহু কাহিনীর উপাদান জোগাড় করেন। তিনি 'পুরণি অসম-বুরুঞ্জী' নামে একটি চমৎকার ইতিহাস-পঞ্জি এবং 'দরং রাজ-বংশাবলী' নামে সূর্যখরী দৈবজ্ঞ লিখিত কোচ নৃপতিদের এক বিচিত্র ইতিহাস মালিকা সম্পাদন করেন। কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ এবং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত—অসমীয়া সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সংকলন—'টিপিক্যাল সিলেকশন্স্ ফ্রম আসামীজ-লিটারেচার'। এই সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞে গোস্বামী বহু জানা অজানা লেখকদের নির্বাচিত পঙক্তি উদ্ধৃত করে তাঁর পুস্তকে সংযোজিত করেছেন এবং এইভাবে অবলুপ্তি থেকে তাদের রক্ষা করেছেন। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় প্রকাশিত ভূমিকা ও বিবরণ সংবলিত অসমীয়া হাতে লেখা পুঁথি সংগ্রহের তালিকা—(A Descriptive Catalogue of Assamese Manuscripts) যেটি অসমীয়া সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের গবেষণার বা জিজ্ঞাসুদের জন্যে অপরিহার্য। গোস্বামী মশায় বৈষ্ণবযুগের অবিস্মরণীয় কবি ভট্টদেবের 'কথা-গীতা'ও বৈজ্ঞানিকভাবে সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে নানা পত্রপত্রিকায় তিনি আসামের প্রাচীন পরিচয় সম্বন্ধে পুরাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ইতিহাসাশ্রয়ী তথ্যমূলক নানা-ধরনের প্রবন্ধ লিখতেন ও সমালোচনা করতেন। এই সব প্রবন্ধে আছে নতুন তত্ত্ব, শুধু ঐতিহাসিক তথ্য নয়, নৃতাত্ত্বিক তত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি ও কঠিন ভাবে বিচার বিবেচনা—সেখানে তাঁর পদ্যলেখার ভাবালুতা বা হর্ষোচ্ছ্বাস নেই, স্বপ্নদর্শনের ছবিও নেই। এইসব প্রবন্ধে আছে নৃতত্ত্বের দৃঢ়সংবদ্ধতা এবং বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং ঘন সংবদ্ধ মন। স্থির মস্তিষ্কে কার্য কারণ নির্ণয়, বিচার বিশ্লেষণ, ঋজুভাষা, সঠিক এবং মর্মভেদী শব্দ চয়ন গুরুগম্ভীর রচনার উপযুক্ত করেছে। বর্তমান অসমীয়া গদ্যে এক নতুন ধরনের সঠিক অর্থবহ উপযোগিতার জন্য শব্দচয়ন, গোস্বামীর বিশেষ অবদান।

সাধারণ জ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে নিজেদের দেশ ও দশের বিষয়ে জানবার ইচ্ছাও বাড়ে। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই গবেষণামূলক পঠন পাঠনের বৃদ্ধি ঘটে এবং অসমীয়া ইতিহাসের নানা উপাদান ও উপকরণ আবিষ্কৃত হতে

থাকে। বিগত অল্প সময় সীমার মধ্যে ইতিহাসের লেখকদের মধ্যে বহু নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে আছেন বাণীকান্ত কাকতি, সূর্যকুমার ভুঁইয়া, সোনারাম চৌধুরী, সর্বেশ্বর কাকতি, কালীরাম মেধী, বেণুধর শর্মা এবং আরও অনেকে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই ভুঁইয়া অসমীয়া ইতিহাসের গবেষণায় কৃতী ছিলেন এবং এই কাজে শীর্ষে উঠেছিলেন। তিনি নিয়মিত ভাবে আহোম সময়ের ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিভাগের পক্ষ থেকে সেগুলি ব্যবস্থা করেন। সূর্যকুমার ভুঁইয়া (১৮৯৪-১৯৪৩) আত্মজৈবনিক কবি এবং গল্পলেখকও। তাঁর কবিতা 'আপোন স্থর'-এ ('নির্মালি' সংকলনে সংগৃহীত) কবির আকৃতি কাল ও সীমা পার হয়ে অসীমের সঙ্গে মিলতে চায়। সেই অধরাকে পাওয়া যায় না বলেই রোমান্টিক কবিদের মন কাঁদে এবং কার্লাইলের মতে সেই তো মহত্ত্বের চিহ্ন। যদিও তিনি মানুষের সুখদুঃখ নিয়ে অনেক লিখেছেন, কবি মনে করেন তিনি তাঁর আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং তাঁর কবিত্ব বা ভাষা সেই অনধিগম্যকে ধরতে পারে নি।

সূর্যকুমার কিন্তু ঐতিহাসিক লেখার জন্যেই সবিশেষ পরিচিত, আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা সময়ে লিখিত তাঁর বিবিধ প্রবন্ধাবলী 'আহোমর দিন' নামে গ্রন্থে সংগৃহীত। এ ছাড়া আছে 'অসম জিয়ারী' (আসাম কন্যারা)। 'বুরুঞ্জীর বাণী', 'মীরজুমলার অসম আক্রমণ', 'কুঁয়ার বিদ্রোহ' (আহোম রাজকুমারের বিদ্রোহ) গ্রন্থে তিনি সেই যুগের ইতিহাসের নানা গুজব থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনাকে তুলে ধরে তাদের নাটকীয় ভঙ্গিতে উত্তেজনামূলক কাহিনীতে পরিবর্তিত করেছেন। সূর্যকুমারের বহু প্রবন্ধ থেকে মালমশলা নিয়ে অন্য লেখকরা বহু কাব্য ও নাটক লেখবার উপকরণ জোগাড় করেছেন ও উৎসাহ পেয়েছেন। ভুঁইয়া সারাজীবন ঐতিহাসিক গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন এবং আসাম ইতিহাসের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অনুসন্ধান পদ্ধতি পাশ্চাত্য ধারার অনুকরণে মতনিরপেক্ষ বিচারসহ বিশ্লেষণ এবং বিষয়ভিত্তিক। আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনি ইতিহাস রচনাকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাবে, সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন, সেইজন্যে রাজামহারাজা রাষ্ট্রনায়ক সাধুসন্ত মহাপুরুষদের বিষয়ই তাঁর রচনার সামগ্রী নয়, তিনি দেশের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ধর্মের ইতিহাসের সাহায্যে যুগের ইতিকথাকে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর গবেষণার ও আলোচনার মধ্য দিয়ে

আমরা আহোম যুগের একটা সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক বিবরণও পাই। তাঁর সাহিত্যিক লিখনভঙ্গি সহজ ও সরল, বুরুঞ্জীভঙ্গির অনুকরণে লেখা। ভুঁইয়া তাঁর ঐতিহাসিক রচনায় বহু পুরানো শব্দকে পুনরুদ্ধার করে সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন। তিনি আসামের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর আনন্দরাম বরুয়ার একটি জীবনী লিখেছেন যা সবদিক থেকেই আধুনিক। সাহিত্যের জীবনী বিভাগে এই উচ্চমানের বইটির একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। জীবনী লেখার উপকরণ ও উপাদান থেকে কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে তার একটা সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পরিচয়ের নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন।

হেমচন্দ্র গোস্বামী ও সূর্যকুমার ভুঁইয়ার প্রবর্তিত এই ঐতিহ্য ক্রমেই বিকাশ লাভ করে নতুন গবেষক ও শিষ্যদের মধ্যে আসামের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস লেখার প্রেরণা দিয়েছে। এদের মধ্যে বেণুধর শর্মাই সবচেয়ে কৃতী অনুসন্ধিৎসু। 'দূরবীণ' গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলি তাঁর ঐতিহাসিক চেতনার, মূল উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহপ্রিয়তার পরিচয় দেয়। এই সব আকর গ্রন্থগুলির পুনর্সম্পাদনা ও সেই সব পুস্তক থেকে গৃহীত বক্তব্যগুলি শুধু আহোম রাজন্যবর্গ, সেনাপতি বা রাজকুমারীদের বিষয় জানাতেই সাহায্য করেনি, তাদের আরও মনোরম ও চিত্তাকর্ষক করেছে। তিনি আসামের প্রথম বিপ্লবী মণিরাম দেওয়ানেরও একটি চমৎকার জীবনী লিখেছেন। এই মানুষটিই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এখানেও শর্মার ঐতিহাসিক কল্পনা প্রবল থাকায় বিপ্লবীর ও দেশপ্রেমিকদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। তদুপরি যে যুগে মণিরাম দেওয়ান বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলেন, ডাক দিয়েছিলেন দেশবাসীকে বীরপ্রতিম প্রাণোৎসর্গে—সেই যুগটিকে কল্পনা করে নিতে কষ্ট হয় না। এই শক্তিধর লেখকের গদ্যরীতি প্রাণচঞ্চল এবং তার মধ্যে একটা গতি, ব্যক্তিত্ব ও শক্তির সঞ্চার করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন।

এই নানাধরনের গদ্যলিখন রীতির সঙ্গে আর এক ধরনের সাহিত্যও সৃষ্টি হয়েছিল যাকে আমরা আজ সমালোচনা সাহিত্য বলি। অসমীয়া সাহিত্যে এই ধরনের আলোচনা প্রায় বিরলই ছিল। এর প্রথম ক্ষীণ সূচনা 'অরুণোদয়' পত্রিকায় এবং পরে অন্য পত্রিকাতেও। প্রতীচ্যের ধরনে সাহিত্যিক বিচার তখনও অনাগত। কিন্তু সর্বপ্রথম সমালোচনা সাহিত্য বলতে শুধু লেখকের

নামধাম ও গুণাগুণ বিচারের একটি দীর্ঘ তালিকা বিবেচিত হত। এই বিষয়ে প্রথম স্মরণীয় সাহিত্যকর্ম—লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সংযত ও সংহত ভাবে জীবনী-মূলক রচনা 'শংকরদেব'। এই পুস্তকে শংকরদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব সাহিত্যের যেমন সবিশেষ পরিচয় আছে, তেমনি আছে ঐ লেখাগুলির সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয় ও তাঁর মূল্যবান উপদেশাবলীর সংকলন।

বাণীকান্ত কাকতি (১৮৯৪-১৯৫২) আর একজন একনিষ্ঠ সাহিত্য সেবক যিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে অসমীয়া সাহিত্যের একটা মৌলিক বিশ্লেষণ এবং অবদানের কথা লিপিবদ্ধ করবার সময় এসেছে এবং তা করা উচিত। 'চেতনা' নামে পত্রিকাতে তাঁর প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য সম্বন্ধে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়। তিনি তৎকালীন আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনা সম্বন্ধেও অনুসন্ধান ও আলোচনা আরম্ভ করেন। কাকতি শুধু একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকই ছিলেন না, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেও তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁর স্মরণীয় পুস্তক 'আসাম —সৃষ্টি ও উন্নয়ন' (Assam its formation and development) — তাঁর গভীর রসজ্ঞান ও প্রতিভার পরিচায়ক। এই পুস্তকটি সমকালীন যুগের একমাত্র গ্রন্থ—যেখানে অসমীয়া ভাষা ও ব্যাকরণের উৎপত্তি আলোচিত হয়েছে এবং এটিকে একটি আকর গ্রন্থ হিসাবে সুধীমাত্রেই স্বীকার করেন। কাকতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুদিকের জ্ঞানভাণ্ডারেই সমৃদ্ধ হওয়ায়, তাঁর সাহিত্যবিষয়ক মন্তব্য ও আলোচনাগুলি শুধু গৌরবে ও সৌরভেই পূর্ণ নয়, যুক্তিসহ লোকচিত্তাকর্ষকও বটে। কাকতির প্রবন্ধগুলি প্রাচীন অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সবচেয়ে মূল্যবান, কারণ কাকতির আলোচনা শুধু ভাষাবিদের আলোচনা বা অনুসন্ধান নয়—তিনি সেই ভাষার রূপ ও ঐশ্বর্যের দিকেও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন ও তার সুচিন্তিত, সুমার্জিত ও সুগঠিত দিকগুলিও দেখিয়েছেন। তিনি তখনকার সামাজিক, ধর্মবিষয়ের ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে ও তাদের স্রষ্টাদের লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য হল তিনি যে যুগের কথা লিপিবদ্ধ করছেন, সেই যুগের সত্য মর্মটিকেও উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন, যাতে যুগধর্ম ও রীতি পরিস্ফুট হয়। একটা জাতি, একটা যুগ ও তখনকার সমস্যার পরীক্ষা নিরীক্ষার স্বরূপ ও মূল্য সকলের সামনে তুলে ধরার আগ্রহ তাঁর ছিল। তাঁর দ্বিতীয় দফায় প্রতীচ্যের রচনাগুলি—বর্তমান অসমীয়া কবিদের কাব্যালোচনা-ধারায়

তুলনামূলক আলোচনা পশ্চিমী সাহিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বহু সাহিত্যের পড়াশোনা তাঁকে এ বিষয়ে জ্ঞানী করেছিল এবং তিনি তার সদ্‌ব্যবহার ও তুলনামূলক বিচারে বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেছিলেন, এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই আলোচনা যেমন ব্যঙ্গকৌতুকে ভরা তেমনি গভীর ও ভিতরের রহস্য তুলে ধরতে ব্যস্ত এবং এর ফলে অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের এক অনির্ণীত বিভাগকে—অর্থাৎ সমালোচনা সাহিত্যকে—তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর দান কিন্তু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। অসমীয়া বৈষ্ণববাদ সম্বন্ধে তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি যা 'বিজুলী' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়, তাঁকে একজন প্রথমশ্রেণীর বিশ্লেষণমূলক আলোচক বলেও প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর বিদ্যাবত্তা ও তীক্ষ্ণ তথ্যমূলক বিচারের ক্ষমতা এবং প্রতিপক্ষকে আঘাত করবার যুক্তিসহতা তাঁকে একজন বিশিষ্ট গুণী সমালোচকের পদে বরণ করেছিল। তাঁর হাতে অসমীয়া গদ্য, গভীর চিন্তা ও সূক্ষ্ম চেতনার বহিঃপ্রকাশের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ডিম্বেশ্বর নেওগ (১৮৯৯-১৯৪৩) অসমীয়া সাহিত্যের পুরানো ও নতুন কয়েকটি ইতিকথা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পুস্তকগুলি থেকে বহু মূল্যবান তথ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া ও জানা যায়। তাঁর বই 'অসমীয়া সাহিত্যর জিলিঙিনি'তে (অসমীয়া সাহিত্যের কিছু দৃশ্য) যে সব আলোচনা আছে, সেগুলি লেখকদের রসসৃষ্টি ও শিল্পদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে। সমালোচনার চেয়ে রচয়িতাদের মন্তব্যই বেশি আলোচিত হয়েছে।

প্রকৃত সাহিত্য সমালোচনার গ্রন্থ হিসেবে সত্যনাথ বরার 'সাহিত্য বিচার' গ্রন্থটিকেও প্রাধান্য দেওয়া যায়, তিনি ভারতীয় ও ইংরেজি দুই ধরনের সমালোচনা রীতিপ্রকৃতির ও বিচার বিশ্লেষণের পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। নীলমণি ফুকনের 'সাহিত্য কলা' তাঁর নিজের প্রবর্তিত রীতিনীতি অনুসারেই লেখা এবং তাঁর এই বৈশিষ্ট্য কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে তাঁর রীতি অভিনব এবং পূর্বধারা থেকে পৃথক। বিরিঞ্চিকুমার বরুয়ার 'কাব্য আরু অভিজ্ঞানা' এই ধরনের আর একটি বিশিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য ও স্বীকৃত সমালোচনা সাহিত্য রীতির বই যেখানে তিনি ইতালীয়ান লেখক বেনোডিটো ক্রোচে, হিন্দী লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ এবং আরও কয়েকজন ইংরেজি, হিন্দী ও বাঙালী লেখকদের অনুসরণে একটি সুষ্ঠু নিয়মনিষ্ঠ রীতির প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিল্পের

দার্শনিক ভিত্তি এবং তার পশ্চাৎপট ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন উমাকান্ত শর্মা 'কাব্যভূমি'তে। বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক হাডসনের মতো ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী সর্বজনবোধ্য সহজ সরল ভাষায় সাহিত্যের আলোচনা করেছেন 'সাহিত্য আরু সমালোচনা' গ্রন্থে। হেম বরুয়ার 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থটির বিশেষত্ব এই যে তিনি অসমীয়া সাহিত্যের নানা বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের সমার্থক ও সমগুণবিশিষ্ট রচনাগুলির তুলনা-মূলক সমালোচনা করেছেন আধুনিক ধারা অনুযায়ী। এই পুস্তকটি তাঁর ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয় ও অনুরাগের সাক্ষ্য দেয়। হেম বরুয়ার 'সম্মিহলী' (সংমিশ্রিত) গ্রন্থটি নানা বিষয়ের উপর নানা সময়ে লেখা রচনাবলীর সংকলন। এখানে মিশরের ইতিহাস থেকে আইনস্টাইনের বিজ্ঞান-চর্চা, মুক্ত অঙ্গনে অভিনয় ও স্ত্রীজাতির সৌন্দর্যের আলাপ আলোচনা আছে; যদিও এই সব লেখাগুলি শুধু গুরুগম্ভীর ও নিজেদেরই মতামত দিয়ে এমন ঘোরালো যে অনেক সময় পাঠক-পাঠিকাদের পড়বার ইচ্ছা কমে যায়। তাঁর ভ্রমণকাহিনীগুলি কিন্তু হালকা চালে লেখা ও সরস এবং সেজন্যেই সহজপাঠ্য। তাঁর 'সাগর দেখিছা' (সমুদ্র দেখেছো?) এবং 'রঙা করবীর ফুল' আমেরিকা ও রাশিয়া ভ্রমণের অপূর্ব কাহিনী। সেগুলি এমন এক পর্যটকের লেখা যিনি দুই চোখ ভরে ঐ দুই দেশ, তার অধিবাসীদের ও তাদের আচার ব্যবহার মনোযোগ দিয়ে শুধু দেখেননি, সাহিত্যিক নিয়মে উপযুক্ত ভাষায় লিখেওছেন। অতুলচন্দ্র বরুয়ার 'সাহিত্যর রূপরেখা' অসমীয়া সাহিত্য, তার নানা ধারা, গতি ও বিভাগের একটি সুষ্ঠু উপক্রমণিকা।

বর্তমান যুগ, বিশেষ করে স্বাধীনতালাভের পর অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সবিশেষ জানবার ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রবল হয়েছে, কারণ অনেকেই মনে করেন যে এটা একটা গুরুতর জাতীয় কর্তব্য এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের যেটুকু গ্রহণযোগ্য তাকে সর্বসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়া উচিত। উপেন্দ্র চন্দ্র লেখরু তাঁর 'অসমীয়া রামায়ণী সাহিত্য' নামের গ্রন্থে আধুনিক রীতিনীতি অনুসারে মাধব কন্দলীর 'রামায়ণ'-এর সমালোচনা করেছেন। এবং রামায়ণী সাহিত্যের ভাষা, শিল্পরীতি, গল্পলেখার নীতি, বিষয়বস্তু প্রভৃতির গবেষণা ও আলোচনা করেছেন। বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া 'অসমীয়া কথা সাহিত্য' নামে পুস্তকে অসমীয়া গদ্যভাষার উৎপত্তি, বিবরণ ও বিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন।

বরুয়ার 'অসমীয়া ভাষা আরু সংস্কৃতি' (অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতি) কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধের সমষ্টি, যেগুলিতে লেখক অসমীয়া জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, যা অন্য লেখকরা আলোচনা করেন নি। বরুয়া কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য পুস্তকও সম্পাদন করেছেন, যেমন 'অঙ্কিয়া নাট', 'মহামোহ কাব্য' এবং 'শ্রী রাম আটা আরু রমানন্দর গীত'। এই সব পুস্তকের ভূমিকায় তিনি সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই প্রাচীন অসমীয়া পুস্তকগুলির বৈশিষ্ট্য, রূপ, ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়ে সুনিষ্ঠ মন্তব্য করেছেন। হরিনারায়ণ দত্ত বরুয়া, মহেশ্বর নেওগ এবং সত্যেন্দ্রনাথ শর্মাও কতগুলি প্রাচীন গ্রন্থ আধুনিক বৈজ্ঞানিকরীতিতে সম্পাদন করেছেন এবং প্রভূত নতুন আলোকসম্পাত করেছেন। নেওগের 'পুরানী অসমীয়া সমাজ আরু সংস্কৃতি', 'অসমীয়া গীতি কাব্য' এবং 'অসমীয়া প্রেমগাথা' প্রবন্ধগুলিতে অসমীয়া সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনা পাই ও লেখকের সুচিন্তিত মন্তব্য দেখি। তাঁদের লেখার মাধ্যমে এই সব কৃতবিদ্য গুণী লেখকরা অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির শুধু উন্নতিরই সূচনা করেন নি, তার কৃতিত্বের ও সফলতার ধারাও অব্যাহত রেখেছেন।

অসমীয়া জনগণের সাংস্কৃতিক ও লোকজীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও তাদের পুরাতনী গীতি ও কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, নকুলচন্দ্র ভুঁইয়া ও ডিম্বেশ্বর নেওগ। আধুনিককালে লোকসাহিত্য সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং এই সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধও লেখা হয়েছে, তার মধ্যে প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামীর 'অসমীয়া জনসাহিত্য' নামে বইটি বহু নতুন তথ্যের ভাণ্ডার ও চিত্তাকর্ষক।

দর্শন ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তকও লিখিত ও প্রকাশিত হচ্ছে এবং কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি ও লেখক এ বিষয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। রাধানাথ ফুকন এবং রোহিনীকান্ত বরুয়া তাঁদের বিজ্ঞানভিত্তিক রচনাবলীতে অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সাহিত্যিক পত্রপত্রিকা, সাময়িকী ও সংবাদপত্রগুলি আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতিতে বিশিষ্ট সহায়ক এবং আধুনিক রীতির প্রভাবেও তাদের অবদান স্বীকৃত। বিভিন্ন সাহিত্যিক যুগের নামেও পত্রিকাগুলির নাম সংযুক্ত যেমন 'অরুণোদয়', 'জোনাকি', 'বাহি' এবং 'আহ্বান'। প্রত্যেকটি পত্রিকা ছিল নব্যধারার লেখকদের মিলনস্থল। পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যায়

লেখকদের মতামত ও সাহিত্যিক আদর্শ-এর দৃষ্টান্ত প্রকাশিত ও অনুশীলিত হত। এই পত্রিকাগুলির সাহায্যে এইভাবে সেইযুগকে চিনে নেওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে 'অরুণোদয়'-এর নাম আগেই বলা হয়েছে—এইটিই খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত, শিবসাগর থেকে প্রকাশিত প্রথম অসমীয়া পত্রিকা। অসমীয়া 'অরুণোদয়' এবং তার বাংলা ও ওড়িয়া প্রতিবেশী পত্রিকা-গুলির মতন শুধু তৎকালীন সংবাদই পরিবেশন করত না, সেখানে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষয়ে নানাধরনের নিবন্ধও থাকত। দূরের ও কাছের সাধারণ খবরগুলি ছাড়াও, এই সব পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও সাধারণের জানবার নানা বিষয়ও থাকত। 'অরুণোদয়'-এর পাতাতেই অসমীয়া আধুনিক সাহিত্যের প্রথম বিকাশ। ঐ পত্রিকাই জনগণের কথ্যভাষাকে প্রথম সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়ে গদ্য ও পদ্য রচনা প্রকাশ করে। সেই ভাষা আজকের অসমীয়া ভাষা।

এর পরে নামী পত্রিকা হচ্ছে বিখ্যাত 'জোনাকি' (চন্দ্রালোক, ১৮৮৯) যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখনকার দিনের দিকপালরা—চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, হেমচন্দ্র গোস্বামী, কনকলাল বরুয়া এবং অন্যেরা। এই পত্রিকার মাধ্যমে লেখকরা ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের ভাব ও আদর্শের অনুকরণ করেন ও সমগ্র আসামে সেই পদ্ধতিই প্রচারিত হয়। 'উষা' (১৯০৭) পদ্মনাথ গোহাঁই-এর সম্পাদনায় এবং 'বাহি' (বাঁশি, ১৯০৯) লক্ষ্মীকান্ত বেজবরুয়ার দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই দুই ভিন্ন মতাদর্শের পত্রিকায় প্রায়ই সাহিত্য ও সমাজ সংস্কার ইত্যাদি তর্কমূলক বিষয় নিয়ে বিচার চলত এবং দুই সাহিত্য রথী এই তর্কদ্বৈরথের শিরোভাগে থাকায় অসমীয়া সাহিত্যের পূর্ণবিকাশে কিছু সাহায্য হয়েছিল। তাঁদের রচনাতে সকল শ্রেণীর লেখাই জায়গা পেত—গদ্য, পদ্য, ছোটোগল্প, ঐতিহাসিক আলোচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি।

এর পরের যুগ ১৯২৯ সালের 'আহ্বান'-এর যুগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই পত্রিকাটি কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হত এবং এটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এর সাহিত্যিক মানও উঁচু ধরনের। পত্রিকাটি এক বিশিষ্ট পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করেছিল, এটি সাহিত্যের দিকে জনগণের চেতনাকে জোরালো করেছিল এবং রচনার মান উঁচুতে তুলে কয়েকজন উৎসাহী লেখক এর সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিলেন। সাহিত্যে নতুন নতুন ভাবধারা, শিল্পরীতি স্থান পেল। এই পত্রিকার আকর্ষণ ছিল এর ছোটোগল্প লেখার কৌশল ও বিজ্ঞান বিষয়ে

তথ্যমূলক আলোচনা এবং 'আহ্বান'-এ লেখা রচনারীতি তরুণ লেখকদের কাছে লেখার আদর্শ হিসেবে গৃহীত হতে থাকে। বিচার বিশ্লেষণসহ যুক্তিবাদী চিন্তাশীল দার্শনিক এবং বিতর্কমূলক প্রবন্ধ যা আজকালকার সাহিত্যে ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে, 'আহ্বান'-এর যুগে সেগুলি বিশেষ মর্যাদা পেত। আর একটি পত্রিকা 'জয়ন্তী' বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছিল, সেখানেও তরুণদের নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে সাহিত্যালাপ ও প্রকাশভঙ্গি আদৃত হত। আমরা ঐ পত্রিকায় নতুন যুগের কাব্যসৃষ্টির প্রথম আভাস পাই।৮

যুদ্ধের পর দুটি অসমীয়া সংবাদপত্রের খোঁজ আমরা পাই—দৈনিক 'নতুন অসমীয়া' এবং সাপ্তাহিক 'অসম বাণী'। এ ছাড়া ছিল মাসিক 'রামধেনু' (রামধনু)। 'নতুন অসমীয়া'র রবিবাসরীয় সংস্করণে পুস্তক সমালোচনা এবং নব নব রম্যরচনা এক নতুন লেখকগোষ্ঠীসৃষ্টির সূচনাদ্যোতক, যাঁরা বর্তমান অসমীয়া সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রম্যরচনা ও খেয়ালী রচনার দ্রুত বিবর্ধন ও লোকপ্রিয়তার জন্য 'নতুন অনমীয়া'-র ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডঃ হেম বরুয়া, ললিত বরা, তিলক হাজারিকা, হেমচন্দ্র শর্মা, ভদ্র বরা প্রমুখ সাহিত্যিকগণ এই রম্যরচনার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁদের রচনা 'নতুন অসমীয়া'-তেই বেশিরভাগ প্রকাশিত হত। দুর্ভাগ্যের কথা যে, আমাদের তরুণ লেখকদের ধারণা যে সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রতিভাই সবচেয়ে বড়ো কথা—কিন্তু তাদের না আছে ধৈর্য, না আছে সুস্থ স্বস্থ হয়ে চিন্তা করবার সবলতা। যখন আমরা তাদের লেখার আলোচনা করি তখন দান্তের উক্তি মনে পড়ে—"যারা শুধু প্রতিভাকেই সম্বল করে কাব্যপ্রণয়নে অগ্রসর হয়, যেখানে শিল্পকৌশল বা বিষয়জ্ঞান নেই, তাদের মূর্খের সঙ্গে তুলনা করতে হয়।"

'অসম বাণী' বয়স্ক ও শিশুদের জন্য নানা ধরনের প্রবন্ধ নিবন্ধ রম্য ও সরস রচনা, বিশিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত লেখা, ছোটোগল্প, কবিতা সবই প্রকাশ করে। উৎসাহী ও তেজোদ্দীপক 'রামধেনু' পত্রিকায় নবীনদের জয়জয়কার। তাদের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে নব্য কবি, গল্প লেখক ও তীক্ষ্ম সমালোচকরাও আছেন। আধুনিক সাহিত্যের চর্চা, সংলাপ ও সংকলনের কেন্দ্র যেন মহোদধি, যেখানে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সব নদনদী এসে মিলেছে অসমীয়া সাহিত্যের নানা রূপ, ছন্দ ও প্রকৃতি নিয়ে এক বিচিত্র মহামানবের সাগরতীরে।

নির্দেশিকা

সাহিত্য অকাদেমির একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষের প্রধান ভাষাগুলির চর্চায় উৎসাহ দেওয়া এবং ভাষাগুলিকে পরস্পরের সহযোগিতার ছায়াতলে আনা। এসব ভাষার মূল ও বিকাশধারা প্রায় একই রকম এবং যে মানসিক আবহাওয়ায় ভাষাগুলি বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে তাও প্রায় একই ধরনের। এমন কি দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলি যার উৎপত্তি অন্যরকম সেগুলিও একই রকম পরিবেশপ্রভাবে পরিবর্ধিত হয়েছে। সুতরাং স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের এই প্রধান ভাষাগুলির প্রত্যেকটি শুধু যে কোনো অঞ্চলের ভাষা তাই নয়, মূলত ভারতের ভাষা। এসব ভাষার বিচিত্র ও বিভিন্ন ছাঁদে ভারতবর্ষেরই ধ্যানের সংস্কৃতির ও অগ্রগতির অজস্র ছাপ রয়েছে।

ভারতের প্রত্যেক অধিবাসী যদি নিজেকে শিক্ষিত বলে পরিচয় দিতে চান তবে অবশ্যই তাঁকে তাঁর মাতৃভাষা নয় এমন সব ভারতীয় ভাষার সংবাদ রাখতে হবে। এসব ভাষার প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আমাদের আবশ্যক। সে জ্ঞান লব্ধ হলেই ভারতবর্ষের বৃহৎ ও বহুশাখ সংস্কৃতির মূলতলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। এই কার্যবিধির অনুসরণ ক্রমে সাহিত্য অকাদেমি আমাদের প্রত্যেক ভাষার মুখ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সব একে একে অপর ভাষাগুলিতে অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করছেন এবং এইরকম সাহিত্য ইতিহাস রচনা করাচ্ছেন। এই উপায়ে সাহিত্য অকাদেমি আমাদের সংস্কৃতিবোধের পরিধি বাড়িয়ে ও মূল গভীরে প্রসারিত করে দিচ্ছেন আর ভারতীয় ভাষার পুষ্টি এবং সে সাহিত্যের উপাদান ও প্রয়োজন যে এক এবং অভিন্ন সে বিষয়ে ভারতবাসীকে সচেতন করাতে সাহায্য করছেন।

জওহরলাল নেহরু